চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য

চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য

করুণাময় মজুমদার

জি. এ. ই. পাবলিশার্স
কলকাতা ৭০০ ০০৬

CHANDRANATH BASU : JIBAN O SAHITYA
By Dr. Karunamoy Majumdar

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

প্রচ্ছদ : বিজন ভট্টাচার্য

জি. এ. ই. পাবলিশার্স-এর পক্ষে সুনন্দ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে প্রকাশিত; মুদ্রাকর প্রেস-এর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক ১০/১সি মারহাট্টা ডিচ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত এবং মুখার্জী বাইণ্ডার্স-এর পক্ষে মানস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১২ হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৫ থেকে গ্রন্থিত।

স্বর্গতা মাতৃদেবী

স্বর্গত পিতৃদেব-

এর

শ্রীচরণোদ্দেশে

নিবেদিত

পূর্বাভাষ

রবীন্দ্রনাথ একবার বিপিনবিহারী গুপ্ত (১৮৭৪-১৯৩৬)-কে বলেছিলেন :

"আমাকে একদিন তিনি (চন্দ্রনাথ বসু) বলিয়াছিলেন—তুমি হিন্দুর ছেলে, ও রকম লেখো কেন? তদুত্তরে আমি লিখিলাম—'হিন্দুত্ব সম্বন্ধে আপনার মত লইতে প্রস্তুত নহি'।"

(দ্র. 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' "মানসী ও মর্মবাণী" ফাল্গুন, ১৩২৩)

প্রবল হিন্দুয়ানির জন্য চন্দ্রনাথ সমকালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন এবং একালে বিস্মৃত হয়েছেন। তাঁর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' একদিকে তাঁর খ্যাতির কারণ, অন্যদিকে তাঁকে বিস্মৃতির সহায়ক হয়েছে। শকুন্তলায় সাংখ্যতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য তিনি কখনও কখনও উপহসিত হয়েছেন এবং এই অপবাদের জন্য চন্দ্রনাথের বিপুল সাহিত্যের মূল্য আজও অনিরূপিত। বিস্মৃতির গর্ভ থেকে উৎখনন করে এনে চন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যকে আমাদের সমসময়ের সম্মুখে মেলে ধরা প্রস্তূয়মান গ্রন্থের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ পূর্বে প্রকাশিত 'বঙ্গ সাহিত্যের প্রভাতসূর্য' "বঙ্গদর্শন" (১৮৭২) আজও আমাদের উৎসুক করে। সম্প্রতি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে অবলম্বন করে তিনজন গবেষক তাঁদের গবেষণাকার্য সমাপ্ত করেছেন। তাঁদের গবেষণা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। তাহলেও 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখক-গোষ্ঠীর প্রত্যেককে নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বঙ্কিমের অনুরোধক্রমে চন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রথমাবধি তাঁর মননে স্বাতন্ত্র্য ছিল। যেমন, 'বঙ্গদর্শন'-এ রেনাসাঁস চেতনাজাত ইহভাবনা মুখ্য, চন্দ্রনাথ পরলোক নিয়েও চিন্তা করেছেন। বঙ্কিম বাঙালীর স্বাস্থ্যহীনতা ও অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য তার বাল্যবিবাহ প্রথাকে দোষারোপ করেছেন। চন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহকে সমর্থন করেছেন কতকটা উগ্রভাবে। চন্দ্রনাথের মুষ্টিমেয় কয়েকটি রচনা মাত্র 'বঙ্গদর্শন'-এ

প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বিপুল সংখ্যক রচনা প্রকাশিত হয় 'ক্যালকাটা রিভিউ' 'প্রচার' 'নবজীবন' 'সাহিত্য' 'নব্যভারত' 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায়। সুতরাং 'বঙ্গদর্শন' কেন্দ্রিক উপর্যুক্ত গবেষণাকর্মে সেগুলি অনুল্লিখিত থেকে গেছে।

চন্দ্রনাথকে এক কথায় বঙ্কিমশিষ্য বললেও সব বলা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে তাঁর সাহিত্যগুরু অন্যদিকে তাঁর প্রতিপক্ষ। চন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনায় বঙ্কিমের সাহিত্যিক বক্তব্যের বিরুদ্ধে একটি অনুচ্চ প্রতিবাদ যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। বঙ্কিম-অনুচর হলেও ভূদেবের সঙ্গেই তাঁর মননসান্নিধ্য বেশি। শশধরপন্থীও তিনি নন। কেননা, তা ছিল অসম্ভব। অপরিণত হলেও একটি দার্শনিকদৃষ্টি চন্দ্রনাথের ছিল যা শশধর প্রমুখের ছিল অনায়ত্ত। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে হিন্দুধর্মের নব ব্যাখ্যায় যে প্রচারক-পরিব্রাজকদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের সঙ্গে চন্দ্রনাথকে এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা যায় না। বাঙালীর মননচর্চা ধারায় চন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থান অবশ্যই আছে। সুতরাং, যেহেতু 'বঙ্গদর্শন'-কেন্দ্রিক আলোচনায় চন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ ধরা যাচ্ছে না সেই জন্য তাঁর জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন থেকেই যাচ্ছে।

চন্দ্রনাথ বসুর কোন প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ নেই। রচনার কোনও চেষ্টাও হয় নি। চন্দ্রনাথ নিজে বৃদ্ধবয়সে আত্মকথা লিখেছিলেন। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার লেখক', (১৩১১) গ্রন্থের প্রথমভাগে তা সংকলিত হয়েছে। 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' (১৩১৫) চন্দ্রনাথের আত্মস্মৃতি-মূলক অন্য একটি অনতিবৃহৎ রচনা। পরবর্তী কালে চন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাঁরা সামান্য আলোচনাও করেছেন চন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনাদুটি তাঁদের সহায়ক হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র ৮ম খণ্ডে চন্দ্রনাথের উক্ত আত্মজীবনকথা জাতীয় গ্রন্থদুটি থেকেই প্রধানত তথ্য সংকলন করেছেন। নতুন তথ্য যোজনা বিশেষ নেই। প্রসিদ্ধ জীবনীলেখক মন্মথনাথ ঘোষ 'ভারতবর্ষ' (আষাঢ়, ১৩৪৩) পত্রিকায় চন্দ্রনাথের একটি সুলিখিত জীবনী লেখেন। রচনাটি এ যাবৎ অজ্ঞাত ছিল। অথচ চন্দ্রনাথের বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর জীবনী হিসেবে এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত মূল্যবান মনে হয়েছে। তুলনায় চন্দ্রনাথের আত্মকথা জাতীয় রচনা দুটি স্মৃতিমূলক বলেই নির্ভরযোগ্য মনে

হয় নি। এগুলির মধ্যে নানা অসংগতি আছে। যেমন, চন্দ্রনাথ আত্মকথায় লিখেছেন:

> বি. এল. পাস করিয়া সকলে যেমন আদালতে ছোটে আমিও তেমনি ছুটিয়াছিলাম।

চন্দ্রনাথ বি. এল. পাশ করেন ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে। চন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তির সূত্র ধরে পরবর্তী কালে সকলেই বলেছেন, তিনি ১৮৬৭ সালে হাইকোর্টে ওকালতি করতে যান। কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের পরে। বি. এল. পাশ করার পর তিনি বিখ্যাত ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। আমাদের গবেষণালব্ধ এই তথ্যটি চন্দ্রনাথের জীবনীতে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সরকারি 'আরকাইভ্‌স' থেকে তাঁর কর্মজীবনের একটি রেকর্ডও সংগ্রহ করেছি। চন্দ্রনাথের পৌত্রী অমিয়বালা মিত্র ও আত্মীয় অধ্যাপক যামিনীমোহন কর একটি অজ্ঞাত তথ্য জানিয়েছেন যা অত্যন্ত মূল্যবান। চন্দ্রনাথের সমসাময়িক ব্যক্তিদের জীবনী, স্মৃতিকথা ও তৎকালীন সভাসমিতির মুদ্রিত 'প্রসিডিংস্‌' ও 'ট্রানজাকসন্‌' থেকেও সাহায্য পেয়েছি। 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও নানা প্রগতিমুখী কর্ম প্রেরণার অজ্ঞাত বিবরণগুলি উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের 'ট্রানজাকসন্‌' থেকেই সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। জীবনী রচনায় এগুলি যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পুরাতন তথ্যগুলি পরীক্ষা করে এবং নতুন তথ্য সংযোজন করে যতদূর সম্ভব চন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রস্তুত করা এই গবেষণাগ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

জীবনী রচনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মেরও বিস্তারিত বিবরণ দিতে প্রণোদিত হয়েছি। তাঁর সাহিত্যজীবনের তিনটি পর্ব আমাদের চোখে পড়েছে:

প্রথম পর্ব: ১৮৬৫—১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ
দ্বিতীয় পর্ব: ১৮৮০—১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ
তৃতীয় পর্ব: ১৮৮৫—১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ

ছাত্রজীবনে ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধ লিখে তিনি সুপ্রসিদ্ধ 'ইংলিশ ম্যান'

পত্রিকার প্রশংসা লাভ করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)-এ 'শকুন্তলাতত্ত্ব' প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি যা কিছু লিখেছেন সবই ইংরেজিতে। চন্দ্রনাথ আত্মকথায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর চারটি ইংরেজি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। আমাদের অনুসন্ধানে তাঁর মূল্যবান ১৮টি দুষ্প্রাপ্য ইংরেজি রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির ভিত্তিতে একটি আলোচনাও এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলি প্রধানত শিক্ষা অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক। জীবনের প্রথম পর্বে তিনি একটি প্রগতিশীল ও নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্কিমের 'বঙ্গদেশের কৃষক' লিখিত হবার পূর্বেই চন্দ্রনাথ বাংলার রায়তদের দুঃখদুর্দশা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সম্পর্কে বাস্তব পথ নির্দেশ করেন। এদেশের শিক্ষা বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে কতগুলি বাস্তব পরিকল্পনাও তিনি পেশ করেছিলেন।

বঙ্কিমের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। বঙ্কিমের শুভ সংস্পর্শ চন্দ্রনাথের লেখনীকে স্বর্ণপ্রসূ করেছিল। 'শকুন্তলাতত্ত্ব' 'ত্রিধারা' 'ফুল ও ফল' প্রভৃতি রচনা এই পর্বেই লিখিত হয়। 'শকুন্তলা'য় সাংখ্যতত্ত্ব আবিষ্কার লেখকের একতম লক্ষ্য, চন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই প্রচলিত মত শ্রদ্ধেয় নয়। বরং কালিদাসের অমর সৃষ্টি 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তিনি যে রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন ২০ বৎসর পর রচিত রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' আলোচনায় তা অনুসৃত হতে দেখি।

তিনি সম্ভবত ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জুনমাসে পণ্ডিত শশধর তর্কচূডামণির বক্তৃতা প্রথম শোনেন। তার পর থেকেই তিনি হিন্দুধর্মের উৎসাহী নব ব্যাখ্যাতা। সাহিত্যজীবনের এই তৃতীয় পর্বে পূর্বের রসদৃষ্টি অন্তর্হিত হল, তিনি হিন্দুধর্মের প্রাচীন প্রথা ও আচারগুলি সুরক্ষার কাজে ব্রতী হলেন। সংস্কারপন্থা ত্যাগ করে তিনি হলেন সংরক্ষণপন্থী; ইতিহাসচেতনার স্থান গ্রহণ করল ঐতিহ্যচেতনা। তাই এই পর্বে লিখিত তাঁর সমাজতত্ত্বমূলক প্রবন্ধগুলিতে হিন্দুত্বের গৌরব ঘোষণার প্রতি লেখকের ব্যগ্রতা দেখা যায়। তা সত্ত্বেও চেতনায় পূর্বস্মৃতির মতো সাহিত্যিকের রসদৃষ্টি থেকে গেল। তার ফলে এই জাতীয় রচনাগুলিতে একটি স্ববিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রনাথের বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী এখনও সংকলিত হয় নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় ও ড. সুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড)-এ প্রদত্ত চন্দ্রনাথের গ্রন্থতালিকার অতিরিক্ত ৭ খানি গ্রন্থের সন্ধান আমরা পেয়েছি। লণ্ডনস্থ 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি'তে চন্দ্রনাথের একটি বই রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট'-এ চন্দ্রনাথের বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হল, যদিও তা সম্পূর্ণ এমন দাবি নেই। আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

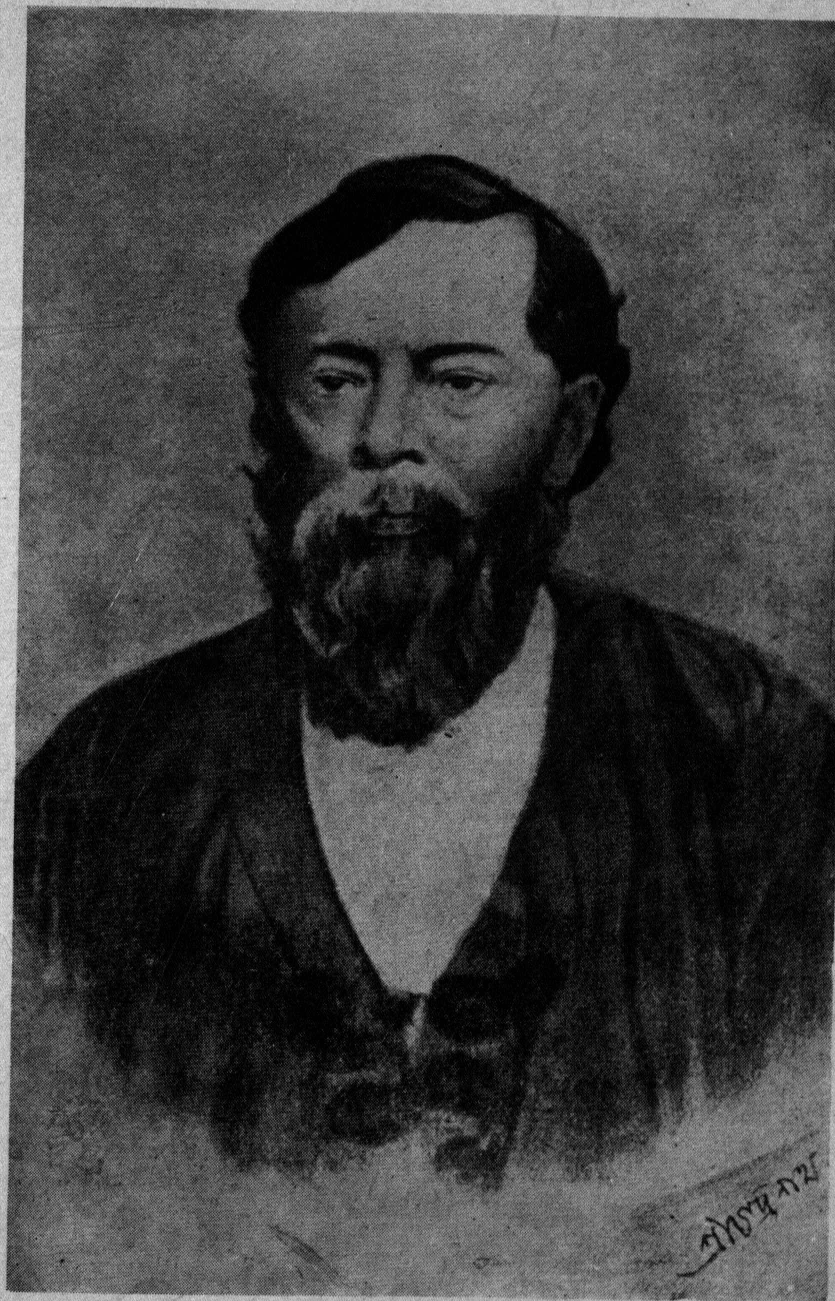
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, একই কালপর্বে আমরা আর একজন চন্দ্রনাথ বসুর সাক্ষাৎ পাই। তিনিও লেখক, তবে প্রধানত অনুবাদ ও পাঠ্যপুস্তক সংকলনের কাজ করেছেন। তাঁর গ্রন্থসংখ্যাও বিপুল। তিনি যে অন্য (দ্বিতীয়) চন্দ্রনাথ বসু—এ সম্পর্কে তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার করেছি। 'পরিশিষ্ট'-এ তাঁর একটি গ্রন্থ তালিকাও সংযুক্ত হল। এ ছাড়া, রবীন্দ্ররচনায় অগ্রথিত রবীন্দ্রনাথের একটি অনুবাদ কবিতা (যা চন্দ্রনাথের গ্রন্থভুক্ত ছিল) সংযোজিত করা হয়েছে। পরিষদ্-সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্রের আলোকচিত্র দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এ সবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে মনে করি।

'চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য' আমার গবেষণা গ্রন্থ। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থটির জন্য পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদান করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এই গ্রন্থের বিষয়-পরিকল্পনা থেকে শুরু করে আমার কাজের প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রদ্ধেয় ড. ভবানীগোপাল সান্যাল মহোদয়ের উপদেশ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। তাঁর তত্ত্বাবধানেই চন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক এই গবেষণা সমাপ্ত হয়েছিল। স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বন্ধুবর ড. অলোক রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং তাঁর সংগ্রহ থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দেখতে দিয়ে আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গত অক্লান্ত উৎসাহী অশোক উপাধ্যায়ের কথাও স্মরণীয়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার ড. রাখালচন্দ্র নাথের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। ড. নাথের ইংরেজি গবেষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি থেকেও সাহায্য পেয়েছি। বর্তমান গ্রন্থের 'প্রস্তাবনা' শীর্ষক অধ্যায়টি রচনায় তাঁর প্রণোদনার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

আমার অগ্রজকল্প কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের দর্শনবিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. দেবব্রত সেনের সস্নেহ তাড়না ও উৎসাহ আমাকে প্রাণিত করেছিল। আমার ছাত্র শ্রীমান সর্বনাথ ভট্টাচার্য এই গ্রন্থের 'নির্ঘণ্ট' তৈরি করে দিয়েছে। গ্রন্থবিষয়ের প্রতি তার আগ্রহে মুগ্ধ হয়েছি। আমার ভ্রাতা শ্রীমান আনন্দময় আমাকে সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় অত্যল্পকালের মধ্যে গ্রন্থরচনা শেষ হতে পেরেছে। শ্রীমানদ্বয়কে আশীর্বাদ জানাই।

করুণাময় মজুমদার

সূচীপত্র



চিত্র ১ : চন্দ্রনাথ বসু

প্রস্তাবনা

১

উনবিংশ শতাব্দীর মুখ্যত শেষের তিনটি দশককে নিয়ে যে কালপর্ব, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন, 'উজান স্রোতের কাল'। চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) সেই বিশেষ সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সেই জন্য ওই সময়ের বাঙালীর সমাজ ও ধর্মীয় মন ও মননের পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) পরিচালিত ধর্মান্দোলনের মূল প্রেরণা কি ছিল সে সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন:

> My constant reflections to the inconvenient or rather injurious rites, introduced by the peculiar practice of Hindu idolatory, which is more than any other pagan worship, destroys the texture of society,……have compelled me to use every effort to awaken (my country-men) from their dream of error.[১]

রামমোহনের কাছে সমাজ ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনে ধর্ম-সংস্কার। তিনি একথা বলেছিলেন তাঁর 'বেদান্তসার' (১৮১৫) গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায়। এই গ্রন্থে তিনি বেদান্ত নির্ভর একেশ্বরবাদের সপক্ষে বলেছেন, অর্থাৎ লেখকের বক্তব্য ছিল ধর্মীয়। তা সত্ত্বেও রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী উদার, সর্বজনীন ও ধর্মীয় সংকীর্ণতামুক্ত। Dream of error থেকে তিনি দেশবাসীকে জাগাতেই চেয়েছেন। হিন্দুর পৌত্তলিকতা, পূজাবিধির শুষ্ক আনুষ্ঠানিকতা এবং চৈতন্য প্রবর্তিত যুক্তিহীন ভক্তিবাদ বলতে রামমোহন Dream of error বুঝেছেন। তিনি তাঁর ঘোষিত 'লোকশ্রেয়'-এর চেতনা থেকে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন।

রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ প্রথম বিভক্ত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর আগে পর্যন্ত দেখা গেছে ধর্ম নিয়ে বাদানুবাদ ও বিতর্কবিচার। কিন্তু ধর্মের নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার বা সত্যকারের ধর্মীয় জীবনের অন্বেষণ দেখা যায়নি। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই পর্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) মত মানুষ ছিলেন যিনি নিজের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলোর স্ফুরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'-কেই ধর্মের 'পত্তনভূমি' বলে ঘোষণা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও বলা যায় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ধর্ম অপেক্ষা সমাজ ভাবনা মুখ্য। ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) বিযুক্তি প্রমাণ করে কোনও গভীর অন্বেষণের পথে তৎকালীন বাঙালী মন অগ্রসর হচ্ছে। এর পূর্বের অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে এই জাতীয় আধ্যাত্মিক অস্থিরতা দেখা যায়নি। য়োরোপীয়দের বিশেষত খ্রীষ্টান মিশনারীদের এ দেশীয় ধর্ম সম্পর্কে তীক্ষ্ণ কটু সমালোচনা আমাদের দেশের মনীষীদের মানব-অস্তিত্বের লক্ষ্য ও অর্থ অন্বেষণে প্রেরণা দিয়েছিল। তরুণ বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল—'এ জীবন লইয়া কি করিব? কি করিতে হয়?' ('ধর্মতত্ত্ব', ১১ অধ্যায়) বঙ্কিমের সমগ্র সাহিত্য সাধনা এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবের বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল কোন ধর্মীয় কারণে নয়, সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে। কেশবচন্দ্র বিবাহে জাতিভেদের বিপক্ষে ছিলেন; এ ব্যাপারে সাবধানী দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রক্ষণশীল এবং সমাজ সংস্কারে অতখানি বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন না। উপরন্তু ব্রহ্ম উপাসনায় আচার্যের উপবীত ত্যাগের ব্যাপারেও তাঁরা ছিলেন দ্বিমত। শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র দল ত্যাগ করে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন (১১ নভেম্বর, ১৮৬৬)।

বহির্জীবনের এই বিচ্ছেদ অপেক্ষা অন্তর্জীবনের বিভেদ ছিল গভীর। কেশবের জীবনের বাকি বৎসরগুলিতে (১৮৬৬-৮৪) আমরা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই এক অশান্ত আধ্যাত্মিক অন্বেষককে। নতুন সমাজ স্থাপনের পরের বছরেই তিনি অনেকগুলি কার্যসূচী গ্রহণ করেন, যার ফলে আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর বিরোধ গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই অক্টোবর তিনি খোল করতাল সহযোগে শোভাযাত্রা করে নগর সংকীর্তনে

বহির্গত হলেন। খোল-প্রবর্তন, নগর-সংকীর্তন, শোভাযাত্রা ব্রাহ্মসমাজে অভূতপূর্ব। কেশবের অনুরাগীদের অনেকেই সেদিন নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছিল, মুখে ছিল মুক্তিকামনায় উত্তেজিত গানের কলি। মধ্যযুগে চৈতন্যদেব অশিক্ষিত দেশবাসীকে ধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে নামকীর্তনের যে পথ উদ্ভাবন করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকদের সেই পথ গ্রহণ করতে দেখে কলকাতাবাসী সেদিন বিস্মিত হয়েছিল। প্রথমাবধি কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য ব্রাহ্মনেতা অপেক্ষা প্রগতিশীল ও বিপ্লবমুখী ছিল, অথচ তিনিই আজ মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক। অন্যেরা তো বটেই কেশব-অনুগামীদের মধ্যেও অনেকে সংস্কারপন্থা ত্যাগ করে ভক্তিবাদে এই প্রত্যাবর্তনকে সুনজরে দেখেন নি। কেশবচন্দ্রের জীবনীকার বলেছেন :

Khole arrived, but the minds of Keshab's friends were not prepared for the Khole.[২]

কিন্তু কেশবের অনুভূতি ও বিশ্বস্ততা ছিল সন্দেহাতীত। একটি সুউচ্চ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি নগর সংকীর্তনে বহির্গত হয়েছিলেন। কেশব-অনুরাগীদের দৃষ্টিভঙ্গীর এই গভীরতা ছিল না। বস্তুত ওই দিন থেকেই ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় বিভাজনের বীজ রোপিত হয়েছিল বলা যায়।

হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, কেশবচন্দ্র নিরাকার উপাসনায় মনের প্রার্থিত শান্তি পাচ্ছেন না। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না ; প্রেমের ভাব অধিক ছিল না···ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। তিনেরই প্রথম অক্ষর 'ব'। বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য তিনই শুষ্ক কঠোর। (পরে ভক্তির সঞ্চার হলে) সাহারার মধ্যে কমল ফুটিল। পাথরের উপর প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইল।'[৩] খোল করতাল সহযোগে সংগীত ও নগর পরিক্রমা তিনি ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার উপাসনার বিরুদ্ধে গ্রহণ করেন নি বা ব্রাহ্মধর্মে পৌত্তলিকতা আনতে চান নি। তিনি ব্রহ্ম উপাসনায় ভক্তিধর্মের লৌকিক রূপটি সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ ঘটনায় তাঁর নিকটতম অনুরাগীরাও দূরে সরে গেলেন। কেশব ক্রমে হিন্দুর অবতারবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন এবং নিজেকে ঈশ্বর প্রেরিত 'অবতার' বলে ভাবতে সুরু করেন।

শুধু অবতারবাদ নয়, বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ, 'পদধূলি গ্রহণ, পাদ প্রক্ষালন, সবিনয় ক্রন্দন, নগর সংকীর্তন' ইত্যাদির মধ্যে কেশব ক্রমে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করলেন। তিনি যে 'প্রত্যাদেশসিদ্ধ সহজজ্ঞান'-এর কথা বলেছেন তা ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ বা reasoning-এর বিরোধী।

অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু হয়েই কেশবচন্দ্র যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিযুক্তির আগেই তিনি Jesus Christ—Asia and Europe বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (৫ মে, ১৮৬৬)। এই বক্তৃতায় তিনি যীশুকে 'মানবত্বের উৎকৃষ্ট আদর্শ' বলে ঘোষণা করেন। ১৮৬৮ সালে অপর একটি বক্তৃতায় তিনি খ্রীষ্টধর্মের উৎকর্ষের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করলেন। তার ফলে অনেক খ্রীষ্টান তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে কেশব Unitarian মতানুসারে খ্রীষ্টকে মানুষ হিসাবে বা Trinitarian মতানুসারে ত্রিত্ববাদকে (doctrine of Trinity) মানতে রাজী নন তখন কেশব সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ কমে গেল। বস্তুত অন্তর্জীবনের যে গভীরতায় তিনি নামতে চান খ্রীষ্টধর্ম সে পথের সন্ধান দিতে পারল না। কেশবের মনের অস্থির অনুসন্ধান চলতেই থাকল।

বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর (২০ অক্টোবর, ১৮৭০) তিনি কর্মক্ষেত্রে নানাদিক থেকে নতুন আদর্শ স্থাপনে সচেষ্ট হন। এই সময় তিনি সুলভ সাহিত্য প্রকাশ, নৈশবিদ্যালয় স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার, সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি বহুবিধ দেশহিতক ার্যের সূত্রপাত করেন। কিন্তু বহির্জীবনের নানাবিধ কর্মের কোলাহল তাঁর অন্তরের অন্বেষণকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দিরের গ্রাম্য পুরোহিত রামকৃষ্ণের (১৮৩৬-৮৬) সাক্ষাৎ হয় (মার্চ ১৮৭৫)। রামকৃষ্ণদেবের ধর্মীয় উদারতা, চারিত্রিক মাধুর্য ও সহজ বাক্যবিন্যাসে তিনি মুগ্ধ হন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে শুভ-সংযোগের ফলে তিনি শক্তিরূপিণী কালীর উপাসনাও করেছিলেন বলে কেউ কেউ বলেছেন।[8] এই ঘটনাবলী হিন্দুকলেজের শিক্ষিত প্রখর যুক্তিবাদী কেশবচন্দ্রের পূর্বজীবনের কর্মধারার সঙ্গে মেলেনা। কিন্তু এগুলিকে কেশবের বিচ্যুতিও বলা যায় না। বস্তুত তিনি ক্রমেই সাধারণ জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন এবং অন্তর্জীবনের মধ্যে প্রবেশ ঘটছে তাঁর। নিঃসঙ্গ পথিক অধ্যাত্মপথের সন্ধান করেই চলেছেন এবং শেষ

পর্যন্ত নানা বিভ্রান্তির মধ্যে তাঁর জীবন শেষ হল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-৯৯) এই কালপর্বের আরেকজন আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসু। তিনিও কেশবচন্দ্রের মত বার বার মত ও পথ পরিবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তা বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, যথার্থই ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের একটি আর্তি তাঁর জীবনে দেখা দিয়াছিল। শান্তিপুরের গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারে তাঁর জন্ম (অদ্বৈতাচার্যের বংশ), বয়সকালে তিনি পারিবারিক গুরুবৃত্তি ত্যাগ করেন। শঙ্করের বেদান্ত ভাষ্য পড়ে হিন্দুদের দেবদেবীতে তাঁর অবিশ্বাস জন্মায়। কিন্তু বেদান্ত তাঁকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের কোন পথ দেখাল না। অস্থির চিত্ত নিয়ে তিনি এলেন কলকাতায়। দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল। বিজয়কৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কেশবচন্দ্রের সহযোগী হয়ে নানাবিধ প্রগতিমূলক সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জাতিভেদের প্রতীক উপবীত বর্জন করেছিলেন, অব্রাহ্মণ আচার্য নিয়োগের সমর্থক তিনি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশব-অনুরাগীদের সংঘাতের সময় তিনি কেশবচন্দ্রের পক্ষে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কেশবের খ্রীষ্টধর্মানুরক্তির বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করেননি। তিনিই প্রথম পত্র লিখে কেশবের 'অবতারত্ব'-এর প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ দ্বিতীয়বার বিভক্ত হয়ে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠিত হলে তিনি উক্ত সমাজভুক্ত হন। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'ও তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারল না। অন্তর্জীবনে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য তিনি ব্যাকুল হলেন। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মসুলভ আকুতি তিনি বংশধারা থেকেই পেয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের নগর সংকীর্তনের উপযোগী কয়েকখানি ভক্তিসংগীত তাঁরই রচনা। কিন্তু এগুলি তাঁর মনের উপরিতলের উৎক্ষেপণ মাত্র, অন্তরের গভীরে ঈশ্বরানুসন্ধানী মনের আর্তি ছিল প্রবল। এই পিপাসা নিবারণ করতে তিনি হিন্দুধর্মের কয়েকটি প্রাচীন পন্থা (যেমন কর্তাভজা, অঘোরপন্থা, তান্ত্রিক, শাক্ত প্রভৃতি) অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু কোনখানে চিত্তের শান্তি পান নি। প্রকৃত গুরুর সন্ধানে তিনি দেশবিদেশে পরিভ্রমণ করেন। দার্জিলিংয়ে এক গুরুর কাছে ষটচক্রভেদও শিক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত গুরু ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের প্রদর্শিত

যোগসাধনাতে সেই কাম্য শান্তি পান। বিজয়কৃষ্ণ দেবদেবী দর্শন, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা, রোগ সারাবার জন্য ব্রাহ্মণের পাদোদক পান ইত্যাদি নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৌত্তলিকতা ও গুরুবাদ সমর্থনের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

শেষ জীবনে বিজয়কৃষ্ণ বৈষ্ণবের মধুর ভাবের ঈশ্বর সাধক হন এবং জন-সাধারণের দুঃখে তিনি একাত্ম হয়ে যেতেন। মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদ তাঁর মধ্যে পুনরুজ্জীবন লাভ করেছিল। বিজয়কৃষ্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি শান্তিপুরে গোবিন্দ গোস্বামীর টোলে ও কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। পিতৃপুরুষের ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা জেগেছিল উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য শিক্ষিতদের মত ইংরেজি শিক্ষার গুণে নয়, সত্যকার আধ্যাত্মিক অন্বেষণের জন্য। তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্মমতে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু, ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। বস্তুত তাঁর মধ্যে হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের একটি উচ্চমার্গের সমন্বয় (higher synthesis) সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

২

উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে য়োরোপীয় যুক্তিবাদ হিন্দু সমাজের প্রতি যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল শতাব্দীর শেষের দিকে উচ্চতর অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসু হওয়ায় কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ সে সম্পর্কে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেছিলেন। রাম-মোহনের কাল থেকে শাস্ত্রবচন উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা-করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয়নি। এই সময়ে বাংলা-দেশে কয়েকজন প্রচারক-পরিব্রাজকের আবির্ভাব হয় তাঁরা যুক্তিবাদ দিয়েই য়োরোপীয় আক্রমণকে প্রত্যাঘাত করতে এগিয়ে এলেন। এই যুদ্ধকৌশল কাল ও পরিবেশের বিচারে প্রশংসনীয় ছিল সন্দেহ নেই। যুক্তিবাদিতার প্রতি প্রবণতা ছিল বলেই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে এঁদের সম্বন্ধে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই যোদ্ধাদের শিক্ষা ও চিন্তাশক্তি যথেষ্ট ছিল না।

হিন্দুধর্মের পক্ষে এই নবযোদ্ধাদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁরা স্মরণীয় তাঁরা হলেন শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮) ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯-১৯০২)

যিনি স্বামী কৃষ্ণানন্দ নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। শশধরের জন্ম পূর্ববঙ্গের প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পাননি। তিনি টোলে 'কৃতিত্বের সঙ্গে' কলাপ-ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। কাশীতে কিছুদিন শ্রীমৎ বিশ্বরূপ স্বামীর নিকট উপনিষদ পাঠ করেন।[৫] সুতরাং শুধু শাস্ত্রীয় জ্ঞান নয়, উপনিষদের উপলব্ধি জগতের সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষা জানতেন না, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি জেনে নিয়েছিলেন বলে শশধরের এক অনুরাগী বলেছেন।[৬]

কাশিমবাজারের জমিদার পৃষ্ঠপোষক অন্নদাপ্রসাদ রায়ের অনুপ্রেরণায় এবং অবশ্যই অন্তরপ্রেরণায় শশধর হিন্দুধর্মের প্রচারক হন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি কিছুদিন মুঙ্গেরে ছিলেন। সেই সময় পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং উভয়ে হিন্দুধর্মের পক্ষে প্রচারে নামেন। মুঙ্গেরে আর্যধর্মপ্রচারিণী সভা এবং প্রত্যেক জেলা, মহকুমা ও বড় বড় গ্রামে হরিসভা ও ধর্মরক্ষিণী সভা স্থাপিত হয়েছিল। যুবকদের হৃদয় জয় করার জন্য এবং আন্দোলনে তাদের সহায়তা পাবার জন্য তাঁরা সুনীতিসঞ্চারিণী সভা, বাল্যাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন। তারপরই হিন্দুধর্মত্যাগী ব্রাহ্ম ও নিরীশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি ধর্মযুদ্ধের আহ্বানে জানালেন শশধর ও কৃষ্ণপ্রসন্ন। যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হল আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহরে।

শশধর ও কৃষ্ণপ্রসন্ন কলকাতায় একটি শক্তিশালী যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং যত অল্পদিনের জন্য হোক হিন্দুধর্মের পক্ষে এই যুদ্ধে সাময়িকভাবে তাঁরা জয়ী হয়েছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এলবার্ট হলে একটি বক্তৃতার মাধ্যমে শশধর কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করলেন। এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। তিনিই সেদিন শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে তর্কচূড়ামণির পরিচয় করিয়ে দেন। শশধর দ্রুত জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে শশধরের গৌরবচূড়ায় উত্থানের সংবাদ জানিয়েছেন।[৭] বঙ্কিমচন্দ্র শশধরের ১৮৮৪ সালের আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন।[৮] শশধরের এক শিষ্যের মতানুসারে 'এই আন্দোলন প্রায় দশ বৎসর চলিয়াছিল'।[৯]

শশধর ও কৃষ্ণপ্রসন্নের মধ্যে বাগ্মিতায় ও সংগঠন শক্তিতে কৃষ্ণপ্রসন্ন

শ্রেষ্ঠ ; তাঁর মধুর ভাবাবেগপূর্ণ ভাষণে 'শ্রোতৃমণ্ডলী ভাবে বিভোর হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন'। বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) অবশ্য কৃষ্ণানন্দের ভাষণের অপ্রশংসাই করেছেন।[১০] তিনি সহজেই অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে পারতেন। য়োরোপীয় ধর্ম থেকে ভারতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে তিনি বোঝাতেন পাশ্চাত্য God-কে বিপরীত দিক থেকে লিখলে হয় Dog অথচ ভারতীয় 'নন্দনন্দন' বিপরীত ক্রমে উচ্চারণ করলে একই থাকে। এ এক ধরণের vulgar witticism সন্দেহ নেই কিন্তু এ জাতীয় বক্তৃতায় সাধারণ শ্রোতারা তাদের হীনমন্যতা কাটিয়ে আবেগপ্রাণিত হয়ে উঠত। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্ন সম্পর্কে এটুকু বললে অবিচার করা হয়। তাঁর 'গীতার্থ সন্দীপনী' শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার উল্লেখযোগ্য টীকা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'-র (১২৯৩) ভূমিকায় কৃষ্ণপ্রসন্নের গ্রন্থের প্রশংসা করেছিলেন।[১১] অন্যদিকে শশধরের স্বাভাবিক বাগ্মিতাশক্তি ছিল না এবং তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর ছিল না, তা সত্ত্বেও তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতার অভাব হত না। আচার্য যদুনাথ বলেছেন 'শহরের কেরানী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাপাখানার কর্মী এমন কি দোকানদারের দল সন্ধ্যার সময় কর্মস্থল থেকে বাড়ী ফেরার পথে ক্লান্ত দেহ নিয়েও আগ্রহের সঙ্গে পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনতে যেতেন। ......এবং বিস্ময় বিমূঢ় মনে তাঁর বক্তৃতা শুনতেন।'[১২] কারণ শশধর প্রাচীন হিন্দুধর্মের যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দানে অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে জাতীয় হীনমন্যতা অনেকখানি দূরীভূত হয়। তিনি হিন্দুর শাস্ত্রনির্দিষ্ট যুগপ্রাচীন আচার অনুষ্ঠান পদ্ধতিগুলি যুক্তিগ্রাহ্য রূপেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। যেমন, হিন্দুর একাদশীর পালনকে তিনি স্বাস্থ্য ও শারীর বিজ্ঞানের দিক থেকে ব্যাখ্যা ও সমর্থন করেন। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দুরা শশধরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ধর্মের প্রাকৃত সংজ্ঞা দানের জন্য। ধর্মকে শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তিনি ধর্মকে ব্যাখ্যা করলেন ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের সঙ্গে মিলিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক কল্যাণ চিন্তা তাঁকেও বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। একটি উদাহরণ দিই—শশধর স্বভাবকেই ধর্ম আখ্যা দিয়ে বলেছেন জলের ধর্ম তরলতা, অগ্নির ধর্ম দাহিকাশক্তি তেমনি মানবধর্মের প্রকৃতি হল মানবিকতা। আমাদের মনে হয় ধর্মের এই কল্যাণমুখী ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্রকে আকর্ষণ করেছিল এবং তিনি

শশধরের সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

শশধর পাশ্চাত্য ডারউইনের তত্ত্বের অনুরূপ তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতের পতঞ্জলিতে। বৈজ্ঞানিক ডারউইন ১৮৫৯ সালে 'জীবনের ক্রমোন্নতিতত্ত্ব' (Theory of Evolution) প্রচার করে বিশ্বে আলোড়ন আনেন। শশধর ভারতীয় শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাবনতি তত্ত্বের সন্ধানও দিয়েছেন এবং এইভাবে ভারতীয় শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য '(ভারতীয়) শাস্ত্রে দুই প্রকার উৎপত্তি তত্ত্ব প্রদর্শিত আছে। একটি ক্রমাবনতি তত্ত্ব আর একটি ক্রমোন্নতি তত্ত্ব। প্রথম প্রণালীতে জগদম্বার তনু হইতেই ঋষি, দেবাদির উৎপত্তি হইয়া অবনতি পথে ক্রমে মনুষ্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে। আর দ্বিতীয় প্রণালী অনুসারে উদ্ভিজ্জ হইতে উন্নতিক্রমে মনুষ্যজাতির জন্ম হইয়াছে।··· এই দুই রীতির প্রথম রীত্যানুসারে আর্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে আর দ্বিতীয় রীত্যনুসারে সম্ভবত জাঙ্গলিক মনুষ্যজাতির জন্ম হইয়াছে।'[১৩] শশধর তাঁর বক্তৃতায় ও রচনায় যুক্তিপ্রয়োগ করতেন দার্শনিক প্রণালীর মত এবং অগ্রসর হতেন নৈয়ায়িক বুদ্ধির পথ ধরে।

শশধরের আর একটি প্রিয়তত্ত্ব হল, একমাত্র ভারতবর্ষেই পূর্ণ মানবের জন্ম সম্ভব। তিনি প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়ে এই বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন 'আমাদের দেশে পর পর ছয়টি ঋতুর পরিবর্তন হয়····· পর পর এই ছয় ঋতুর পরিবর্তনে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি সকল বিষয়েরই পরিবর্তন ঘটে এবং সমস্তগুলি পরিবর্তনই আমাদের দেহ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ সম্যক্ অনুভব করিতে পারে।······উত্তাপের বিশিষ্ট পরিবর্তন বশতঃ বায়ুস্তরের বহু অবস্থা নিবন্ধন শব্দ পদার্থ ভারতে যেরূপ পরিবর্তিত হয়, অন্য কাহারই সেরূপ তীক্ষ্ণ হইতে পারে না। তাই আমাদের দেশে বাদ্যবিদ্যা ও সংগীত শাস্ত্রের এত উচ্চ উন্নতি।'[১৪] প্রাকৃতিক এই লীলা বৈচিত্রের জন্য ভারতবাসীর শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি অন্যান্য দেশ-বাসীর তুলনায় উৎকৃষ্ট। তাই মানুষের শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ বিকাশ ভারতবর্ষেই সম্ভব। যেহেতু দুই ঋতু—(শীত ও বসন্ত) প্রধান পাশ্চাত্য দেশে এত সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র নেই তাই সেখানকার অধিবাসীদের পক্ষে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তি লাভ সম্ভব নয়। প্রকৃতির লীলাবৈচিত্রের অভাবে সেখানকার মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ ও অর্ধবিকশিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্রও

ভারতের পৌরাণিক কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছিলেন ('কৃষ্ণতত্ত্ব') যদিও তিনি শশধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি।

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ শশধরের জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল মনে হয়। তখন বঙ্কিমের জীবনে 'বঙ্গদর্শন' পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এই পর্বে (১৮৭২-৮২) বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার, সর্বজনীন ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। পরবর্তী 'প্রচার' পর্বে তিনি অতীতমুখী, রক্ষণশীল ও সমাজনীতি রক্ষক। প্রায় একই সময়ে বঙ্কিমের সঙ্গে শশধরের সাক্ষাৎকার তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিমের আমন্ত্রণ পেয়ে শশধর উল্লসিত হয়েছিলেন এবং বঙ্কিম মারফৎ তিনি শিক্ষিত মহলে পরিচিত হয়েছিলেন।[১৫] শশধর-ভক্তদের কেউ কেউ বলেছেন, উত্তর জীবনে বঙ্কিম হিন্দুধর্ম আলোচনায় যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা শশধরের প্রভাবজাত। এই জাতীয় অতিশয়োক্তি অবশ্য শ্রদ্ধেয় নয়, কেননা, গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ইংরেজি শিক্ষিত প্রখর যুক্তিবাদীর এই মিলন হয়েছিল ক্ষণস্থায়ী। 'প্রচার' পত্রিকার ১ম সংখ্যায় (১৮৮৪) প্রকাশিত নিজের 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় একটি মন্তব্য যোগ করে বঙ্কিম শশধরের অবলম্বিত পথকে অস্বীকার করেন। এই প্রবন্ধেই শশধরের খাদ্যাখাদ্য বিচারের বিরোধিতায় তিনি একজন আচারনিষ্ঠ অথচ মিথ্যাবাদীর তুলনায় একজন অনাচারী অথচ সত্যবাদী ও পরোপকারী ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দান করেছেন। শশধরের ধর্মব্যাখ্যার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখবে না, প্রসঙ্গত তিনি তা-ও জানিয়েছিলেন।[১৬]

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে 'বেদ'-কে অবলম্বন করে রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে শশধরের মত পার্থক্য দেখা দেয়। তারই ফলে একদিন সংস্কৃত কলেজে ষড়দর্শন সমন্বয় প্রসঙ্গে তিনি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সেই সময় রমেশপন্থী কতিপয় যুবক গোলমাল সৃষ্টি করে সভা ভেঙে দেয়।[১৭] এই ঘটনা শশধরকে নিরুৎসাহী করে এবং তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের অপমৃত্যু হয়। কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী[১৮] প্রমুখ সে-যুগের প্রখ্যাত 'কৃতবিদ্য' বাঙালীরা শশধরের আদর্শ ও বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের পক্ষে প্রচার কার্যে অতন্দ্র হলেও শশধরের ধর্মীয় অনুদারতা সম্ভবত ছিল না।[১৯] এই ধর্মীয় ঔদার্য শশধর-অনুগামীদের ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেখা গেছে সেদিনের ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের কাছে প্রথমেই যা ঘৃণ্য অতএব পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল তার নাম হিন্দুত্ব।[২০] তারই প্রতিক্রিয়ায় উনবিংশ শতাব্দীর উপর্যুক্ত কালপর্বে দেখা গেল উগ্র স্বাজাত্য বোধ (chauvinism)। শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতায় ও লেখায় ধর্মতৃষ্ণা ও উগ্র স্বাজাতিচেতনা একাত্ম হয়ে গেছে। সেদিক থেকে বিচার করলে শশধর-কৃষ্ণপ্রসন্ন একটি প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক দায়িত্বই পালন করেছেন।

পশ্চিম ভারতের সুপ্রসিদ্ধ আর্যধর্ম প্রচারক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩) নিজ ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় আসেন। পাশ্চাত্যবিদ্যা ও ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ তিনিও পান নি। গুরুর নির্দেশে জাতিভেদে বিচ্ছিন্ন ও আচার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মুমূর্ষু হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য বেদভিত্তিক আর্যধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। দয়ানন্দের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সত্যার্থপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে তাঁর মূল বাণী 'বৈদিক ধর্মে ফিরে চল'। এই উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ে 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৭৫)। তার আগেই বাংলাদেশের শিক্ষিতশ্রেণী দয়ানন্দের আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে দয়ানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতাদর্শের মিল আছে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ (দয়ানন্দ হিন্দুর বর্ণভেদ মানতেন) ও পৌত্তলিকতার প্রশ্নে এঁদের মধ্যে চিন্তাসাম্য দেখা যায়। কিন্তু পার্থক্য হল, দয়ানন্দ বেদকে সমস্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎস বলে মনে করতেন। তিনি বেদের প্রচলিত সায়ন ভাষ্যকে অগ্রাহ্য করে স্বয়ং বেদের একটি টীকা রচনা করেছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির মত তিনিও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কার এমন কি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রগুলিও বৈদিক যুগের আর্যদের সুপরিচিত ছিল, এই দাবীর সমর্থনে কয়েকটি বৈদিক সূক্তের অভিনব ব্যাখ্যা করেন।

দয়ানন্দের সমাজ সংস্কারমূলক চিন্তায় ব্রাহ্মসমাজ আকৃষ্ট হয়েছিল। তার ফলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম-

সমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দয়ানন্দের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। কেশবই তাঁকে সংস্কৃতের পরিবর্তে হিন্দীতে তাঁর বক্তব্য প্রচার করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রেরণাও তিনি কেশবের কাছ থেকেই পান। কিন্তু যে দশকে কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসু হয়ে জীবনের নতুন তাৎপর্য অন্বেষণে ব্যস্ত, সেই দশকে দয়ানন্দের ধর্মচিন্তা যে প্রভাব বিস্তারে অক্ষম হবে তা স্বাভাবিক। তাছাড়া য়োরোপীয় যুক্তিবাদের অন্ধ বিরোধিতা শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হল না।

দয়ানন্দের সংস্কার প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ লুকিয়ে ছিল। তিনি যথার্থই মনে করতেন খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মিলিত আঘাত ও আক্রমণ থেকে ভারতের হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে না পারলে অনতিকাল পরেই সমগ্র উত্তর ভারত মুসলমানদের এবং দক্ষিণ ভারত খ্রীষ্টানদের কবলিত হয়ে পড়বে এবং ভারতবর্ষ থেকে হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[২১] জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে তিনি বহুঈশ্বরবাদের বিরোধিতা করেন এবং একেশ্বরবাদের পক্ষে প্রচার করেন। তিনিই একটি শুদ্ধি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধর্মত্যাগী হিন্দু ও বিধর্মীদের হিন্দুধর্মে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কারগুলির বিরোধিতা করে এবং স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, সকল মানুষের বেদ পাঠের অধিকার দান সমর্থন করে তিনি প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বৈদিক যুগের রীতি অনুসারে দয়ানন্দ প্রথম জীবনে গোমাংস ভক্ষণের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের হীনমন্যতাকে কাটিয়ে হিন্দুধর্মকে গৌরব-বোধে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। শুধুমাত্র এই কারণেই সত্তরের দশকে বাংলার ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে দয়ানন্দের ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের একটি স্থান আছে। ঋষি অরবিন্দ দয়ানন্দকে **Soldier of light** বলে উল্লেখ করেছিলেন।[২২]

থিয়োসফি আন্দোলন স্বল্পস্থায়ী হলেও বাংলার শিক্ষিত মহলে তার অনস্বীকার্য প্রভাব ছিল। আমেরিকাবাসী কর্ণেল অলকট (১৮৩২-১৯০৭) ও রুশ মহিলা মাদাম ব্লাভাৎস্কি (১৮৩১-৯১) নিউ ইয়র্ক শহরে ১৭ই নভেম্বর ১৮৭৫ তারিখে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। অলকট বিদেশী হয়েও প্রাচীন ভারতের গৌরবে ও মহত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ব্লাভাৎস্কি যথার্থই বিশ্বাস করতেন, তিনি পূর্বজন্মে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন-

এবং এই দেশের সঙ্গে তাঁর জন্মান্তরের যোগসূত্র রয়ে গেছে। অলকট ও ব্লাভাৎস্কি থিয়োসফি আন্দোলনের যোগ্যভূমি ভারতবর্ষ এই কথা মনে করে দেশত্যাগ করেন এবং ভারতবর্ষের বোম্বাই-এ পৌছান ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯ সালে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতে থিয়োসফি প্রচার আন্দোলন সুরু হয়। এঁরা প্রচার করেন হিন্দুধর্মের বিশ্বাসগুলির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে এবং সেগুলি পরিত্যাজ্য নয়। ভারতের প্রাচীন ভাবধারা, ঐতিহ্য, শাস্ত্রশিক্ষা মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও শাশ্বত সত্য। পাশ্চাত্যের ভাবধারা তার থেকে বড় নয়, উন্নতি ও প্রগতির পরিচায়ক নয়।

কর্ণেল অলকট ও মাদাম ব্লাভাৎস্কি কলকাতায় আসেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। ৫ই এপ্রিল ১৮৮২ সালে অলকট কলকাতার টাউন হলে Theosophy, the scientific basis of religion বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। পরের দিনই মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বৈঠকখানায় আগ্রহী জ্ঞানী-গুণীদের উপস্থিতিতে কলকাতায় 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি অব বেঙ্গল' বা 'বঙ্গদেশীয় তত্ত্ববিদ্যা সমিতি' গঠিত হয় (৬ই এপ্রিল, ১৮৮২)। থিয়োসফি সম্পর্কে অনেকেই সেদিন আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। মনীষী ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে তত্ত্ববিদ্যাকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে প্রস্তাব আনেন।[২৩] কবি নবীনচন্দ্র সেন কর্ণেল অলকটের উপর কবিতা লেখেন।[২৪] প্যারীচাঁদ মিত্র, দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি থিয়োসফি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধিজীবীদের মুখ থেকে হিন্দুর অতীত গৌরবের প্রশংসা শুনে স্বভাবতই ঐতিহ্যবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয় এবং একটা জাতীয় আত্মপ্রসাদের ভাব জন্মায়।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ বাংলায় থিয়োসফি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ বৎসর। 'থিওসফিস্ট' হিসাবে আইরিশ দুহিতা অ্যানি বেশান্তের (১৮৪৭-১৯৩৩) ভারত আগমন এই আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। কারণ ব্লাভাৎস্কি যে সব অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখাতেন তার মধ্যে 'লজিক' অপেক্ষা 'ম্যাজিক' ছিল বেশি। এবং স্বাভাবিক ভাবেই তা দিয়ে দীর্ঘদিন মানুষের আকর্ষণ ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। সুতরাং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ আন্দোলনকে অগ্রসর না করে বরং আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করেছিল। কিন্তু অ্যানি বেশান্তের জীবনযাপন পদ্ধতি, বেশভূষা, চিন্তা মনন সবই হিন্দু ভাবাপন্ন

ছিল। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে তিনি হিন্দুর প্রতিমাপূজা, মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ, অবতারবাদ, বর্ণাশ্রমবিভাগ ইত্যাদি সমর্থন করতেন। বেশান্তের বিশ্বাস ছিল মনুর বিধানই জগতের শ্রেষ্ঠ সামাজিক বিধান। অ্যানি বেশান্তের প্রবল হিন্দুয়ানি ঐতিহ্যবাদী আন্দোলনকে যে শক্তিশালী করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

বিদেশী থিয়োসফিস্টরা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছিল তা বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত। এঁরাও হিন্দুর আচার ও কুসংস্কারগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হয়েছিল। বস্তুত যুগটাই ছিল বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গলাধঃকরণ করার জন্য উন্মুখ, যার জন্য শশধরগোষ্ঠীর ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু 'থিয়োসফি'-র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাত না, মুক্তির বাণীও শোনাত। সুতরাং শশধরের ব্যাখ্যা অপেক্ষা এর তাৎপর্য ছিল গভীর।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের তিনটি দশকের স্বদেশ ভাবনার পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। এই পর্বে রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-৯৯) নানাবিধ কর্মোদ্‌যোগ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মেদিনীপুরে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' (১৮৬৬) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সভার অনুষ্ঠানপত্রে জাতীয় ধর্ম, ভাষা, পোষাক, সংস্কৃতি ও খেলাধূলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুর জাতীয় ভাবোদ্দীপক পরিকল্পনা' থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে এবং মুখ্যত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-৯৪) হিন্দু বা চৈত্রমেলা প্রতিষ্ঠা করেন (১২ এপ্রিল, ১৮৬৭)।

হিন্দু মেলার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, একথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি সত্য এই স্বাদেশিকতাবোধ হিন্দু ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেই পুষ্ট হয়েছিল। হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা সেদিন ছিল সমার্থক। আমাদের নতুন জাতীয়তাবোধে যে হিন্দুত্বের চড়া-রঙ্‌ লেগেছিল তার কারণ জাতীয়তার উদ্বোধন দিনে মুসলমান সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য ও অনুপস্থিতি। সে যাই হোক, হিন্দু জাতীয়তাবোধের ধারাটি পরবর্তীকালে দ্বিধা বিভক্ত

হয়ে গেল। জাতীয়তাবোধের ধারাটি বঙ্কিমের মধ্য দিয়ে 'ভারতসভা' (১৮৭৬) ও 'জাতীয় কন্‌গ্রেস'-এর (১৮৮৫) মধ্যে হিন্দু পরিচ্ছদ ত্যাগ করে পূর্ণ-রাজনীতির চেহারা নেয়; হিন্দুত্বের অপর ধারাটি ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ৮০-র দশকে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের সঙ্গে মিলে যায়।

রাজনারায়ণ বসু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং অনেক পরিমাণে যুগ প্রেরণায় 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রতিপাদন করে ১৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের ভবনে একটি বক্তৃতা দেন (১৮৭২)। এই বক্তৃতায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ উল্লসিত হয়েছিল। বক্তৃতাটি সমকালে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। লেখাটি উর্দু ও ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে বহির্বঙ্গে প্রচারিত হয়। বক্তৃতাটির একটি সারমর্ম ইংলণ্ডের 'টাইম্‌স' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। প্রখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রবন্ধ লিখে বক্তৃতাটির প্রশংসা করেছিলেন। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ সালে। এই পুস্তিকার সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ (চৈত্র ১২৭৯) লেখেন 'রাজনারায়ণ বসুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক।' কিন্তু পুস্তিকাটি বঙ্কিমের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে নি, বরং বঙ্কিমের সমালোচনায় মৃদু প্রতিবাদ ছিল। কারণ রাজনারায়ণ 'হিন্দুধর্ম' বলতে আদি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম বিশ্বাস মনে করতেন। সেই কারণে হিন্দুধর্মের নানারূপ প্রশংসা করেও তিনি হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও বহু দেববাদ মানতে পারেন নি। এখানেই বঙ্কিমের প্রতিবাদ উচ্চকিত হয়েছে। তিনি ব্রাহ্মদের হিন্দুত্বের দাবী অস্বীকার করেছিলেন। সেই সময় 'ব্রাহ্ম বিবাহ বিল' (১৮৭২)-কে কেন্দ্র করে সামাজিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র নিজেকে 'অহিন্দু' বলে ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং রাজনারায়ণের ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা যখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যাখ্যান করলেন তখন বোঝা গেল কালান্তরের সূচনা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। কেননা, পরের দশকেই বঙ্কিম নিজেই হিন্দুধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণে তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা নিযুক্ত করেছিলেন।

'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতার শেষাংশে বক্তা আবেগকম্পিত কণ্ঠে প্রবল আশাবাদ প্রকাশ করে বলেছেন 'আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর কুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন

করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দু জাতির কীর্তি, হিন্দু জাতির গরিমা, পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।' এখানে রাজনারায়ণ ভবিষ্যতের হিন্দুজাতির যে বীর্য ও গৌরবময় কল্পচিত্র অংকন করেছেন তার তাৎপর্য অসাধারণ। কেননা পরবর্তী দশকে অতীত মহিমা থেকে সঞ্জীবনীসুধা আহরণ করে ভবিষ্যতের জ্ঞান ও কর্মগৌরবে অলংকৃত হিন্দুজাতি সম্পর্কে যে Vision বা 'দিব্যদর্শন'-এর আবির্ভাব হয়েছিল তার সূচনা হয় রাজনারায়ণের উক্ত বক্তৃতায়।

পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী (১৮৭০-১৯২০) ব্যাপী বাঙ্গালী কবি সাহিত্যিকদের কল্পনায় প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার একটি গৌরবময় রূপ ধরা দিয়েছিল এবং বর্তমানের গৌরবহীন দরিদ্র জীবনে তাকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার দুর্মর বাসনা জেগেছিল। মুখ্য সাহিত্যিকদের রচনায় তো বটেই গৌণ কবিদের কণ্ঠেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরব গান ও স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পচিত্র বার বার ধ্বনিত ও চিত্রিত হয়েছিল। অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) লিখেছিলেন :

বলো, বলো, বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী
ঘিরি তিন দিক্ নাচিছে লহরী
যায় নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী
এখনো অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা-বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব-কাহিনী।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' বা 'ভারত আমার জননী আমার' ও রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) 'সেথা, আমি কি গাহিব গান' প্রভৃতি অসংখ্য গান সেদিন রচিত হয়েছিল। এঁদের

ধারণা হয়েছিল আমাদের মাতৃভূমির এমন একটি বিশিষ্ট গৌরব আছে যা বিশ্বের অন্য সভ্যতায় দুর্লভ এবং যার অতীত ইতিহাস এত গৌরবময় ও মহিমামণ্ডিত তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হবার কারণ নেই। এমন ধারণাও গড়ে উঠেছিল যে, হিন্দুসভ্যতা শাশ্বত ও মৃত্যুঞ্জয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনটি তার জন্যই নির্দিষ্ট। ভারত একদিন ধর্মে কর্মে মননে সাহিত্যে দর্শনে সমাজগঠনে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে কাম্য আসনটি লাভ করবে। এই মনোভাবকেই আমরা বলেছি Vision বা 'দিব্যদর্শন'। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের তিনটি দশকে এই 'দিব্যদর্শন' অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

এখন দেখা যেতে পারে ভূদেব ও বঙ্কিমের মধ্যে ওই 'দিব্যদর্শন' কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

ভূদেবের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে ভূদেব ঐতিহাসিক তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে যদি মারাঠাশক্তি জয়ী হত তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস কি রূপ গ্রহণ করত তার কল্পিত কাহিনী পরিবেশন করেছেন। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ ভূদেব নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাস রচনা করেন নি। অর্ধ-ঐতিহাসিক ও অর্ধ-কাল্পনিক দৃষ্টি মিলিয়ে তিনি স্বপ্নে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লাভ করেছিলেন তাকেই প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভূদেব স্বপ্নদর্শী, তিনি 'মহারাষ্ট্রশক্তির নেতৃত্বে ভারতরাষ্ট্রের ঐক্য ও পুনরুত্থানের' স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি কল্পনানেত্রে যে ভাবী হিন্দু সাম্রাজ্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার মূল উপাদান তিনটি—হিন্দুর পুনর্জাগরণ, হিন্দুর সাম্রাজ্য বিস্তার ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উত্থান।

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভূদেব যে 'পুনরুত্থান' মহাকাব্যের কথা বলেছেন তার মধ্যেই পূর্ব ও পশ্চিমী সভ্যতার সংঘর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিক্ষিত বাঙালীর মনে হিন্দু সভ্যতা সম্পর্কে যে 'দিব্যদর্শন' উদিত হয়েছিল তারই প্রতিফলন লক্ষ করি।

বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি ভাষায় শিক্ষালব্ধ জ্ঞান মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করা। কোন Vision বা 'দিব্যদর্শন' প্রকাশের বাসনা বঙ্কিমের ছিল না। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা তার উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। পত্রিকার

১ম সংখ্যা থেকেই হিন্দু সভ্যতা সম্পর্কে বিবিধ লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন, 'ভারত কলঙ্ক' ('বঙ্গদর্শন', বৈশাখ, ১২৭৯) প্রবন্ধে হিন্দুর দীর্ঘদিনের একটি কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা আছে। য়োরোপীয় ঐতিহাসিকেরা হিন্দুজাতির কাপুরুষতার কথা সাধারণত উল্লেখ করতেন এবং ভারতবাসীর বর্তমান পরাধীনতা যে প্রকৃতই তাদের গৌরবহীন ইতিহাসের জন্য একথাও বলতেন। কোন কোন বিদেশী ভারতবিদ্যাবিদ্ ভারতবর্ষকে নতুন ভাবে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল প্রধানত প্রাচীন ভারতের শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিমূলক সৃষ্টিগুলির প্রতি। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় ভারতবাসী যে কাপুরুষ ছিল এই কিংবদন্তী 'ভারত কলঙ্ক'-এর লেখকের বিশ্বাস হয়নি। কারণ য়োরোপে যেখানে মাত্র পঁচিশ বৎসরে মুসলমান বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছিল, সেখানে ভারতে লেগেছিল পাঁচশ বৎসর।

'বঙ্গদর্শন'-এরও প্রধান সুর হিন্দুর অতীত গৌরবকে তুলে ধরা। কিন্তু তার মধ্যে শশধরীপন্থার উগ্র স্বাদেশিকতার চড়া রং লাগেনি। 'ভারত কলঙ্ক'-এ হিন্দু যোদ্ধাদের গৌরব কীর্তিত হয়েছে। বঙ্গদর্শন এইভাবে বর্তমানের অধঃপতিত হিন্দু সমাজের সামনে বীর্যময় ও গৌরবদীপ্ত অতীতকে তুলে ধরেছিল এবং এটাই ছিল 'বঙ্গদর্শন'-এর ভারতবিদ্যা আলোচনার মূল-সূত্র। বঙ্কিমের কাছে ভারতবিদ্যা নববিদ্যারই অঙ্গীভূত।

'ভারত মহিলা' ('বঙ্গদর্শন', মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১২৮২) প্রবন্ধটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এখানে পুরাণ ও সাহিত্যের কয়েকটি নারী চরিত্র অবলম্বন করে ভারতীয় নারীর গৌরব কীর্তন করা হয়েছে। ভারতে নারীর স্বাধীনতা নেই এবং তারা পুরুষ অধিকৃত—ইংরেজ পণ্ডিতগণের এই অশ্রদ্ধেয় মতবাদের প্রতিবাদে প্রবন্ধটি লিখিত হয়। এখানে 'আধ্যাত্মিক' ভারতবর্ষের মহিলার সঙ্গে 'বস্তুবাদী' য়োরোপের মহিলার তুলনা আছে। বাইবেলে বলা হয়েছে ঈশ্বর পুরুষের প্রয়োজনে তার দেহাস্থি থেকে নারী সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু ভারতীয় মতে প্রজাপতি ব্রহ্মা একটি অভিন্ন সত্তাকে দু'টুকরো করে পুরুষ ও নারীতে বিভক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত লেখকের সিদ্ধান্ত ভারতে নারীর যে গৌরব আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে এবং কাব্যে করা হয়েছে তার তুল্য গৌরব পাশ্চাত্যে দুর্লভ। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র ও 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রধান কৃতিত্ব অসম্মান ও অগৌরবের গভীর তলদেশ থেকে হিন্দু সভ্যতাকে উদ্ধারের চেষ্টা, কিন্তু

সেজন্য পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নিন্দা করতে হয়নি। হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের এতখানি উদারতা ছিল না।

'বঙ্গদর্শন'-এ ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত যে আলোচনাগুলি প্রকাশিত হত তার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সর্বজনীন দিকগুলি পুনরাবিষ্কার। এই কারণে সে আলোচনায় ধর্মীয় প্রশ্ন জড়িত থাকত না। এ সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদকের নিশ্চিত ঘোষণাও ছিল।[২৫] কিন্তু সভ্যতার আলোচনায় লেখকের ধর্মীয় সাপেক্ষতাও সব সময় বর্জন করা সম্ভব ছিল না। যার জন্য রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামিত পুস্তিকার অংশত বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল।

রাজনারায়ণ বসু তথা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের গুরুতর কারণ বর্তমান। রামমোহন রায় থেকে সুরু করে পরবর্তী ব্রাহ্মরা তাঁদের ধর্মীয় মত ও আদর্শের জন্য রেনেসাঁসের প্রথম পর্বের (১৮০০-১৮৩৫) 'ব্রিটিশ ওরিয়েণ্টালিস্ট'-দের কাছে ঋণী। উইলিয়ম জোনস্, কোলব্রুক প্রমুখ ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের মতে বৈদিক যুগ ভারতীয় সভ্যতা ও জীবনধারার নির্ভরযোগ্য 'model'। রামমোহনের অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদ অনেক পরিমাণে বেদের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। পরবর্তীকালের প্রতিমা পূজা, বহু দেববাদ, জাতিভেদ, মন্দির নির্মাণ প্রভৃতির জন্য জোনস্ কোলব্রুকের মত রামমোহনও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে দায়ী করেছিলেন। সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড কফ্ তাঁর গ্রন্থে [২৬] ব্রিটিশ ওরিয়েণ্টালিস্টদের বক্তব্যের পাশাপাশি রামমোহন রায়ের রচনা উদ্ধার করে তাঁদের চিন্তাসাম্য দেখিয়েছেন। কিন্তু উত্তর-বৈদিক যুগে ভারতে যে বিরাট পৌরাণিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা ব্রাহ্মরা এবং ব্রিটিশ ওরিয়েণ্টালিস্টরা অস্বীকারই করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও 'বঙ্গদর্শন' রেনেসাঁসের প্রথমপর্বের ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ও সেই সূত্রে ব্রাহ্মদের মতামতের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মতানুযায়ী প্রাচীন ভারতের আর্যরা যে ইহবিমুখ ও পরলোকবাদী ছিলেন বঙ্কিম তা বিশ্বাস করেন নি। প্রাচীন ভারতীয়রা যে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে যৌবনোচিত শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তার প্রমাণ 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতে আছে। উত্তর-বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে যে বিস্তৃত পৌরাণিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং ব্রাহ্মরা যাকে অস্বীকার করেছিলেন, 'বঙ্গদর্শন' তাকেই পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিল। Revival of Puranism-

এর সূচনা হয় 'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠাতেই। বঙ্কিম নিজে পরবর্তীকালে পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে নতুন আলোতে ব্যাখ্যা করেন। নব্য-হিন্দু আন্দোলনের নায়কেরা এখান থেকেই পুরাণপ্রীতির সূত্র পেয়ে গেছেন। এঁরা পৌরাণিক ভারতবর্ষের জীবনধারাকেই 'আদর্শ' বলে মনে করেছেন এবং সেখানেই ফিরে যেতে চেয়েছেন। ভারতের পৌরাণিক যুগ তাঁদের কাছে জীবন্ত ও সত্য বলে প্রতিভাত হত। তাই দয়ানন্দের 'বৈদিক যুগে ফিরে চলা'-র আহ্বান সেদিন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। হেস্টির সঙ্গে বঙ্কিমের পত্রযুদ্ধের শেষে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৯৮) এক চিঠিতে বেদ অস্বীকৃতির জন্য বঙ্কিমের সমালোচনা করেছিলেন।[২৭]

নব্য-হিন্দু আন্দোলন আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয় ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। রেভাঃ উইলিয়ম হেস্টির (১৮৪২-১৯০৩) হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণের প্রত্যুত্তরে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ওই দিন বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজের অধ্যক্ষ হেস্টির সঙ্গে 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামের আঁড়ালে থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যে পত্রগুলি লিখেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ধর্মান্দোলন ও হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের ঐতিহাসিক ভূমিকা হিসাবে সেগুলি মূল্যবান দলিল।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজারের রাজবাটিতে একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মহারাজাদের গৃহদেবতা গোপীনাথজীকে রৌপ্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নিমন্ত্রিত ৪০০০ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা অধ্যাপক এবং সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত অনেক 'কৃতবিদ্য' বাঙালী উপস্থিত ছিলেন। ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ তারিখেই 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এই ব্যয়বহুল 'দানসাগর' শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের একটি বিবরণ প্রকাশিত হলে রেভাঃ হেস্টি যিনি আলেকজাণ্ডার ডাফের উত্তরাধিকারী বলে নিজেকে মনে করতেন, নীরব থাকলেন না। এর দুদিন পরে 'The Most striking facts of the Sradh' নামে হেস্টির একটি পত্র 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রে হেস্টি শিক্ষিত বাঙালীর পৌত্তলিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান যে মিথ্যাচার সেকথা বিশেষভাবে বলেন। পরের দিন 'স্টেটস-ম্যান' (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২) পত্রিকায় তাঁর ২য় পত্রে তিনি 'Supposed necessity of idolatry' সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। এর পর তিনি একাধিক

পত্র প্রকাশ করে হিন্দুধর্ম ও তাঁর প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। হেস্টির ৩য় পত্রে (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২) 'Alleged harmlessness of Idolatry' এবং ৪র্থ পত্রে (২৯শে, সেপ্টেম্বর ১৮৮২) 'Ultimate philosophy of Brahmanism' সম্পর্কে তাঁর তিক্ত মন্তব্য শোনা গেল। হেস্টি তাঁর চতুর্থ পত্রে বিশেষ করে 'all the emptiness and futility and unreality of the Brahmanical idea' সম্পর্কে বললেন এবং শঙ্করাচার্যের বেদান্তবাদকে ধিক্কৃত করে নিজে সিদ্ধান্ত জানাতে দ্বিধা করলেন না—'It is only *Christianity*, with its revelation of the Divine Personality in all the fulness of His self-existent thought and eternal purpose, than can rationally take place of the falling Brahmanism.'[২৮] খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া পৌত্তলিক ভারতবাসীর উন্নতির আশা নেই এমন সদম্ভ মন্তব্যও শোনা গেল।

এই পত্রের প্রত্যুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র 'The Modern St. Paul' শিরোনামে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একটি ক্ষুদ্র পত্র লেখেন। পত্রটি ৬ই অক্টোবর, ১৮৮২তে প্রকাশিত হলে খ্রীষ্টান বনাম হিন্দুর ধর্মবিতর্ক সুরু হয়। হেস্টির পৌনঃপুণিক আক্রমণে বিরক্ত হয়ে বঙ্কিম তাঁর তৃতীয় পত্রে (২৮ অক্টোবর, ১৮৮২) তিক্ত মন্তব্য করেন—'the intellectual superiority of Europe could only make a desperate bite at the husk of Hinduism but could not arrive at its karnel.'[২৯] অর্থাৎ হেস্টির আক্রমণ হিন্দুধর্মের বহিরঙ্গের 'ছোবড়া' পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে, তার 'শাঁস' পর্যন্ত নয়।

বঙ্কিমের মতে, হিন্দুর পৌত্তলিকতা পূজাপদ্ধতি আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে হিন্দুধর্মের স্থূল অংশ গঠিত। কিন্তু হিন্দুধর্মের সূক্ষ্ম অংশ দার্শনিকতায় গভীর। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনই সেখানে অম্বিষ্ট। বঙ্কিম বলেছেন—'the true explanation (consisted) in the ever true relation of the subjective Ideal to its objective Reality.'[৩০] এই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা সর্বসাধারণের বোধগম্য হবে না, তাই হিন্দু শাস্ত্রকারেরা সাধারণ মানুষের জন্য প্রতিমা পূজা নির্দিষ্ট করে গেছেন। তাছাড়া হিন্দুর ধর্মীয় অনুষ্ঠান মাত্রই পৌত্তলিক নয়, ব্রাহ্মণেরা যে সন্ধ্যাহ্নিক করে তা পৌত্তলিকতা নয়। বঙ্কিমের মতে অধিকার ভেদে সাকার ও নিরাকার উপাসনার ব্যবস্থা করে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা গভীর অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় দিয়েছেন। হেস্টির সঙ্গে

বঙ্কিমের পত্রযুদ্ধ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর সুরু হয়ে ১৪ নভেম্বর, ১৮৮২তে শেষ হয়।

এই বিতর্কের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, এই বিতর্কে উভয়পক্ষই ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মদের সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ধর্মবিরোধের দুটি প্রধান পক্ষ ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান পাদ্রীরা। ২০-র দশকের গোড়ায় রামমোহনের সঙ্গে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের বিরোধ সুবিদিত। ৬০-র দশকের গোড়ায় তরুণ ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। ফলে খ্রীষ্টান পাদ্রী ডাইসনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। তারই পরিণতিতে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রেভাঃ লালবিহারী দে ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও উপহাস প্রকাশ করেন। বস্তুত ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান সংঘর্ষ হিন্দু-খ্রীষ্টান সংঘর্ষেরই আরেক দিক। ইংরেজি শিক্ষিত তরুণ ভারতবাসী মেকলের প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে গ্রহণ করেছিল ব্রাহ্মধর্ম। পরবর্তীকালে ধর্মবিরোধ যা হয়েছিল তা ব্রাহ্মে ও খ্রীষ্টানে। হিন্দুধর্মের উপর হেস্টির এই আক্রমণে সর্বপ্রথম দেখা গেল ব্রাহ্মদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে বঙ্কিম একই ভাবে ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। কারণ হিন্দু-ধর্মের নব ব্যাখ্যায় এই বিরোধ অবান্তর বলে মনে হয়েছিল। বঙ্কিম হিন্দুধর্মের অন্তরঙ্গের 'শাঁসটুকু' (karnel) অনুসন্ধান করতেই চান, হিন্দু-ধর্মের পৌত্তলিকতা জাতিভেদ প্রভৃতি তাঁর কাছে বহিরঙ্গের 'ছোবড়া'-র (husk) অতিরিক্ত মূল্য পায়নি। বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের মধ্যে শাশ্বত উপাদানগুলি আবিষ্কারে অগ্রণী হয়েছিলেন, বঙ্কিমই প্রকৃতপক্ষে সে কাজ সুরু করেন।

সুতরাং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের সুরু এবং ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের সমাপ্তি একথা বললে অনৈতিহাসিক হবেনা। হিন্দুধর্মের 'শাঁসটুকু' আবিষ্কার করতে গিয়ে বঙ্কিম যে পদ্ধতি নিয়েছিলেন তাকে বলা যায় 'বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ'। বঙ্কিমকথিত **'rational Hinduism'** কথাটি গভীর অর্থবহ। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ এই যুক্তিবাদ হেস্টির সঙ্গে পত্রযুদ্ধে স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু ধর্মের বৃহত্তর ব্যাখ্যার দিকে তিনি যতই অগ্রসর হলেন ততই তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় বিতর্কে তাঁর অবলম্বিত 'বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ' পদ্ধতিই বঙ্কিমচন্দ্রের সব থেকে বড়

অবদান।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একথাও মনে হয় যে, সত্তরের দশকে কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মধ্যে আমরা যে আধ্যাত্মিক পিপাসা ও ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল আর্তি লক্ষ করেছি বঙ্কিম অবলম্বিত পথে তার সমাধান সম্ভব ছিলনা। ধর্মের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তরে আধ্যাত্মিক আলোর স্ফুরণ দেখাতে ব্রাহ্মধর্ম ব্যর্থ হয়েছিল। তার ফলে কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ আধ্যাত্মিক অন্বেষণের প্রেরণায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। শশধর, দয়ানন্দ বা অলকট-ব্লাভাৎস্কি প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকরা একটি অর্ধ-যুক্তিবাদের পথ ধরে এগিয়েছিলেন। তাঁদের অবলম্বিত পথে ব্যক্তির অন্তর পিপাসা নিবারণের কোন ইংগিত ছিলনা। বঙ্কিমের হাতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের যে ধারার সূত্রপাত হল তাও ছিল প্রধানত শুষ্ক বুদ্ধিচর্চা। ঈশ্বরীয় অনুভূতিতে সাধকের অন্তর যেখানে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে বঙ্কিমের প্রদর্শিত পথ সেখানে নিয়ে যেতে সক্ষম নয়। এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের। বঙ্কিমের মতে ধর্মের একটি 'নৈসর্গিক ভিত্তি' আছে। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মজিজ্ঞাসায় একথা সম্পূর্ণ নতুন।

রামমোহন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে **'argument from design'**-এর বিরোধী ছিলেন না। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের **'tradition'** ও **'instruction'** গুলি মানতেন যদিও শুধুমাত্র হিন্দুশাস্ত্রের উপর একান্ত নির্ভর না করে সার্বভৌম ঈশ্বর চেতনাকে খুঁজেছেন ইসলাম ও খ্রীষ্টান উভয় শাস্ত্রেই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনেকাংশে অমান্য করেন। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে তিনি ধর্মীয় জীবনের পথনির্দেশ পান, কিন্তু উপনিষদের সকল অংশকে সমর্থন করতে পারেন নি। বেদকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন নি। বস্তুত দেবেন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শের ভিত্তি শাস্ত্র প্রামাণ্য দ্বারা সমর্থিত হলেও তার ভিত্তি 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'।[৩১] ১৮৬০ সালে কেশব একেই বলেছেন 'প্রত্যাদেশসিদ্ধ সহজজ্ঞান'। তিনি তাঁর জীবনের এই পর্বে দেবেন্দ্রনাথের মত হৃদয়ের উপর নির্ভর না করে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের (**intution**) উপর নির্ভর করেছিলেন এবং জীবনের উত্তর পর্বে একেই ভক্তিতে পরিশুদ্ধ করে নেন।

কেশবের সঙ্গে বঙ্কিমের সময়ের ব্যবধান নেই। উভয়ের জন্ম একই সালে, ১৮৩৮-এ। কিন্তু চিন্তাজগতে এঁরা ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী। কেশব যখন

ধর্মে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ সন্ধান করছেন, বঙ্কিম তখন খুঁজছেন 'নৈসর্গিক ভিত্তি'। প্রথম জীবনে বঙ্কিম নাস্তিক ছিলেন।[৩২] ৮০-র দশকে যখন তিনি ধর্মের চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করতে অগ্রসর হন তখন ধর্মে অতিপ্রাকৃতকে সম্পূর্ণ বর্জন করলেন। বঙ্কিমের কাছে ধর্ম রহস্যময় অতিলৌকিক কোন ব্যাপার নয়, বাস্তবজীবনে কতগুলি অভ্যাসের দ্বারা তাকে পাওয়া সম্ভব।

বঙ্কিম প্রদত্ত ধর্মের এই সংজ্ঞায় সমকালীন ধর্মীয় বিতর্ক ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যে মতভেদ তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়েছে। বঙ্কিমের ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, তিনি চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বঙ্কিম ব্যাখ্যাত ধর্মের ভিত্তি কি ?

তিনি বলেছেন, সুখ মানুষের অভিপ্রেত, কতগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে এই সুখ উপলব্ধি করা সম্ভব। এই কাঙ্ক্ষিত সুখ লাভ করতে হলে মানুষের শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী এই চার প্রকার বৃত্তির স্ফূর্তি, বিকাশ ও সামঞ্জস্য আবশ্যক। বঙ্কিম মানুষের বৃত্তিসকলের এই সামঞ্জস্যকেই বলেছেন 'মনুষ্যত্ব'। কিন্তু মনুষ্যত্ব লাভই মানুষের চরম লক্ষ্য নয়, এই জন্য মানুষের বৃত্তিগুলি সমঞ্জসিত করে তাকে ঈশ্বরাভিমুখী করে তুলতে হবে। বঙ্কিম বলেছেন, 'সকল মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।' ('ধর্মতত্ত্ব', ১১ অ) এখানে ঈশ্বরের কথা উল্লিখিত হলেও বঙ্কিম মানবতাকে ত্যাগ করেন নি। কারণ তিনি ভাল-ভাবেই জানেন, 'মনুষ্যের প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই'। এবং এখান থেকেই আমরা মূল সিদ্ধান্তটিও পেয়ে যাই, প্রীতিযোগে সকল বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হওয়া হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত হিন্দুধর্মের কোন সংস্কার বা গৌরব বর্ধনের জন্য কোন আন্দোলন করেননি। তিনি সেযুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, তাই প্রধানত গীতাকে ভিত্তি করে হিন্দুধর্মকে নিজস্ব দৃষ্টিতে বিচার ও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিসিদ্ধ হিন্দুধর্মকে উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে হিন্দুধর্মকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে তৎকালে প্রচলিত আচারসেবিত হিন্দুধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) শেষ করে তিনি লিখেছেন—'আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে

মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন জাতি অধঃপাতে যাইবে ?'

বঙ্কিম শিক্ষিত বাঙালীর কাছে হিন্দুধর্মকে গৌরবের আসনে বসাতে পেরেছিলেন। তিনি ধর্ম ও স্বাদেশিকতাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তবে তিনি ছিলেন চিন্তানায়ক। তিনি হিন্দুধর্ম প্রচার করেন নি বা কোন আন্দোলন উপস্থিত করেন নি।

৪

শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-৮৬) ও বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) নব্য-হিন্দু আন্দোলনে বেগ ও শক্তি সঞ্চার করেন এবং আন্দোলনকে মর্যাদা দান করেন। বঙ্কিম হিন্দুধর্ম প্রচারে উৎসাহী ছিলেন না, সেদিক থেকে বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁর ভাবশিষ্য বিবেকানন্দ বিশ্বসভায় হিন্দুধর্মের বাণী শুনিয়ে বিশ্বকে মোহিত করেছিলেন। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রধানত প্রচলিত হিন্দুধর্মকে একটি পরিশুদ্ধ ও সমুন্নত রূপ দান করতে। তার জন্য রামমোহন বেদান্ত ও দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের সার সংকলন করেছিলেন। রামকৃষ্ণকে এসব কিছুই করতে হয়নি। বরং তিনি যুক্তিবাদী শাস্ত্রজ্ঞদের নিন্দা করেছেন, ধর্ম নিয়ে দলাদলি করাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। তাঁর আচরিত ধর্মের মূল কথা হল সমন্বয়বাদ ও সংশয়হীন ঐকান্তিকী ভক্তি। তিনি হিন্দুধর্মের তুচ্ছতম নির্দেশও পালনীয় মনে করতেন। কিন্তু তিনিই আবার সাম্প্রদায়িক ধর্মের গোঁড়ামির বহু উর্ধ্বে ছিলেন। সব ধর্মেই যে সত্য আছে এবং সব ধর্মের লক্ষ্যই যে এক একথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি হিন্দুর কালী মন্দিরের পূজারী হয়েও মসজিদে ইসলাম শাস্ত্রমতে নমাজ ও গীর্জায় যীশুর উপাসনা করেছিলেন। তন্ত্রমতানুসারে সাধনা শিক্ষা করেছিলেন তিনি। এ ছাড়া বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সখ্যভাবের এবং কর্তাভজা নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণবমতের অবান্তর সম্প্রদায়সকলের সাধনমার্গের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। এই শতাব্দীর সত্তরের দশকে যে আধ্যাত্মিক অন্বেষণ সুরু হয়েছিল তা রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনেও সত্য হয়ে দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পুনরুজ্জীবিত বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদে তিনিও ছিলেন দীক্ষিত। এই ভক্তিবাদের মধ্যে তিনি সব কিছু সহজেই মিলিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং শুধু আধ্যাত্মিক

উৎকণ্ঠা নয়, একটি পরমাপ্রাপ্তির মধ্যে তাঁর অন্বেষণ শেষ হয়। তাঁর অত্যুদার ধর্মীয় মতবাদ হিন্দুধর্ম সংস্কার প্রচেষ্টার মূলে (রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ থেকে যা সুরু হয়েছিল) কুঠারাঘাত করে এবং সনাতন হিন্দুধর্মে যাঁদের বিশ্বাস চলে গিয়েছিল তাঁদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে।

রামমোহন, (প্রথম জীবনে) কেশবচন্দ্র ও হিন্দুকলেজের যে সব শিক্ষিত ছাত্র ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই যুক্তিবাদী। বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিকে অবলম্বন করেই হিন্দুধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যায় অগ্রণী হয়েছিলেন। এমন কি পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিও এক ধরণের যুক্তিবাদকেই অবলম্বন করেছিলেন। অথচ ধর্ম হচ্ছে অন্তরের গভীরে উপলব্ধির বস্তু। যুক্তি তর্ক বিচারের শুষ্ক বালুরাশিতে তার স্থান নয়। গ্রাম্য, প্রায় অশিক্ষিত, মন্দিরের পুরোহিত গদাধর চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করলেন ভব-তারিণীর মূর্তির মধ্যে। এর কাছে সংকীর্ণ ধর্মবিরোধ ও সামাজিক সমস্যা তুচ্ছ হয়ে গেল। তিনি অপ্রতিম গ্রাম্যভাষায় নাগরিক মানুষের কাছে সেই ঈশ্বরোপলব্ধি ও সাযুজ্য লাভের কথা ঘোষণা করেন, যার আবেদন শুধু মানুষের বুদ্ধির কাছে নয়, অন্তরে।

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় বিরোধের অবসান হল রামকৃষ্ণের উপলব্ধিতে ও উপদেশে। তিনি সব প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই তিনি বুঝেছিলেন, ঈশ্বর মূলত এক, শুধু সাধনার পথ ভিন্ন। 'যত মত তত পথ' ছোট্ট সরল অথচ অবিস্মরণীয় তাঁর একটি উপদেশ। এর বীজ হয়ত হিন্দু শাস্ত্রেই ছিল। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। তা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণের এই সরল উক্তি যুগের মর্মভেদ করেছিল। এরূপ সহজ অসংখ্য উদাহরণ উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় বিরোধ ও বিদ্বেষ মিটিয়ে দিল।

রামমোহনের আবির্ভাবের পর থেকেই সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীদের দ্বন্দ্ব চলেছিল। মনীষী রাজনারায়ণ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করেও হিন্দুর পৌত্তলিকতা মানতে পারেন নি। আবার ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র নিরাকার উপাসনায় মনের অশান্তি দূরীভূত না হওয়ায় উত্তর জীবনে সাকার উপাসনায় আগ্রহী হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণকে কিছুই ত্যাগ করতে হয়নি। তিনি বললেন, সাকার ও নিরাকার উভয় উপাসনাই সত্য। তিনি বললেন—'দেখ ভগবান আসলে নিরাকার, কিন্তু ভক্তের আকাঙ্ক্ষায় তাঁকে রূপ নিতে

হয়। যেমন, মহাসমুদ্র—কেবল জল—কিন্তু তারই মাঝে মাঝে ঠাণ্ডায় হিমে জল জমে বরফ হয়ে গেছে। এও ঠিক তাই। ভগবান জলের মতই নিরাকার। কিন্তু ভক্তের ভক্তিরূপ হিমে তাঁকে মাঝে মাঝে আকার ধারণ করতে হয়।'[৩৩] তিনি আরও বলেছিলেন, একজন জ্ঞানী ও সাধক নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যান করতে পারেন, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ মানুষের জন্য প্রয়োজন কোন প্রতীক। 'যেমন সোনার আতা, মাটির হাতি দেখলে আসল আতা ও হাতি মনে পড়ে। সেই রকম প্রতিমা দেখে ঈশ্বরকে মনে পড়ে।' এবং এ সত্য রামকৃষ্ণের জীবনেই পরীক্ষিত হয়েছিল বলে তাঁর এই মত ব্রাহ্মদের সাকার উপাসনা ও প্রতিমা পূজার বিরোধিতাকে হীনবল করে। রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তী ব্রাহ্মরা বেদ বেদান্ত উপনিষদ মানলেও পৌরাণিক হিন্দু ধর্মকে স্বীকার করেন নি। তাঁদের এই মনোভাব রেনেসাঁসের প্রথমপর্বের ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু এখন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সুদৃঢ় সমর্থন লাভ করল। রামকৃষ্ণের সাধনায় পৌরাণিক হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবিত হল (Revival of Puranism) বলা চলে। তিনি প্রাচীন পৌরাণিক ধর্মে একটি নতুন মাত্রাও যুক্ত করেছিলেন এবং প্রতিমা পূজার মাধ্যমে নিজের অন্তরে আধ্যাত্মিক আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও বাণীবাহক। তাঁর যৌবন কেটেছিল নবগোপাল মিত্র ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবের মধ্যেই। নরেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের 'নববৃন্দাবন' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউসনের বিখ্যাত অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেস্টির প্রিয় ছাত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির কাহিনীমূলক বক্তৃতার উৎসাহী শ্রোতা। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের বিচ্ছেদের পর তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'-এর (১৮৭৮) গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে দার্শনিক হিউমের সংশয়বাদ (Scepticism) ও হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদের (Doctrine of unknowable) সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ক্রমেই হয়ে পড়লেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়বাদী। ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্যের ফলে ঈশ্বরের নিরাকারত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা গড়ে ওঠে কিন্তু মনের সংকট দূর হয় না। তিনি চেয়েছিলেন এমন একজন দরদী মানুষ যিনি তাঁর সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় দূর

করতে সক্ষম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বের আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা ও সংশয়-বাদ তাঁকেও তাড়না করেছিল। ছাত্রজীবনে কলকাতায় একবার সুরেন্দ্র-নাথ মিত্রের বাসায় এবং তারপর দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮২ সালের ৫, ৬ই মার্চ তারিখে রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক অন্বেষণের সুগভীর প্রেরণায় ভক্তিবাদী রামকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করলেন। এর পর থেকেই নরেন্দ্রনাথ তাঁর অনুরাগী ভক্ত ও বাণী প্রচারক।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে ভারত ত্যাগ করে চিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দেন। তাঁর পূর্বে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রও য়োরোপে ভারতের মুখপাত্র হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ বিবেকানন্দের মতো সনাতনপন্থী ছিলেন না। সেখানে তিনি হিন্দু ধর্মের গভীর তত্ত্ব বিশ্ববাসীকে শোনালেন অনুপ্রাণিত ভাষায়, অপূর্ব যুক্তি জাল বিস্তার করে। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের কথা শুনে জগৎবাসী চমৎকৃত হয়ে গেল। বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে দীর্ঘ চার বৎসর য়োরোপের বিভিন্ন দেশে রামকৃষ্ণের ও হিন্দু ধর্মের বাণী প্রচার করেন। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন জানুয়ারী, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ে একটি নতুন বোধ জাতির অন্তরে সঞ্চারিত হল যে, আমরা রাজনৈতিকভাবে পরাধীন ও আর্থিকভাবে দরিদ্র হতে পারি কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পদে আমরা দীন নই। নব্য-হিন্দু আন্দোলনে বিবেকানন্দের গুরুত্ব এইখানে যে তিনি একটি জাতির হীনমন্যতা দূর করে তাকে গৌরববোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণের মত বিবেকানন্দও ছিলেন বেদান্তের অদ্বৈতবাদী। উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের প্রথম মানব রামমোহনও বেদান্তকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে বেদান্তবাসী হলেও বাস্তবজীবনে তাঁকে গ্রহণ করেন নি। কারণ মায়াবাদ ও বাস্তবকে অস্বীকার উনবিংশ শতাব্দীর ইহমুখী ও মানবতাবাদী চিন্তার বিরোধী। অথচ বেদান্তবাদী হয়েও বিবেকানন্দকে বাস্তবজীবন পরিত্যাগ করতে হয়নি। বরং 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা' অপেক্ষা তিনি নরসেবাকেই উচ্চস্থান দিয়েছিলেন। বেদান্তকে ছড়িয়ে দিয়ে-ছিলেন দরিদ্রতম মানুষের কল্যাণে।

উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে যে অধ্যাত্ম সন্ধান সুরু হয়েছিল এবং

যা আমরা কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে লক্ষ করেছি বিবেকানন্দের মধ্যেও তা দেখা গেছে। তিনি প্রথম যৌবনে আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠার জন্য নির্বিকল্প সমাধি কাম্য বলে মনে করেছিলেন, পরবর্তীকালে হিমালয়ের নির্জনতায় প্রস্থান করেছিলেন ধ্যানমগ্নতার মধ্যে আত্মমুক্তির স্বাদ অনুভব করার জন্য। কিন্তু নিরন্ন মানুষের দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করেছিল। তাই সাধনার উচ্চ বেদি থেকে তাঁকে সাধারণ মানুষের সমতলে নেমে আসতেই হল। বিবেকানন্দ তাঁর এক শিষ্যকে একবার বলেছিলেন—'ইচ্ছা করলে আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি।...তবে কেন ঐরূপ করি না? কেনই বা এদেশে রয়েছি? কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারিনে। সমাধি ফমাধি তুচ্ছ বোধ হয়।'[৩৪] এই কারণে জ্ঞানযোগীকে কর্মযোগী হতে হয়। মঠনির্মাণ, সঙ্ঘস্থাপন সেবাব্রত ইত্যাদির মধ্যে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' গুরুর কাছ থেকে পাওয়া এই মহামন্ত্র তাঁর জীবনে সার্থক হয়ে উঠেছিল। বস্তুত বিবেকানন্দের কর্মে মননে এক দিকে বেদান্তের 'তত্ত্বমসি', অন্যদিকে জনজীবনের প্রতি নিবিড় প্রেম যা চিরাচরিত ভারতীয় বৈরাগ্যধর্মের বিরোধী। বরং একথাই বলা যায়, সাধকের কাম্য স্বর্গ তিনি চাননি, বেদান্তকে প্রয়োগ করেছেন 'লোকহিতায়'। লোকহিতের এই বাসনা উনবিংশ শতাব্দীরই দান।

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি শিক্ষিত, দর্শনের জিজ্ঞাসু ছাত্র, হিউম-স্পেনসারের ভক্ত বিবেকানন্দ মূলত ছিলেন যুগভাবনারই শরিক। খ্রীষ্টান ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ হিন্দুধর্মের প্রতি যে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়েছিল তা প্রতিরোধও তিনি করতে চেয়েছিলেন। সেদিক থেকে বঙ্কিমের সঙ্গে বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যের মিল আছে। রামকৃষ্ণ সমকালীন ধর্মবিরোধ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন সেই যুগেরই প্রতিনিধি। রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যতখানি ব্যক্তিগত বা হৃদয়গত ততখানি মননগত নয়। বরং যুক্তিবাদের দিক থেকে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য বেশি। 'পরিব্রাজক'-এর (১৯০৩) পত্রাবলীতে তিনি দেশের আত্মশাসনের ভার নবজাতকদের হাতে, সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিতে বলেছেন। এই বক্তব্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকশিক্ষা'-র বক্তব্যের মিল আছে। 'সমাজচিন্তায় তাঁর (বিবেকানন্দের) প্রগতিবাদ বঙ্কিমচন্দ্রেরই সন্নিহিত।'[৩৫] কিন্তু তফাৎ এইখানে যে বঙ্কিমের কাছে ধর্মালোচনা তাঁর বুদ্ধিচর্চারই অন্তর্ভুক্ত,

বিবেকানন্দের কাছে ধর্মই জীবনচর্চা। এই কারণে ধর্মীয় বিতর্কে বঙ্কিমের মত পরাজিতের পক্ষাবলম্বন করে নয়, তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি নিক্ষিপ্ত 'চ্যালেঞ্জ'-এর সম্মুখীন হয়েছিলেন বিজয়ী বীরের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে।

৫

এখন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের তিনটি দশকের বাঙালীর সমাজ মন ও সাহিত্য বিবেকের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। এই কাল পর্বে নব্য-হিন্দু আন্দোলন হিন্দুধর্মে যে নতুন আবেগ সঞ্চারিত করেছিল সেখানে কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত উদার মানবধর্ম ও সেবাধর্মের কোন প্রভাব নেই। শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁর শিষ্য পদ্মনাথ দেবশর্মাকে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন[৩৬]—তিনি রামকৃষ্ণকে 'পরমহংস' বলে স্বীকার করেন না। তাঁকে তিনি একজন 'মহাশয় লোক' বলেই জানেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ সম্পর্কে নিরুৎসাহীই ছিলেন। পরমহংসদেবের সঙ্গে বঙ্কিমের একবার সাক্ষাৎকার হয়েছিল বলে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-এ উল্লেখ আছে কিন্তু দুজনের মধ্যে মতসাম্য কিছুই হয়নি।[৩৭] হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের দিনে রামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়ী উদার ধর্মমত পরিত্যক্ত হয়েছিল, 'জাতি বৈরিতা' দেখা দিয়েছিল। জগতের সকল ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ এ কথা প্রতিপাদনে হিন্দুধর্মের নব ব্যাখ্যাতারা আগ্রহ দেখান। বিবেকানন্দের মানবসেবা ধর্ম ও মহৎ স্বার্থত্যাগের আদর্শ নীতি হিসাবে আকর্ষণ করলেও অনেকেই জীবনে তার প্রয়োগ চাননি। একজন বিদেশী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে জাতির এই প্রবণতা অভ্রান্তভাবে ধরা পড়েছে :

> The challenge Vivekananda presented to Indians to reform totally their religions and social life was not accepted, because on the one hand it called for too great a self-sacrifice from the still complacent educated and privi-ledged groups and on the other hand demanded and uprooting of the tradititional customs and beliefs unacceptable to the general populace.[৩৮]

'বিবেকানন্দের আচরিত সন্ন্যাসধর্ম, য়োরোপীয় জড়বাদের প্রতি বিতৃষ্ণা, ঐতিহ্যবাদের সূত্রে হিন্দুসুলভ অহংকারবোধ'[৩৯] এগুলিতেই হিন্দুসমজা

উৎসাহিত হয়েছিল বেশি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' প্রভৃতি ব্যাখ্যায় যে মনস্বিতা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রবল যুক্তিবাদ আশ্রয় করেছিলেন, বাঙালীর সমকালীন মন তার 'অভ্রভেদী চূড়া' স্পর্শ করতে পারেনি। বরং সে তুলনায় সহজ ছিল পুরাতন সহজ জীবনে ফিরে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে তা-ই হয়েছে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের তিনটি দশকে লক্ষ করি শতাব্দীর প্রথম পর্বের প্রতিটি প্রগতিবাদী আন্দোলন প্রত্যাহৃত হতে। প্রচার, নবজীবন, সাহিত্য, বঙ্গবাসী, নব্যভারত, বেদব্যাস, সাধারণী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনাগুলিতে তৎকালীন সমাজ মানসিকতার পশ্চাৎগামিতা সহজেই চোখে পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে 'বিধবাবিবাহ' (১৮৫৬) একটি শক্তিশালী আন্দোলন যা শুধু সামাজিক না থেকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। সেই বিধবাবিবাহ সত্তরের দশকে নিন্দিত হল। আদি ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ প্রথমাবধি বিধবাবিবাহ বিরোধী। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) উপন্যাসে সূর্যমুখীর উক্তির মাধ্যমে (১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ) বিধবাবিবাহের প্রতি বঙ্কিম তাঁর বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। 'বঙ্গদর্শন' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১) পত্রিকায় প্রকাশিত 'দ্বিতীয়বার বিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধ একই মনোভাব থেকে লিখিত। গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের নাটকেও বিধবাবিবাহের প্রতি নিষেধের অঙ্গুলি উদ্যত। মহর্ষির প্রতিবাদ সরব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবাদ একটি বা দুটি ঔপন্যাসিক চরিত্রের মুখে মন্তব্যের আকারে উচ্চারিত হওয়ায় সমাজে তার প্রভাব ছিল অননুভূত। কিন্তু এই পর্বে অক্ষয়কুমার সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। বিভিন্ন বক্তৃতায় ও পত্রিকার মাধ্যমে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে তিনি অনলস চেষ্টা করে গেছেন। ২৮শে বৈশাখ, ১২৯২ (মে, ১৮৮৫) সালে সাবিত্রী লাইব্রেরীর ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে তিনি 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না?' এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র তরুণ বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৫-১৯৩২) ছাড়া কেউ অক্ষয়কুমারের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন না। অক্ষয়চন্দ্র মূল বক্তব্যের প্রারম্ভে হিন্দুর বিবাহ প্রথার আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকভাবে

কিছু বলেছিলেন এবং সেখানে চন্দ্রনাথ বসুর (১৮৪৪-১৯১০) বক্তব্য উদ্ধৃত করেছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন, চন্দ্রনাথ বিধবাবিবাহ সম্পর্কে পৃথক্-ভাবে কিছু বলেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে ইয়ংবেঙ্গল দল হিন্দুর জাতিভেদ প্রণালীকে নিন্দিত করেছেন। এঁরা হিন্দু সমাজের নানা বিন্যাস সম্পর্কে নীরব ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান এই তিন জাতির মধ্যেকার পার্থক্য বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। হিন্দুত্বের জাগরণের কালে 'আদি-ব্রাহ্ম'-নেতা রাজনারায়ণ বসু জাতিভেদের পক্ষে ওকালতি করেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রায় সনাতন হিন্দুপন্থীদের মত। জাতিভেদের সমর্থনে তিনি সুজনবিদ্যাব (Eugenics) সাহায্য নিয়েছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁর 'High education in India' প্রবন্ধে জাতিভেদের নিন্দা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বক্তব্য সংশোধন করে জাতিভেদের প্রশংসামূলক প্রবন্ধ লেখেন 'বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র' নামে ('নবজীবন', মাঘ, ১২৯২)। চন্দ্রনাথ আত্মকথায় লিখেছেন, উক্ত প্রবন্ধ পাঠ কবে বঙ্কিম-চন্দ্রও জাতিভেদ সম্পর্কিত নিজ মত পরিবর্তন করেছিলেন।[৪০]

রামমোহন রায়ের প্রণোদনায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ করে আইন হয় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে। রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭ ১৮৪৮) সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে ধর্মসভা স্থাপন করেছিলেন। এই প্রথার হৃদয়হীনতা সম্পর্কে 'ধর্মসভা'-র সদস্যরা অবহিত ছিলেন। তাঁদের প্রতিবাদ তখনই উচ্চকিত হল যখন তাঁরা দেখলেন ইংরেজ শাসক এ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করে সমাজের অধিকার হরণ করেছেন। এই আন্দোলনের দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পর চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২১) 'বঙ্গদর্শনে' (আষাঢ়, ১২৮৪) 'সতীদাহ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি এই সামাজিক কুপ্রথাকে সমর্থনও করেছিলেন, যদিও চন্দ্রশেখরের বক্তব্য 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করেনি। চন্দ্রশেখরের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে 'সতীদাহ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন নগেন্দ্রনাথ চটোপাধ্যায় ('বঙ্গদর্শন', কার্তিক, ১২৮৪)। সমাজের 'উজান স্রোতের কালে' চন্দ্রশেখরের কাছে সতীদাহের মত একটি নির্মম প্রথাও সমর্থনযোগ্য মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের একটি আলংকারিক বর্ণনা আপাতদৃষ্টিতে সতীদাহের সমর্থনসূচক মনে হয়।[৪১]

এই কালপর্বে হিন্দুর 'বাল্যবিবাহ ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল। 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠী মোটামুটিভাবে বাল্যবিবাহ সমর্থন করত। বাল্য-বিবাহ যে আমাদের শারীরিক দুর্বলতার কারণ, বেহরামজী এম. মালাবারির এই অভিমত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শোভাবাজার রাজবাটিতে হিন্দুর পরিণয় প্রথা নিয়ে যে 'সেমিনার' হয়েছিল (৬ আগষ্ট, ১৮৮৭) তার বক্তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন 'বঙ্গদর্শন' গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ। এঁদের অন্যতম তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গোন্নয়ন' ('বঙ্গদর্শন', ফাল্গুণ, ১২৮৫) প্রবন্ধে হিন্দুর বাল্যবিবাহকে প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন। বাল্যবিবাহকে চন্দ্রনাথ বসু অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন যা এই পর্বে অন্য কেউ করেন নি। অবশ্য বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন প্রসন্ন ছিল না ; তিনি বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক অধঃপতনের জন্য বাল্যবিবাহকে দায়ী করেছেন (দ্র. 'আহার Vs বিবাহ', 'বঙ্গদর্শন' ভাদ্র, ১২৮৮)।

যে বিদ্যাসাগর একদা 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় (আগষ্ট, ১৮৫০) 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে একটি আন্দোলনের শুভ সূচনা করেছিলেন তিনিও বার্ধক্যে তাঁর প্রবর্তিত সামাজিক আন্দোলনগুলির ব্যর্থতা লক্ষ করে কিছুটা দেশাচার-সচেতন হয়ে উঠেছিলেন বলে মনে হয়। সহবাস-সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে অভিমত জানিয়ে তিনি ভারত সরকারের কাছে যে চিঠি দিয়েছিলেন (১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১) তাতে তিনি পরোক্ষে হিন্দুর বাল্যবিবাহকে সমর্থন করেছেন। এ ঘটনাকে নিছক 'বার্ধক্যের দুর্বলতা' বলা যায় না, হয়ত কালান্তরের অমোঘ নির্দেশ তিনি লক্ষ করেছিলেন ।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করে 'সত্য' 'ধর্ম' ও 'আনন্দ'. প্রচারের জন্য 'প্রচার' প্রকাশ করেছিলেন, (সূচনা, 'প্রচার', শ্রাবণ, ১২৯১) এ কথা ঘোষিত হলেও বস্তুত বঙ্কিম এই পর্বে সাহিত্যিকের উদার ভূমিকা ত্যাগ করে প্রচারকের সংকীর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই এই পর্বেই তাঁর কণ্ঠে শোনা গেছে 'সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চ আরোহণ করিও।'[৪২]

যে বঙ্কিম একদা রামধন পোদ ও মুচিরাম গুড়ের মত সাধারণ মানুষের জীবনচরিত রচনা করেছিলেন তিনিই এখন 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'ধর্মতত্ত্ব'

(১৮৮৮) এবং 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' আলোচনায় মগ্ন। 'কৃষ্ণচরিত্র' 'ধর্মতত্ত্ব' আলোচনা করার সময় বঙ্কিম ঈশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকেছেন এবং কোম্‌তে ও মিলের মানবতাবাদের সঙ্গে গীতার ঈশ্বরবাদ জুড়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু রচনা করতে চেয়েছেন। শেষজীবনে তিনি ইহমুখী হিতবাদ বিসর্জন দেন। এর পূর্বেই 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫)-এ মিলের দর্শনকে 'উদরদর্শন' বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। 'সাম্য' (১৮৭৯) বহুল প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমের পরিবর্তিত মানসতায় মনে হল তা 'ভুল'। তাই 'সাম্য'-এর প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এখন তাঁর মনে হচ্ছে, 'অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ, কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ'। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ গুরু শিষ্যকে বলছেন, 'ভূত জানিবে বহির্বিজ্ঞানে, আপনাকে জানিবে অন্তর্বিজ্ঞানে, ঈশ্বর জানিবে হিন্দুশাস্ত্রে—উপনিষদে দর্শনে পুরাণে ইতিহাসে বিশেষত গীতায়'। এই মনোভাব নিশ্চিত একদেশদর্শী এবং নব্য-হিন্দু চিন্তা প্রভাবিত। তা সত্ত্বেও বলা যায় বিভিন্ন পাশ্চাত্য মনীষীর মত ও ভগবদগীতার তত্ত্বকে মিলিয়ে তিনি যে একটি নিজস্ব ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সঙ্গে প্রচলিত হিন্দুধর্মের কোন যোগ নেই। কিন্তু বঙ্কিম-চন্দ্রের এই জ্ঞান প্রতিপাদ্য ধর্মাদর্শকে তাঁর অনুগামীরা বহন করতে পারেন নি। শশধর তর্কচূড়ামণি প্রচলিত ও আচারনিষ্ঠ হিন্দুধর্মকেই যুক্তির দ্বারা সমর্থন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। চন্দ্রনাথের অভিষ্টও তা-ই। তবে শশধর আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি যুক্তির নামে যা প্রয়োগ করেছিলেন তাকে বলা যায় অর্ধ-যুক্তিবাদ (pseudo rationalism)। অপরপক্ষে চন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। তাই তিনি আধুনিক যুক্তির ব্যূহ রচনা করে প্রাচীনকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাই চিন্তায় শশধরের প্রভাব থাকলেও তিনি শশধরপন্থী নন। তিনি ভূদেবশিষ্য—যদিও ভূদেবের মানসিক ঔদার্য চন্দ্রনাথের ছিল না।

যুগপুরুষ তিনি নন, যুগকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা চন্দ্রনাথ করেন নি। যুগধাত্রীর কোলে লালিত পালিত হয়েছিলেন বলে তাঁকে যুগশিশু (child of the age) বললেই ঠিক হয়।

চন্দ্রনাথ বসুর জীবনী

১

সন ১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র (ইংরেজি মতে ৩১শে আগষ্ট, ১৮৪৪)[১] চন্দ্রনাথের জন্ম হয় হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে। কৈকালা সেকালের একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। মাতৃভূমি কৈকালার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন চন্দ্রনাথ, 'কৈকালা তখন জনপূর্ণ ছিল। তথায় প্রায় একশত ঘর ব্রাহ্মণ এবং প্রায় চারিশত ঘর তন্তুবায় ছিল। কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতিও অনেক ছিল। সকলেই একরকম স্বচ্ছন্দে ছিল। কারণ ধান চাল সস্তা ছিল এবং স্বাস্থ্যসুখে কেহ বঞ্চিত ছিল না। কৈকালায় মিহি মোটা বিস্তর বস্ত্র বয়ন হইত—সে বস্ত্রের বড় আদর ছিল।···কৈকালার প্রকৃত ধনাঢ্য তন্তুবায় ছিল।'[২] স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে এই অঞ্চল ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। চন্দ্রনাথ তাঁর আত্মকথায় এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি ভাগীরথীর পশ্চিমকূলস্থিত জেলাসকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর ছিল। কলিকাতায় পীড়া হইলে আমরা গ্রামে যাইতাম এবং বিনা চিকিৎসায় তথায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতাম এবং মহোল্লাসে খাইয়া খেলাইয়া বেড়াইতাম।'[৩]

কৈকালা গ্রামের বসু পরিবার ওই অঞ্চলে 'ধর্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান হিন্দু'[৪] বলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এঁরা ধনী ছিলেন না, কিন্তু পল্লীবাসীদের প্রতি স্নেহে সহানুভূতিতে সকলের প্রিয় ছিলেন। এই পরিবারের কাশীনাথ বসু, চন্দ্রনাথের পিতামহ। কাশীনাথের চার পুত্র—তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ সীতানাথ বসু, চন্দ্রনাথের পিতা। সীতানাথ বসু তাঁর পিতৃদেবের পদাংক অনুসরণ করে তাঁরই মত ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। চন্দ্রনাথের মানসভূমিতে এই পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব ছিল গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। সীতানাথের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথ ও কনিষ্ঠ চন্দ্রনাথ এবং তিন কন্যা

ছিল—সুরধুনী, মন্দাকিনী ও বরদাসুন্দরী।

চন্দ্রনাথের বয়স যখন পাঁচ বৎসর সেই সময় তাঁর যথারীতি হাতে খড়ি হয় এবং গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি প্রবেশ করেন। বসু পরিবারের বাড়ীতেই পাঠশালা বসত। শিশুকালে চন্দ্রনাথের স্বভাব ছিল চঞ্চল। তিনি পরিণত বার্ধক্যে সেকথা স্মরণ করে লিখেছেন, 'তখন আমার বয়স ৮।১০ বৎসরের বেশি নয়। আমি তখন পাঠশালায় পড়ি, আমার স্বভাব কিছু চঞ্চল কিন্তু আমি দুষ্ট বা দুরন্ত নই। আমার চঞ্চলতা দেখিয়া আমাদের এক বয়স্ক কুটুম্ব আহ্লাদ করিয়া আমাকে বিচ্ছু বলিয়া ডাকেন। তাহাতে আমি ভারী খুসী ?'[৬] চঞ্চলতা সত্ত্বেও তাঁর মেধার জন্য পাঠশালার গুরুমশায় তাঁকে স্নেহ করতেন। উদয় নামে একজন গুরুমশায় এই পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। তাঁর অসাক্ষাতে অপরাপর বালকদের সঙ্গে চন্দ্রনাথও তাঁকে 'উদো মশায়' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু তিনি শিশু চন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসতেন। চন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, 'সদর বাড়ীতে পাঠশালা বসিত। সেখান হইতে আমাদের অন্দরবাটি কিছু দূর। মনে আছে, একদিন অপরাহ্নে বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া গুরুমহাশয় একটি গোলপাতার ছাতা মাথায় দিয়া আমাকে কোলে করিয়া অন্দরবাটিতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন।'[৭]

সীতানাথ বসু তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্য কলকাতায় সিমলা বাজারের সম্মুখে বাসা ভাড়া করে থাকতেন। চন্দ্রনাথের বয়স যখন ৮ বৎসর, সেই সময় তিনি কলকাতায় আসেন এবং 'হেদোর স্কুলে' (আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রতিষ্ঠিত হেদুয়ার জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনস্‌টিটিউশন) তাঁকে ভর্তি করা হয়। সম্ভবতঃ বাসার নিকটবর্তী হওয়ায় বালক চন্দ্রনাথের যাতায়াতের সুবিধা হবে এই বিবেচনায় তাঁকে ওই স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। খ্রীষ্টানদের পরিচালিত স্কুলে সকলকেই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়ে থাকে এই কাল্পনিক ভয়ে শিশু চন্দ্রনাথ সর্বদা সংকুচিত হয়ে থাকতেন। জেনারেল এসেম্‌ব্লিজে তিনি মাত্র ছ'মাস পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। তারপর চন্দ্রনাথের পিতা তাঁকে সেকালের প্রখ্যাত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির (১৮২৯) শাখা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি শিক্ষানুরাগী গৌরমোহন আঢ্যের (১৮০৫-৪৫) প্রতিষ্ঠিত। চীৎপুরের মূল বিদ্যালয় ছাড়াও এর তিনটি শাখা ছিল—একটি কলকাতায়, চীৎপুরে মূল বিদ্যালয়ের নিকটে, একটি ভবানীপুরে আর একটি বেলঘরিয়ায়। চন্দ্রনাথ

এই স্কুলের কলকাতা-শাখায় ভর্তি হন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্যের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। সে সম্পর্কে বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখেছেন, 'এক হিসেবে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি হিন্দু কলেজের (১৮১৭) বিপরীত দিকে চলিয়াছিল। হিন্দু কলেজ বিলাতী উচ্ছৃঙ্খলতার গৌরব করিত। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি সামাজিক সংরক্ষণনীতির প্রশ্রয় দিয়া প্রাচ্য আদর্শকে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না বলিয়া দৃঢ় সংকল্প হইয়া বসিয়াছিল।'[৮]

চন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন, 'মূল স্কুলে ইংরাজি সাহিত্যের বড়ই আদর ছিল…অংক ও বাংলায় তত মনোযোগ ছিল না।'[৯] ওই বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র অমৃতলাল বসু একটি স্মৃতি কথায় উল্লেখ করেছেন, 'নিম্নতম শ্রেণীতে ইংরাজী ভাষা শিখাইবার জন্য তিনি (গৌরমোহন) ফিরিঙ্গি শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন…মাঝের শ্রেণীগুলিতে ভাল ভাল বাঙ্গালী শিক্ষক রাখা হইত।'[১০] 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ছেলেরা ইংরেজ শিক্ষকের নিকটই ইংরাজী শিখিত বটে, কিন্তু তাহারা জাতিধর্ম বিরোধী হইয়া জাতীয় আদর্শচ্যুত হয় নাই।'[১১] তৎকালীন প্রসিদ্ধ 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় (১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১) এই বিদ্যালয়ের উপর রচিত একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির কিছু অংশ এইরূপ—

অতএব নিবেদন করি মহাশয়।
বালককে শিখাইতে বাঞ্ছা যার হয়॥
উচিত তাহার ঐ স্থানেতে পাঠান।
রাখিয়া আপন ধর্ম হইবে বিদ্বান॥

এই বিদ্যালয়ে সে যুগের অনেক খ্যাতিমান ছাত্র পাঠ নিয়েছিলেন যাঁরা পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর নানামুখী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। চন্দ্রনাথ বাল্যকালে পারিবারিক আবহাওয়াতেই হিন্দুধর্মের লোকাচারকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পাঠকালে প্রাচ্য ধর্ম ও আচার তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

এনট্রান্স ক্লাসে উঠবার এক বৎসর পূর্বে চন্দ্রনাথ শাখা স্কুল থেকে মূল স্কুলে যান। ইতোমধ্যে চন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্যে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। এখানে তাঁর পোপের 'ইলিয়াড' পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখানে সহপাঠী হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন মদনমোহন দে (জন্ম : ১২৪৯) ও গৌরীশঙ্কর দেকে। মূল স্কুলে

প্রধান শিক্ষকরূপে চন্দ্রনাথ পেলেন সুবিখ্যাত কৈলাসচন্দ্র বসুকে। কৈলাস বসু হিন্দু কলেজের অন্যতম সেরা ছাত্র ছিলেন। 'বেথুন সোসাইটি'র সক্রিয় সদস্য তিনি। শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা জন উড্রোর অনুরোধে সোসাইটির একটি সভায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ইতিহাস বিবৃত করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি **Hindoo Female Education** সম্পর্কে সোসাইটিতে বলেন (১৮৫৭) এবং সতীর্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় 'লিটারারি ক্রনিকল' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৪৯)। কৈলাসচন্দ্র চন্দ্রনাথকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির অপরাপর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ ডি. এল. রিচার্ডসন, হার্মান জেফ্রয়, উইলিয়ম কার্ক প্যাট্রিক, রবার্ট ম্যাকোঞ্জ, ক্যাপ্টেন পামার প্রমুখেরা। হিন্দু কলেজে ডি. এল. রিচার্ডসনের কাছে মধুসূদন, ভূদেব, রাজনারায়ণ প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ছাত্ররা পাঠ নিয়েছিলেন। শেকস্‌পীয়র পড়ানোয় তাঁর খ্যাতি কিংবদন্তীতে পরিণত। রিচার্ডসনের শিক্ষাদানের পদ্ধতি চন্দ্রনাথের স্মৃতিতেও উজ্জ্বল ছিল। পরবর্তীকালে স্মৃতি-কথায় তিনি বলেছেন, 'যখন জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ Preparatory ক্লাসে পড়ি তখন রিচার্ডসন সাহেব আমাদিগকে দুই একদিন পড়াইয়াছিলেন। এনট্রান্স পাঠ্যের মধ্যে Roger's Pleasures of Memory নামক কাব্য ছিল। একদিন সাহেব Rogers, Goldsmith, Campbell, Akenside, Thomson প্রভৃতি descriptive কাব্য প্রণেতাদের দোষগুণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তেমন কথা আর কখন শুনি নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কাছে দুই চারদিনের বেশী পড়া হয় নাই। ...দুই দিনেই বুঝিয়াছিলাম যে, ইংরাজী সাহিত্যের তাঁহার মত অধ্যাপক বঙ্গে আর আসেন নাই।'[১২]

ইংরেজি শিক্ষার গভীর প্রভাবের ফলে চন্দ্রনাথের স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয় এবং ইংরেজি বিদ্যার অন্যতম অবদান যুক্তিবাদের (reasoning) প্রতি তাঁর মন ধাবিত হয়। ফলে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত ওরিয়েণ্টাল ডিবেটিং ক্লাবের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। সেখানে প্রবন্ধ রচনায় ও পাঠে তিনি ক্রমেই পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে তাঁর যুক্তিবাদী মন পরিশীলিত হয়ে ওঠে। পরবর্তী জীবনে প্রবন্ধ রচনায় ও যুক্তির মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় তিনি যে ক্ষমতার

পরিচয় দিয়েছিলেন তার ভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছিল ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষা।

ইংরেজিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হয়ে উঠলেও অংক এবং বাংলায় অনগ্রসর ছিলেন বলে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করা সম্পর্কে সংশয় ছিল। তা সত্ত্বেও ১৮৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে এনট্রান্স পরীক্ষায় চন্দ্রনাথ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। পিতা সীতানাথ বসুর আর্থিক অবস্থা বরাবরই অস্বচ্ছল। মাসিক ১০ টাকা বেতন দিয়ে পুত্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। এই কারণে স্থির হল চন্দ্রনাথকে 'কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতে হইবে।'[১৩]

এই সময় চন্দ্রনাথ ঈশ্বরের আনুকূল্য লাভ করেন। শিক্ষাবিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষ 'উদারচেতা' ডব্লিউ. এস. অ্যাটকিনসন্ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারির হরেকৃষ্ণ আঢ্যের (প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্যের ভ্রাতা) সহযোগিতায় তিনি আট টাকার সরকারী বৃত্তি পান। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে তিনি পেলেন সুবিখ্যাত প্যারীচরণ সরকারকে। তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়াতেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি চন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। এছাড়া আর একজন অধ্যাপক কর্ণডাফের কথাও চন্দ্রনাথের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে ছিল। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে তিনি পান অধ্যাপক কাউয়েলকে। তাঁর 'পাণ্ডিত্য যেমন বহুবিষয়ব্যাপক তেমনি প্রগাঢ়, ছাত্রদের প্রতি স্নেহ ও যত্ন বর্ণনাতীত।'[১৪] দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রেসিডেন্সি কলেজেও প্রথম দুবৎসর বাংলা ভাষা চর্চা অগ্রসর হল না। কেননা, যিনি বাংলা পড়াতেন 'তিনি বাঙ্গালী বটে কিন্তু বাংলা জানিতেন না'।[১৫] ওরিয়েন্টাল ডিবেটিং ক্লাবের মত প্রেসিডেন্সি কলেজেও একটি ডিবেটিং ক্লাব তিনি পরিচালনা করতেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফার্ষ্ট আর্টস (এফ. এ.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে চন্দ্রনাথ পঞ্চম স্থান পান। প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন পরবর্তীকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষ।

বি. এ. ক্লাসে বাংলা ও সংস্কৃত পড়াতেন পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২)। কিন্তু প্রথমাবধি বাংলায় কাঁচা ছিলেন বলে কৃষ্ণকমলের অধ্যাপনা ফলপ্রসূ হয় না; সংস্কৃত পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না থাকায় চন্দ্রনাথ সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হতে পারেন নি। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি

গভীরভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বহু ইংরেজি গ্রন্থ তিনি এই সময়ে পাঠ করেন। চন্দ্রনাথের মনও এই সময় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। একদিকে যেমন হিন্দুর দেবদেবীতে অবিশ্বাস জন্মেছিল অন্যদিকে বাংলা ভাষা চর্চায় অপ্রবৃত্তি জন্মেছিল। এই সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮২৯-৬৯) সুপ্রসিদ্ধ 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। প্রেসিডেন্সি, কলেজ ম্যাগাজিনেও তাঁর ইংরেজী রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। চন্দ্রনাথের শিক্ষক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'বিচিত্রবীর্য' (১৮৬০) গ্রন্থের একটি বিরূপ সমালোচনা 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার প্রত্যুত্তরে চন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে গ্রন্থটির সপ্রশংস আলোচনা করেন। এ সম্পর্কে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেন, 'তিনি (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) তাঁহার কাগজে ('বেঙ্গলী' পত্রিকায়) আমার বিচিত্রবীর্যের যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি বিচলিত হইয়াছিলাম। ধীরভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি অবিচার করেন নাই। আমার সংস্কৃত ভাষাবহুল রচনাকে তিনি অন্যান্য বিশেষণের মধ্যে turgid আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছিলেন কিন্তু আমার ছাত্র চন্দ্রনাথ বসু প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিনে বিচিত্রবীর্যের যে প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় একবার অন্বেষণ করিতে, কোথাও সেই ম্যাগাজিনের সেই খণ্ডটি পাওয়া যায় কি না।'[১৬] ওই সময় 'প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিন' বলে কোন পত্রিকা ছিল বলে আমাদের জানা নেই। কৃষ্ণকমল সম্ভবত 'ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি ম্যাগাজিন'-এর কথাই বলতে চেয়েছিলেন। তবে এই ম্যাগাজিনটি প্রধানত প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হত।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় চন্দ্রনাথ হিন্দুর চিরাচরিত বিশ্বাস ও মজ্জাগত ধর্মবোধ থেকে ঈষদ্ দূরে সরে গিয়েছিলেন। এই সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও যুক্ত হন এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত শুরু করেন। কেশবচন্দ্র (১৮৩৮-৮৪) তখন ব্রাহ্মসমাজের যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত অবিসম্বাদী নেতা। তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সিন্দুরিয়াপটিতে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানে নিয়মিত বক্তৃতা করতেন। চন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতার উৎসাহী শ্রোতা। চন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'আমি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম—কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতাম।'[১৭] চন্দ্রনাথ কেশব-চন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে রীড, হ্যামিল্টন, কাণ্ট, ভিক্তর কুঁজা

প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রজ্ঞাবাদী দার্শনিকদের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হন। সম্ভবত যুক্তিবাদের প্রতি ঝোঁক থাকায় এঁদের দার্শনিক মনন তাঁকে গভীর-ভাবে আকৃষ্ট করেনি। এর পর চন্দ্রনাথ অগস্ত কোম্‌তের কিছু বই পাঠ করেন এবং বিখ্যাত কোমতপন্থী পজিটিভিস্ট দার্শনিক দ্বারকানাথ মিত্রের (১৮৩২-৭৪) সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। 'কোমতের প্রণালীতে আমাদের সমাজ প্রণালীর অনেক সমর্থন আছে' দেখে চন্দ্রনাথ আনন্দিত হলেন সত্য কিন্তু কোমতের মতবাদে ঈশ্বরের স্থান নেই বলে অতৃপ্তি থেকে গেল। চন্দ্রনাথের মানস সংকট দূর হল না।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি ও সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামি[১৮] 'ক্যালকাটা য়ুনিভারসিটি ম্যাগাজিন' নামে একটি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন (১৮৬৪)। পত্রিকাটির পরিচালনায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকারের সহায়তা ছিল। তিনি নিজের প্রেসে পত্রিকাখানি ছাপিয়ে দিতেন। ঐ কাগজে **On the importance of the study of History** শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে চন্দ্রনাথ তৎকালীন প্রসিদ্ধ **Englishman** পত্রিকার প্রশংসা লাভ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, ওই সময়ের 'ক্যালকাটা য়ুনিভারসিটি ম্যাগাজিন'-এর কোন খণ্ড পাওয়া যায় না।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বি. এ. পরীক্ষায় চন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করেন। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন রাসবিহারী ঘোষ ও ব্লকমান সাহেব।[১৯] অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) মত চন্দ্রনাথও বি. এ. পরীক্ষার পর বৎসর এম. এ. পরীক্ষা দিবার বিশেষ অনুমতি পান। চন্দ্রনাথ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তিনি বরাবরই নিষ্ঠাবান ছাত্র। মেধা ও নিষ্ঠার মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছিল চন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে। এ সম্পর্কে তিনি সগর্ব উল্লেখও করেছেন।[২০] যাই-হোক, ১৮৬৬ সালে এম. এ. (ইতিহাসে অনার্স) পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনিই প্রথম এই বিরল সম্মান লাভ করেন।[২১] সেই বৎসর ইংরেজি অনার্সে প্রথম হয়েছিলেন রাসবিহারী ঘোষ। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৭-তে বি. এল. পরীক্ষায় চন্দ্রনাথ সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় রাসবিহারী ঘোষ প্রথম এবং চন্দ্রনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। চন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন নানা কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল।

'বি. এল. পাশ করিয়া সকলে যেমন আদালতে ছোটে আমিও তেমনিই ছুটিয়াছিলাম'[২২] চন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি তথ্যনিষ্ঠ নয়। অথচ, চন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তির সূত্র ধরে অনেকেই ভ্রান্তিবিলাসের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেছিলেন অনেক পরবর্তীকালে, ১৮৭৫-৭৬ সালে। তিনি নিজেই বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লিখেছেন—'ইহার কিছুদিন পরেই (১৮৭৬-তে কলেজ রি-ইউনিয়নের সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর) এক বিচিত্র ব্যাপারে আমাকে বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল।......আমি তখন প্রতিদিন বড় আদালতে হাওয়া খাইতে যাইতাম।'[২৩] নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) একই সময়ের কথায় লিখেছেন, 'তিনি (চন্দ্রনাথ বসু) সে সময়ে বোধ হয় কোথাও মক্কেলশূন্য ওকালতী করিতেছিলেন।'[২৪] সুতরাং বি. এল. পরীক্ষার (১৮৬৭) পর তিনি ওকালতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এই তথ্যটি অপ্রমাণিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে তিনি কিছুকাল ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে শিক্ষকতা করেছিলেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রাক্তন ছাত্র ও পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯) দুটি স্মৃতিকথা আমরা এর সপক্ষে উদ্ধার করব। স্মৃতিকথা দু'টির একটি বাংলায় ও অপরটি ইংরেজিতে লেখা। অমৃতলাল বলেছেন, 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি হইতে আমি ১৮৬৮ খৃঃঅব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। আমাদের হেড মাষ্টার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী। ইতিহাস পড়াইতেন চন্দ্রনাথ বসু; অংক কষাইতেন বেণীমাধব দে; ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন ফেড্রিক পেনি।'[২৫] ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে (১৯২৯) অমৃতলালের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে:

> **Babu Amrita Lal Bose writes—'Babu Chandra Nath Bose M. A. and Beni Madhab De M. A. fresh blown flowers of the Calcutta University were brought in, we pupils worked right hard on our lessons and in 1868 the pass-list showed a very creditable result.'[২৬]**

সুতরাং পাশ করার পর তিনি যে আদালতে 'ছোটেন' নি, অন্তত কিছুকাল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে শিক্ষকতা করেন এ তথ্যটি স্বীকৃত হওয়া উচিত।

বসু পরিবারের আর্থিক অবস্থা কোন দিনই ভাল ছিল না। শিক্ষকতায় সেই অবস্থা স্বচ্ছল হবার কোন আশাও ছিল না। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে তাঁর কার্যকাল স্বল্পদিন ছিল মনে হয়; বেশি দিন হলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় উল্লেখ করতেন। এর পরেও তিনি নানাবিধ কর্ম করেন। তিনি লিখে গেছেন, 'যখন আমার ঋণের পরিমাণ চারি হাজার টাকা, তখন আমি হাইকোর্টে যাই।'[২৭] স্বাধীনচেতা চন্দ্রনাথ অপরের অধীনে চাকুরী করে নিজের স্বাধীন সত্তাটুকু বিসর্জন দিতে চান নি। তাছাড়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যও শেষ পর্যন্ত জীবিকার জন্য ওকালতি ছাড়া অন্য বৃত্তি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে চন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত যে শিক্ষা লাভ করিতে হয় তাহা সম্পূর্ণ Literary শিক্ষা, তাহাতে কোনও রকম Practical প্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে না। প্রধানত এই কারণে আমরা দলে দলে আদালতে ছুটি।'[২৮] আদালতের জীবন চন্দ্রনাথের ভাল লাগে না। তিনি সেখানে দেখলেন, উকিলরা শিক্ষিত—কিন্তু তাঁদের মধ্যে সদ্ভাব অপেক্ষা অসদ্ভাব বেশি, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা ও প্রলোভন ভয়াবহ। তাছাড়া মফঃস্বল থেকে তাঁর কাছে মোকদ্দমা পাঠাবার লোকও ছিল না। মোক্তারদের খোসামোদ করতেও তাঁর বাধত। সুতরাং ওকালতিতে তিনি তথাকথিত সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত লোভের ভয়ঙ্কর মূর্তিতে ভীত হয়ে চন্দ্রনাথ ওকালতি করে অর্থোপার্জনের চেষ্টা পরিত্যাগ করলেন।

এই সময়ে চন্দ্রনাথের কলেজে অধ্যাপনা করতে ইচ্ছা হয়। শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ উড্রোর কাছে তিনি তাঁর অন্তরের কথা ব্যক্ত করেন। উড্রো সাহেব তাঁকে সহৃদয়তা জানালেন এবং মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'আমি যদি তোমার পিতা হইতাম, তাহা হইলে তোমাকে এ বিভাগে আসিতে নিষেধ করিতাম; এ বিভাগে কাহারও কিছু হয় না।'[২৯] সেদিন উড্রো সাহেবের কণ্ঠে কলেজের অধ্যাপকদের সম্পর্কে অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। সে যাই হোক, পাঁচ সাত দিন পরে তিনি চন্দ্রনাথকে কটক কলেজে দু'শ টাকা মাইনের একটি অধ্যাপকের পদ দিতে চাইলেন।

কিন্তু ইতোমধ্যে কৃষ্ণদাস পালের সহায়তা ও সুপারিশে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের একটি চাকরি পান। সেই অনুযায়ী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি নিয়ে ঢাকায় যান। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) চন্দ্রনাথকে ঢাকায় যেতে পরোক্ষে নিষেধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে চন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'যখন যাই বঙ্কিম দাদা আমাকে বলিলেন—যাইতেছ যাও, কিন্তু টিঁকিতে পারিবে না।'[৩০] এ চাকরিতেও তিনি সত্যই টিঁকতে পারলেন না। সেখানে তিনি দেখলেন, পুলিশের অপ্রতিহত প্রভাব যা বিচারকের রায়কে প্রভাবিত করে চলে। চন্দ্রনাথ স্বাধীনচেতা। তাঁর মর্ম প্রতিমুহূর্তে পীড়িত হতে লাগল। তিনি বুঝলেন, 'এ চাকরিতে হাকিম পুলিশের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।' এক মোকদ্দমায় পুলিশ চন্দ্রনাথকে শাসিয়ে এক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করতে চেষ্টা করে এবং 'তাঁদের আচরণ নিতান্ত অসভ্য, অসম্মানজনক ও উদ্ধত' ছিল। চন্দ্রনাথ 'ডেপুটিগিরি' ছেড়ে দিলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তাঁর কার্যকাল ৬ মাস।

ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই চন্দ্রনাথের শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁকে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। কলিকাতায় ফিরে ধার দেনা করে সপরিবারে তিনি জয়পুর যান। প্রথম দৃষ্টিতে সুন্দর শহর জয়পুর ভাল লাগল। এই শহরের গঠনপ্রণালী বিদ্যাধর চক্রবর্তী (জন্ম : ১৬৯৭) নামে একজন বাঙালী ব্রাহ্মণের উদ্ভাবিত। জয়পুরের দেবালয়গুলিতে বাঙালী পুরোহিতের সংখ্যাই অধিক। জয়পুরের রাজকার্যে অনেকদিন থেকেই বাঙালীর প্রাধান্য। চন্দ্রনাথের বাঙালী মন এজন্য গর্বিত। সেই সময় জয়পুরের শাসন বিভাগে রায়বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রধানত তাঁরই আগ্রহে চন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখেছেন, 'চন্দ্রনাথবাবু ১৮৭৮-৭৯ অব্দে জয়পুর কলেজের (মহারাজ কলেজ) প্রিন্সিপ্যালের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।'[৩১]

যেদিন চন্দ্রনাথ জয়পুর যান তার পরের দিনই কান্তিবাবু তাঁকে বলেন, 'কলেজের কাজে কিছুই হইবে না, শীঘ্রই আপনাকে শাসন বিভাগে আনিব।' তিনি নিজেও ওই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, পরে শাসন বিভাগে যোগদান করেন।[৩২] চন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''কনসেন্স'টাকে একটু মুচড়াইয়া ৫।৭ বৎসর থাকিলে আমি মস্ত ধনী হইতে পারিতাম। কিন্তু জয়পুরের ভাত

আমার সহ্য হইল না এবং রাজসভার হাওয়া ভালো লাগিল না। ...ইহাও বুঝিলাম যে, স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আমার জয়পুরে থাকা সম্ভব হইবে না। আমি দুই মাসের ছুটি লইয়া কলকাতায় আসিলাম। জয়পুরে কেবল পাহাড় ও বালি—আমি ভারতের উদ্যান সদৃশ বঙ্গের মানুষ, সে কঠোর দৃশ্য আমায় ভাল লাগিল না। ...মনে মনে সংকল্প জয়পুরে আর যাইব না।'[৩৩]

ইতোমধ্যে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের মৃত্যু হয়। চন্দ্রনাথ এই শূন্য পদটি প্রার্থনা করে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ স্যর আলফ্রেড ক্রফ্‌টের কাছে দরখাস্ত করেন। এক্ষেত্রে তিনি কৃষ্ণদাস পালের সহায়তা পেয়েছিলেন। ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ও জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগের সংবাদ ক্রফ্‌ট রাখতেন। তিনি কৃষ্ণদাস পালের কাছে সেই প্রসঙ্গ তোলেন। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণদাস বলেন, He is not to blame. He can not settle down to what he does not fully like. এই সময় ক্রফ্‌ট সাহেব ছুটি নিয়ে বিলাতে যান। তার স্থলাভিষিক্ত হন চন্দ্রনাথের শিক্ষাগুরু সি. এইচ. টনী সাহেব। লাইব্রেরীর জন্য লোক নির্বাচনের ভার তাঁর হাতে। তিনি চন্দ্রনাথকে বেঙ্গল লাইবেরীর লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। সরকারী পদটির সম্পূর্ণ নাম: Librarian of the Bengal library and keeper of the catalogue of books under section 18, Act XXV of 1867. মাসিক বেতন ২০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা। চন্দ্রনাথ সাগ্রহে পদটি গ্রহণ করেন (৭ই অক্টোবর, ১৮৭৯)।[৩৪] প্রসিদ্ধ জীবনীকার লিখেছেন, '(পদটি) চন্দ্রনাথের যোগ্য না হইলেও স্বল্পে তুষ্ট চন্দ্রনাথ উহাতে খুসী হইয়াছিলেন।' চন্দ্রনাথের মন্তব্য, 'আমি কিন্তু চিরকালের জন্য বাঁচিয়া গেলাম।'[৩৫]

এই কাজে তিনি ৭ বৎসর ২ মাস ৬ দিন স্থায়ী হন। দু'দিক থেকে এই চাকরিজীবন চন্দ্রনাথের জীবনে ফলপ্রসূ হয়েছিল। প্রথমত, তিনি এই চাকরিসূত্রে অঋণী ও অপ্রবাসী হবার সুযোগ পেলেন। সেই সময় চন্দ্রনাথের দেনা ৪।৫ হাজার টাকার কম নয়। চাকরি পাবার সংবাদে পাওনাদারেরা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। চন্দ্রনাথকে তখন কয়েকটি পরিবারকে নিয়মিত সাহায্য করতে হত, যাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে 'দা-দেয়িজীর'। তাদের অর্থদান অব্যাহত থাকল। সহৃদয়া স্ত্রীর অনুরোধে তাঁর গহনা বিক্রী করে কিছু দেনা শোধ হল। তা সত্ত্বেও বাইরে এত দেনা থেকে গেল যে

টাকা কর্জ করা প্রয়োজন হল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির সেক্রেটারী বেচারাম চট্টোপাধ্যায় শতকরা ৬ টাকা সুদে কয়েক হাজার টাকা কর্জ করে দেবার ব্যবস্থা করলেন। কর্জ দিলেন রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র অমৃতলাল মিত্র মশায়ের দ্বিতীয় পুত্র রূপলাল মিত্র। প্রতি মাসে সুদ সহ ৫০ টাকা করে দিয়ে তিনি ঋণ শোধ করেন। গ্লানিমুক্ত হয়ে চন্দ্রনাথের মন লঘু ও আনন্দিত হল।

দ্বিতীয়ত, এই চাকরিতে কাজের চাপ ছিল খুব কম। তিনি বলেছেন, 'বেঙ্গল লাইব্রেরীর কাজ বেশীও নয়, একরকম চোখ বুজিয়া সম্পন্ন করিতাম।'[৩৭] কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী দীর্ঘ অবসরের সুযোগে তিনি ধারাবদ্ধ ভাবে ও নিয়মিত বাংলা সাহিত্য পাঠ করতে থাকেন। এই সময় তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ' নামক ইংরেজি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় নিয়মিত বাংলা বইয়ের ইংরেজি সমালোচনা শুরু করেন। চন্দ্রনাথের উক্তি, '৭ বৎসর কয়েক মাস বিস্তর বাংলা পুস্তক পড়িয়াছিলাম।'[৩৮]

ইতোমধ্যে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদটি শূন্য হয়। ওই কাজের 'কঠিনতা ও পরিমাণ' ছিল ভীতিজনক। এই কাজ করে 'অসুর সদৃশ' (স্বাস্থ্যবান) রবিনসন সাহেব বহুমূত্র রোগে মরো গিয়েছিলেন।[৩৯] এবং তার পরে একই রোগে মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অনুবাদকের কর্মে রত থাকা কালে অকালে পরলোক গমন করেন। শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ ক্রফ্‌ট সাহেব চন্দ্রনাথকে ওই পদের জন্য মনোনীত করেন। স্বাস্থ্যহানির ভয়ে চন্দ্রনাথ প্রথমে ওই কাজ নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।[৪০] শেষে, স্বাস্থ্য না টিকলে তিনি আবার লাইব্রেরীর কাজে ফিরে যাবেন, এই শর্তে ছ'মাসের জন্য ওই কাজ গ্রহণ করেন। তিনি লিখেছেন, 'অনুবাদকের কাজ যেমন কঠিন, তেমনই অপ্রীতিকর, পরিমাণে প্রায় অসীম। বড় অনিচ্ছায় এই কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম।'[৪১] কাজের ব্যাপকতায় ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যে চন্দ্রনাথ পীড়িত হয়ে পড়েন এবং ক্রফ্‌ট সাহেবকে তাঁর অক্ষমতার কথা জানান। সাহেব তাঁকে আর একমাস কাজ করতে অনুরোধ করেন। চন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় তাঁর মানস পরিবর্তনের সংবাদ জানিয়েছেন, 'এক মাস কাজ করিতে করিতে আমার স্থৈর্য আসিল, ধৈর্য আসিল, সাহস আসিল, কষ্ট সহিষ্ণুতা আসিল, শ্রমশক্তি বাড়িতে লাগিল। আর এই ধারণা জন্মিল যে, এ কাজ ভগবানের কাজ, গবর্ণমেণ্ট বা মানুষের

কাজ নয়। তখন এই কাজ ভাল লাগিল আর আলস্য গেল, শ্রমকাতরতা গেল, শ্রমে আনন্দ ও উৎসাহ হইতে লাগিল।'[৪২]

প্রথম জীবনে অপরের চাকরি করে অধীনতা স্বীকার করতে চন্দ্রনাথের অনিচ্ছা ছিল। পরে, সব কাজই ঈশ্বরের—এই বোধ থেকে তিনি গ্লানিমুক্ত হন। তিনি সরকারী কাজকে গ্রহণ করলেন ধর্মচর্চার অঙ্গ হিসাবে। তা সত্ত্বেও অধিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্যহানির ভয় ছিল। তিনি ক্রফ্‌ট সাহেবের স্থলাভিষিক্ত টনী সাহেবকে ইস্তফাপত্র দিলেন। ক্রফ্‌ট চন্দ্রনাথকে আরও ছ'মাস কাজ করতে বললেন এবং কাজের পরিমাণ কিছু হ্রাস করলেন। তাহলেও 'রাতে দিনে কাজ, রবিবারেও কাজ, পূজোর ছুটিতে আফিস বন্ধ করি, কিন্তু বাড়ীতে কাজ করি। অসুখ হইলেও কাজ করি, না খাইয়াও কাজ করি। কাজ আমার জপমালা হইয়াছে।'[৪৩]

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৯ জানুয়ারী চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরেশনাথ মারা যান। কিছুদিন বিশ্রামের জন্য উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় চন্দ্রনাথকে সপরিবারে তাঁর গঙ্গাতীরস্থ সুদৃশ্য বাগান বাড়ীতে নিয়ে যান। নিদারুণ শোকের মধ্যেও চন্দ্রনাথ কর্মে শিথিলতা দেখান নি। কোন একজন মহামহোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন, 'সংবাদপত্রের রিপোর্ট এত বেশী করিয়া নাই লিখিলেন, কম করিয়া লিখিলে কেহ তো ধরিতে পারিবে না' চন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন, 'তা আমি পারিব না। আর কেহ ধরিতে পারিবে না বটে—কিন্তু আমার মন যে আমাকে ধরিবে।'[৪৪] অন্তরের প্রেরণায় ও ধর্মানুরক্তি বশত তিনি সরকারী কাজ করতেন বলে অমনোযোগী হন নি এবং অবহেলাও করেন নি অথবা এই নিষ্ঠা চন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বেরই অন্তর্গত। চন্দ্রনাথ অনুবাদকের কাজের গুরুত্বও উপলব্ধি করতেন। যেহেতু সরকার বিভিন্ন দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট পাঠ করে সেই অনুযায়ী শাসন পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন সেইজন্য শাসন কার্যে অনুবাদকের দায়িত্ব ও ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। অনুবাদক কাজে শৈথিল্য দেখালে বা অযথার্থ রিপোর্ট করলে সরকার বিভ্রান্ত হতে পারেন। তাছাড়া ইংরেজি আইনের বাংলা অনুবাদের দুরূহ কর্মও করতে হত। চন্দ্রনাথ এই কাজে দায়িত্ব-সচেতনতার পূর্ণ পরিচয় দিতে পেরেছিলেন বলে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। তিনি এ সম্পর্কে লিখে গেছেন, 'বিধাতা পুরুষ স্বয়ং অনুসন্ধান করিলেও আমার কাজে অমনোযোগ, অসাবধানতা বা অবহেলার

নিদর্শন খুঁজিয়া পাইবেন না।'[৪৫] অথবা 'আমি সতের বৎসর রিপোর্ট করিয়াছি একটি অযথা রিপোর্ট করিয়াছি বলিয়া আমার মনে কাঁটা বেঁধে না।'[৪৬] মাঝে মাঝে ভুল হবার সম্ভাবনা দেখা দিত। বিশেষতঃ 'স্লাং বাংলা বা খ্যাচড়া বাংলা' অনুবাদ দুরূহ মনে হত। কেননা প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব শব্দগুচ্ছ বা 'ইডিয়ম' থাকে এবং তার সঙ্গে দেশীয় অনুষঙ্গ মিশে থাকে বলে ভাষান্তর করা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব বা দুঃসাধ্য হয়। প্রথমাবধি ইংরেজি ভাষায় গভীর দখল থাকায় তিনি অবলীলাক্রমে এই জাতীয় অনুবাদের দুরূহতম কাজও সুসম্পন্ন করতেন। বস্তুতঃ চন্দ্রনাথের কর্মজীবন বিবিধ গৌরবে অলংকৃত ছিল।

তিনি সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর বাংলা সরকারের অনুবাদকের কর্মে ব্রতী ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী তিনি সরকারী কাজ থেকে অবসর নেন। তিনি ৩৫ বছর বয়সে সরকারী কাজে ঢুকেছিলেন। তাই পেনসন আইনানুসারে তাঁর মাসিক পেন্‌সন মঞ্জুর হয় ১৭৫ টাকা। তিনি স্পেশাল পেন্‌সনের জন্য দরখাস্ত করেন এবং তাঁর বিবিধ কার্যের সঙ্গে পরিচিত কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সুপারিশপত্র তার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী আবুল, সুপ্রীম কৌন্সিলের সদস্য অ্যাম্পথিল, ল, কিচেনার, এলিস, অরওয়েল, ইবেট্‌সন ও রিচার্ড, কটন, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট্, ম্যাকফারসন, লুসন, ওল্ডহ্যাম ও ক্লপস্টন প্রভৃতি য়োরোপীয়রা তাঁদের সুপারিশপত্রে চন্দ্রনাথের কর্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পত্রগুলির অংশবিশেষ চন্দ্রনাথ তাঁর 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' গ্রন্থে সংকলন করে দিয়েছেন।

চন্দ্রনাথের সরকারী চাকরির একটি 'রেকর্ড' সরকারী সংগ্রহশালা থেকে উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আমরা তার বাংলা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধার করছি—

স্থান	স্থায়ী পদ	তারিখ	অস্থায়ী পদ	তারিখ
	৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৬ পর্যন্ত নন্ গেজেটেড পদ			
কলিকাতা			অস্থায়ী অনুবাদক	১জানুয়ার ১৮৮৭
ঐ	বাংলা সরকারের স্থায়ী অনুবাদক	১১ মে, ১৮৯০		

চন্দ্রনাথ বসু এম. এ., বি. এল.। জন্ম: সেপ্টেম্বর ১৮৪৫, চাকুরিতে যোগদান: ৭ই অক্টোবর, ১৮৭৯।

ছুটি: প্রিভিলেজ লীভ ৮ অক্টোবর, ১৮৯০ থেকে ২ মাস ৬ দিন; ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩ থেকে ২ মাস ১৬ দিন; ৩ নভেম্বর ১৮৯৫ থেকে ২ মাস ১৬ দিন; ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ থেকে ২০ দিন; ১৬ মার্চ, ১৯০১ থেকে ৩ মাস; প্রিভিলেজ লীভ ২৫ এপ্রিল ১৯০৩ থেকে ২ মাস।[৪৭]

৩

ছাত্রাবস্থায় ইংরেজি ভাষায় মননশীল প্রবন্ধ রচনা করে চন্দ্রনাথ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি 'ক্যালকাটা য়ুনিভারসিটি ম্যাগাজিনে' লিখতেন এবং সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ 'বেঙ্গলী' পত্রিকার নিয়মিত লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিষয়ে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিত হয়ে এই উপলক্ষে চন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ মঞ্চে এই ধারার চতুর্থ বক্তৃতা দেন, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৭ সালে। বিষয়: An Essay on the Life and Character of Oliver Cromwell. প্রবন্ধ রচনায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের সুখ্যাত অধ্যাপক 'লব'-এর সহায়তা ছিল। প্রবন্ধটি পরে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। জন অনুরোধে তিনি বক্তৃতাটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও ছাপিয়েছিলেন।[৪৮] সুপ্রসিদ্ধ জীবনীকার জানাচ্ছেন, 'আমাদের স্মরণ হয় কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে' শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত উহার একটি সুদীর্ঘ প্রশংসামূলক সমালোচনা আমরা পাঠ করিয়াছিলাম।'[৪৯]

চন্দ্রনাথ 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' বা বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং উক্ত সভার নানামুখী কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা'র কার্যধারা সম্পর্কে ঈষদ্ পরিচয় দান অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিলাতে কুমারী মেরী কার্পেন্টার (১৮০৭-৭৭) দার্শনিক কোমতের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন National Association for the Cultivation of Social Science in Great Britain (১৮৫৭)।

পাদ্রী লং বিলাত থেকে এদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৬৬ সালে। মেরী কার্পেন্টারের উক্ত সভার কার্যাবলীতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কলকাতায় এই ধরণের একটি সভা স্থাপনের উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি 'বড়বাজার ফ্যামিলি লিটেরারি ক্লাব'-এ বলেন, ২৭ এপ্রিল, ১৮৬৬ তারিখে। ওই বৎসরেই কুমারী কার্পেন্টার কলকাতায় আসেন (২০ নভেম্বর, ১৮৬৬)। তাঁর ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল 'নারীজাতির উন্নতি সাধন এবং স্ত্রীশিক্ষার দ্রুততর প্রসারের আয়োজন।'[৫০] তিনিও কলকাতায় ইংলণ্ডের ধাঁচের সমাজ বিজ্ঞান অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহী হন। তাঁরই আহ্বানে এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনের এক সভায় ১৮৬৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর 'বেঙ্গল সোশ্যাল-সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়, যার বাংলা নাম 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা'। এদেশের সমাজ, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন, ভাষা, লোকসাহিত্য, পালপার্বণ প্রভৃতি বিষয় 'এক কথায় জীবনের সমগ্র দিক লইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা-গবেষণা পরিচালনের উদ্দেশ্যেই বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার আবির্ভাব।'[৫১] প্রথম সভাপতি ডবলিউ. এস. সীটনকার এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন এইচ. বিভারলি ও প্যারীচাঁদ মিত্র। বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সামাজিক জীবনে সুগভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। চন্দ্রনাথ বসু সভার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দীর্ঘদিন এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার কর্মপ্রণালী চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল—(ক) ব্যবহার শাস্ত্র ও আইন; (খ) শিক্ষা; (গ) স্বাস্থ্য এবং (ঘ) অর্থনীতি ও বাণিজ্য। চন্দ্রনাথ আইন শাখার অন্যতম সদস্য এবং শিক্ষা শাখার সম্পাদক ছিলেন। ঐ শাখার অপর সম্পাদক হলেন সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ এইচ. লক। এঁরা ছাড়া সেযুগের অগ্রণী বাঙালীদের অনেকেই যেমন, কিশোরী চাঁদ মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সদস্যপদে বৃত হয়েছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা শাখার নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং নিয়মিত শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করতেন।

সমাজ বিজ্ঞান সভার প্রথমবর্ষে শিক্ষা শাখায় মৌলভী আবদুল লতিফ খাঁ বাংলাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ পাঠ

করেন। শিক্ষা বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন চন্দ্রনাথ বসু, What is the Best Practicable Method of Educating Hindu Women ? (বক্তৃতার তারিখ, ৩০ জানুয়ারী, ১৮৬৮)। সভার অনুপ্রেরণাদাত্রী কুমারী কার্পেন্টারের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধটি মূল্যবান। বিশেষত 'তখন আধুনিক পদ্ধতিতে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার শুরু হইয়াছে। এই সময় এইরূপ চিন্তার বাস্তবিকই প্রয়োজন ছিল।'[৫২] চন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উপর জে. বি. নাইট, মনোমোহন ঘোষ, ডঃ ফাকু্'হার প্রভৃতি আলোচনা করেছিলেন। চন্দ্রনাথও প্রত্যুত্তরে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে প্রগতিশীলতার সঙ্গে রক্ষণশীলতার সুষ্ঠু সমন্বয়ের কথা বলে নিজ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জনৈক রাজা শেওরাজ সিং (নৈনিতাল) উর্দু ভাষায় এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। দু'মাস পরে চন্দ্রনাথ শিক্ষা শাখায় আর একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন, The Present System of Education in the University of Calcutta (বক্তৃতার তারিখ, ৩০ মার্চ, ১৮৬৮)।

সভার দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষা শাখার সম্পাদকদ্বয় চন্দ্রনাথ বসু ও অধ্যক্ষ লক্ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। এঁরা স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রশ্নপত্র (১৫ দফা) রচনা করে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠান। যে সকল উত্তর পাওয়া যায় তার সার সংকলন করে একটি প্রবন্ধাকারে পাঠ করা হয় ২০ জানুয়ারী, ১৮৬৯ তারিখে।[৫৩] প্রবন্ধ পাঠের পর যে আলোচনা শুরু হয় তাতে অংশ নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।[৫৪] একই বৎসরে শিক্ষা শাখায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ পড়েন রেভাঃ লাল বিহারী দে, Compulsory Education in Bengal. চন্দ্রনাথ বসু ও মহেন্দ্রলাল সরকার আলোচনায় যোগ দিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন।

যদিও চন্দ্রনাথ প্রধানতঃ শিক্ষা বিভাগে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি অন্য শাখায়ও কখনও কখনও প্রবন্ধ পাঠ করতেন। তাঁর একটি সুবিখ্যাত প্রবন্ধ, Thoughts on the Present Social and Economical Condition of Bengal and its Probable Future অর্থনীতি ও বাণিজ্য শাখার তৃতীয় প্রবন্ধরূপে সভার 'ট্রানজাক্সনে' মুদ্রিত হয়েছিল (বক্তৃতার তারিখ, ২১ জানুয়ারী, ১৮৬৯)। বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার তৃতীয় বর্ষে শিক্ষা বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হন এইচ. ব্লকম্যান ও চন্দ্রনাথ বসু। তাঁরা সমিতির পক্ষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে Popular Education সম্পর্কে কতকগুলি

অনুসন্ধান চালান। সেগুলি শিক্ষা বিভাগের সম্পাদকদ্বয়ের নামে বিজ্ঞাপিত হয় ১ নভেম্বর, ১৮৬৯ সালে। তথ্যগুলি মূল সম্পাদক এইচ. বিভারলি ও শিক্ষা শাখার সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসুর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।[৫৫] সে যুগের চিন্তানায়কদের মধ্যে শিক্ষা নিয়ে চিন্তা বিশেষ স্থান লাভ করেছিল, চন্দ্রনাথ এঁদেরই অন্যতম। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার দান অনন্য।

শিক্ষা ছাড়াও চন্দ্রনাথ ব্যবহার শাস্ত্র ও আইন বিষয়েও কৌতূহলী ছিলেন। সভার তৃতীয় বর্ষে তিনি আইন শাখায়, A Few Points Connected with the Registration of Assurance নামে প্রবন্ধ পড়েন (বক্তৃতার তারিখ, ? ১৮৭০)। অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বর্ষে শিক্ষা বিভাগের সভাপতি হন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি তখন সদ্য বিলাত প্রত্যাগত। তখনও শিক্ষা শাখার সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু এবং অপর ব্যক্তি হলেন কেশব-অনুচর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কেশবচন্দ্র যখন বাংলাদেশের শিক্ষা চিন্তায় নতুন সুর ধ্বনিত করে তোলেন তখন চন্দ্রনাথ তাঁর সহযোগী। ওই বৎসর শিক্ষা শাখায় মাত্র একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছিল, Some University Matters (? ১৮৭২) লেখক, চন্দ্রনাথ বসু।[৫৬] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের নানামুখী চিন্তায় প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সেকালে আরও কয়েকটি ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম 'বেথুন সোসাইটি' (১৮৫১)। বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে অক্লান্ত কর্মী ও চিরস্মরণীয় ড্রিংকওয়াটার বেথুনের নামাঙ্কিত এই সোসাইটিরও উদ্দেশ্য ছিল, 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ের বিচার ও আলোচনা।'[৫৭] উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষা চিন্তায় এই সোসাইটির অগ্রণী ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। এখানেও শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা ও প্রবন্ধাদি নিয়মিত পাঠ হত। স্বভাবতই চন্দ্রনাথ এঁদের কার্যধারার সঙ্গে যুক্ত না থেকে পারেন নি। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ The Effects of English Education Upon Bengali Society সম্পর্কে সোসাইটির ষষ্ঠ অধিবেশনে বলেন (বক্তৃতার তারিখ, ২৯ এপ্রিল, ১৮৬৯)। চন্দ্রনাথ এই বক্তৃতার উপর আলোচনায় যোগ দিয়ে বলেন, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি দ্রুত ধাবিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ক্রমে আমাদের সমাজে ইংরেজি শিক্ষার সুফলগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ফলতে সুরু

করবে।[৫৮] চন্দ্রনাথ নিজেও বেথুন সোসাইটির ২৫ এপ্রিল, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি সভায় High Education in India নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। প্রবন্ধটিতে চন্দ্রনাথের প্রগতিশীল মানসিকতার ছাপ আছে। পরে প্রবন্ধটি ক্যানিং লাইব্রেরি থেকে ছাপিয়ে তিনি প্রচার করেন। প্রবন্ধটির বক্তব্য সেকালের 'সুধী সমাজে আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল।'[৫৯]

সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক মননধর্মী আলোচনা ছাড়াও চন্দ্রনাথ বিবিধ জনপ্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন ত্যাগ (১৮৬৭) ও সরকারী কর্ম গ্রহণ (১৮৭৮) এই কালপর্বে চন্দ্রনাথকে আমরা সুযোগ্য জনপ্রতিনিধির ভূমিকায় একাধিক বার দেখতে পাই। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯-৬৯) স্বর্গারোহণ করেন। কলকাতার টাউন হলে রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের নেতৃত্বে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১৬ই নভেম্বর একটি সভা আহুত হয়। চন্দ্রনাথ এই সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সভায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিভামুগ্ধ ইংরেজ ও দেশীয় মনীষিগণের মধ্যে তিনি উপস্থিত থেকে একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।[৬০]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশী সরকার ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা সংকোচনের কথা ভাবতে সুরু করেন। কারণ উচ্চশিক্ষা যে রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয় তা ইংরেজ সরকারের স্বার্থের অনুকূল ছিল না। তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার পরিবর্তে ভারতীয় ভাষাশিক্ষার প্রতি জোর দিলেন। ইংরেজি শিক্ষাকে সংকুচিত করার সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। শিক্ষিত বাঙালীদের বিক্ষোভের নেতৃত্ব নেয়, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১)। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রধানত জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কখনও কখনও তাদের কার্যধারায় জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হত। তাছাড়া সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উক্ত অ্যাসোসিয়েশনই তখন দেশের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২ জুলাই বেলা ৩টায় কলকাতার টাউন হলে প্রায় দুই হাজার দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির (২৪ পরগণার বিদেশী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্রডলি উপস্থিত ছিলেন) সমাবেশে ভারতবর্ষীয় সভার

সভাপতি বাবু রমানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভা হয়, 'for the purpose of considering the propriety of memorializing the Secretary of State on the subject of withdrawal of State aid from English Education'. এই মহতী জনপ্রতিনিধিমূলক সভাকে অমৃতবাজার পত্রিকা সেদিন 'ফার্ষ্ট পার্লামেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' বলে অভিহিত করেছিল।[৬১]

সভায় ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উচ্চশিক্ষা বিস্তারে সরকারের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। চন্দ্রনাথ উক্ত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত থেকে সভার কার্য অনুমোদন করেন। তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে একথাও বলেছিলেন যে, 'গবর্ণমেণ্ট অন্যায় কাজ করিতেছেন' ('সোমপ্রকাশ', ২৮ আষাঢ়, ১২৭৭)।

জমিদারদের স্বার্থরক্ষণ নয় বা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর মননবিলাস নয়, জনগণের আশা আকাক্ষা, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদকে সুসংগঠিত আকারে প্রকাশের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) একটি সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তার ফলে জন্ম গ্রহণ করে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। বাংলা নাম, 'ভারত সভা'। কলেজ-স্কোয়ারস্থিত এলবার্ট হলের নিম্নতলে ২৬ জুলাই, ১৮৭৬ সালের বেলা ৫-৩০ টায় 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি সভা হয়। সভাপতি ছিলেন 'ব্যবস্থাদর্পণ' প্রণেতা ঠাকুর আইন অধ্যাপক শ্যামাচরণ শর্মা সরকার। সভায় সর্বসমেত তিনটি প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথম প্রস্তাবে আলোচিত হয়েছিল সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে 'ভারত সভা' স্থাপনের চারটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন, (ক) দেশাভ্যন্তরে প্রবল জনমত গঠন; (খ) রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের সমুদয় শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ঐক্য বিধান; (গ) হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি স্থাপন এবং (ঘ) সমকালীন গণ-আন্দোলনে জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তি।[৬২] সভায় এই চতুর্বিধ উদ্দেশ্য বিবৃত করে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। বক্তৃতাকালে তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন', 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রভৃতি সমকালীন প্রতিষ্ঠানগুলি থাকা সত্ত্বেও কেন নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হল সে সম্পর্কে বলেন,

'that they had all been instituted to serve a particular purpose. The association (Indian Association) would embrace everything that would conduce to the well-being of our country and countrymen as a whole. It would never hesitate to agitate for the redress of grievances and wrongs. It would not over-ride the activities of others, but would be doing its duty in close co-operation with them peacefully and sympathetically.'[৬৩] সুবিখ্যাত লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (পরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা) চন্দ্রনাথের আনীত প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন।

চন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান লীগ'-এর পক্ষে রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র হেমন্তকুমার ঘোষ একসঙ্গে উঠে বলতে শুরু করেন এবং এরূপ একটি নতুন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। কেননা, 'ইণ্ডিয়ান লীগ'-এর দ্বারাই উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যগুলি সুসম্পাদিত হওয়া সম্ভব। তার ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত বাদানুবাদ হয়।[৬৪] অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়ে একখানি পত্র লেখেন; সভায় সেটি পাঠ করেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পত্রটি পরে 'সাধারণী' (১৬ শ্রাবণ, ১২৮৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। চন্দ্রনাথ 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্বোধনী দিবসে প্রথম প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শুধুমাত্র এই কর্মগৌরবের জন্যই তিনি একখানি শ্রদ্ধার আসন পেতে পারেন। কেননা, 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'ই (১৮৭৬) পরবর্তীকালে 'জাতীয় কন্‌গ্রেস' (১৮৮৫)-এ রূপ লাভ করেছিল। 'ভারতসভা'র প্রথম অধিবেশনে দেশের তৎকালীন যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে কার্য নির্বাহক সভা গঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসুও ছিলেন।

'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষে চন্দ্রনাথ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। ইতোমধ্যে বাংলার লেঃ গভর্ণর রিচার্ড টেম্পল ১৮ এপ্রিল, ১৮৭৬-এর একটি 'মিনিটে' সারা দেশে 'রেন্ট-ল' বা খাজনা-আইন প্রস্তাব করেন। এর ফলে বাংলায় কৃষকদের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হবে মনে হওয়ায় 'ভারত সভা' প্রস্তাবের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য একটি

উপসমিতি গঠন করেন। এই উপসমিতির সম্পাদক হিসাবে চন্দ্রনাথ দক্ষতার পরিচয় দেন। এই উপসমিতির একাধিক অধিবেশন বসেছিল এবং কতগুলি প্রশ্ন তৈরী করে 'ভারত সভা'র বিভিন্ন শাখায় পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা হয়।[৬৫]

'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষায় ব্যাপক হারে ভারতীয় ছাত্রদের উত্তীর্ণ হতে দেখে বিদেশী শাসক সম্প্রদায় ভীত হয়ে পড়েন। কেননা এটা তাদের স্বার্থের প্রতিকূল। ভারতীয় ছাত্রদের 'সিভিলিয়ান' হওয়ার প্রবণতা হ্রাস করার জন্য ইংরেজ সরকার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ করার প্রস্তাব করেন। ভারত সভার পক্ষে কলকাতার টাউন হলে এক সভার আয়োজন হয় (২৪ মার্চ, ১৮৭৭)। সভায় অন্যান্য-দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল, মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীরা। এই সভা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্প্রসারণের পক্ষে মত দেন এবং বয়স ২১ থেকে বাড়িয়ে ২২ করার পক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করেন। এই সভায় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে একখানি স্মারকলিপি প্রস্তুত করার জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয়। উপ-সমিতিতে ছিলেন, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, নবাব মীর মহম্মদ আলি, কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রলাল সরকার, মনো-মোহন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু (সম্পাদক)।[৬৬]

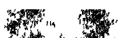
পরবর্তীকালে অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে চন্দ্রনাথের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছিল। সম্ভবত সরকারী কর্মে নিযুক্ত হওয়ায় (৭ অক্টোবর, ১৮৭৯) তিনি সরকার বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে নিরুৎসাহী হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের (১ জানুয়ারী, ১৯০৪) পর বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) সপক্ষে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করে তিনি দুই খানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি চর্চা পরিত্যাগ করলেও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তিনি সহানুভূতি হারান নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের 'পকেট বুক' থেকে জানা যাচ্ছে ১৮৯৬ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে প্রথম 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হয়। জোড়াসাঁকোয় কন্‌গ্রেসের নেতৃবৃন্দ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুবান্ধব সহ এই অনুষ্ঠানে

যোগ দেবার কথা ভেবেছিলেন। ঐ সূত্রে 'পকেট-বুক'-এ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামের সঙ্গে প্রিয়নাথ সেন, চন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, লোকেন পালিত, জগদীশচন্দ্র বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম পাওয়া গেছে। লোকেন পালিত গিয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি।[৬৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব বাংলার সাহিত্য ও সমাজ জীবনে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন।'[৬৮] বঙ্কিমচন্দ্র ও 'বঙ্গদর্শন'-এর জ্যোতিপ্রভাবে অনেকেরই হৃদ্‌পদ্ম সেদিন বিকশিত হয়েছিল এবং বঙ্কিমকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডল তৈরী হয়েছিল যাকে পরবর্তীকালে বলা হতে থাকে 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখক গোষ্ঠী। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এর 'পত্র সূচনা'য় 'ইংরেজি প্রিয় কৃতবিদ্যগণ'কে দেশীয় ভাষায় রচনা প্রকাশ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমের আগ্রহে ও উৎসাহে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ইংরেজি ভাষা পরিত্যাগ করে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। চন্দ্রনাথ দূর থেকে বঙ্কিমের কৃতিত্ব লক্ষ করছিলেন; কিন্তু বাংলায় লিখতে সাহসী হন নি। পরবর্তীকালে আত্মকথায় তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গদর্শন পড়িতে ভাল লাগিত, ইচ্ছা হইত উহাতে লিখি; কিন্তু লিখিতে সাহস হইত না।'[৬৯]

ছাত্রজীবনে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল তা এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে চন্দ্রনাথের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। কলকাতা শহরে বাস করেও বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় অনেক পরবর্তীকালে, ১৮৭৬-এর পূর্বে নয়। ঘটনাটি আমাদের বিস্মিত করে। যাই হোক, চন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের সাক্ষাতের তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসটুকু এখন আমরা বিবৃত করব—

হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ও সুখ্যাত ছাত্র রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে একটি 'রি-ইউনিয়ন' করার পরিকল্পনা করেন। সেই অনুযায়ী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকত-নিকুঞ্জ' নামক সুদৃশ্য বাগান বাড়ীতে কলেজ রি-ইউনিয়নের প্রথম অধিবেশন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সাফল্যে উল্লসিত হয়ে



রাজনারায়ণ বসু পরবৎসর (১৮৭৬) দ্বিতীয় বার রি-ইউনিয়ন করার উদ্যোগ নিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'দ্বিতীয় বৎসর কলেজ সম্মিলনে জগদীশনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন না। সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা আমাকে করিতে হইয়াছিল। এ সম্মেলনও 'মরকত নিকুঞ্জ'-এ হয়। বিখ্যাত 'শকুন্তলাতত্ত্ব' প্রণেতা বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম. এ. এইবার সম্মেলনে সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।'[৭০] কলেজ রি-ইউনিয়ন সম্পর্কে রাজনারায়ণ আবেগপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন, 'সম্বৎসরের পর বৃদ্ধ ও 'কালেজিয়ান' একত্রিত হইয়া পরস্পর মিষ্টালাপ করিতেন। তাহাতে বড় আনন্দের উদয় হইত।... কলেজ সম্মিলন জ্ঞানাহার ও সৌহার্দ্য-রসামৃত পানের (feast of reason and flow of soul) অথবা জ্ঞানের ভোজ ও আত্মার ঢলাঢলি করবার একটি প্রধান উপায় ছিল।'[৭১]

এর তুলনায় চন্দ্রনাথের দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ ও আবেগবর্জিত। তিনি কলেজ রি-ইউনিয়নের মিলন সভাকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন তা দেখা যেতে পারে। চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি ঐ কলেজ রি-ইউনিয়নে যাইতাম। যাইতাম কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, প্যারীচাঁদ, রামশংকর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কালেজোত্তীর্ণ—আমিও তাঁহাদের সমান, এই শ্লাঘার ভরে। এবং আমার বিশ্বাস অনেকেই আমার ন্যায় শ্লাঘার ভরে যাইতেন—সদ্ভাবসৃষ্টি বা বন্ধুত্ববিস্তারের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কেহ যাইতেন না।'[৭২] যাই হোক, চন্দ্রনাথ কিন্তু এই উৎসবের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্ররা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।......মনে আছে, কোন জার্মাণ যোদ্ধ-কবির যুদ্ধ কবিতার ইংরেজি তর্জমা তিনি সেখানে স্বয়ং পড়িবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আমাদের বাড়ীতে সেগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন।'[৭৩]

কলেজ রি-ইউনিয়নের দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার জানাচ্ছেন, চন্দ্রনাথই উদ্যোগী হয়ে রবীন্দ্রনাথকে সেই সভায় নিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় ১৫ এবং সেন্ট

জেভিয়ার্স স্কুলের 'নামে মাত্র' ছাত্র।[৭৪] এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথ 'লোক-বিশ্রুত বঙ্কিমবাবু'কে প্রথম দেখেন। 'জীবন স্মৃতি'তে উৎসবের বিবরণ দান প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখার প্রাথমিক বিস্ময় ও সেই সঙ্গে বঙ্কিমের একটি উজ্জ্বলমূর্তি আমাদের উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।[৭৫] একই সভায় চন্দ্রনাথও সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখলেন। প্রথম দর্শনের বিস্ময় ও উপলব্ধি চন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন এই ভাবে, 'তাঁহাকে (বঙ্কিমচন্দ্রকে) যখন দেখিলাম তখন আমার কল্পিত মূর্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল তাঁহার ঠিকানা রহিল না।…অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করিতেছি, এমন সময় একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে প্রকার অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্যুৎকেও সেই প্রকার অভ্যর্থনা করিলাম বটে। কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়াইয়া গিয়া বলিলাম— আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর একবার করমর্দ্দন করিতে পারিব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।'[৭৬] শুধু হাতের মধ্যেই নয়, বঙ্কিমের হৃদয়ের উষ্ণতাও চন্দ্রনাথের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিমের এই শুভ সংস্পর্শ চন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে গভীর, ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৮৭৬ সালে বঙ্কিম-সন্দর্শনের পরেও পূর্ব অভ্যাসমত কিছুদিন চন্দ্রনাথ ইংরেজিতেই প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল 'বেথুন সোসাইটি'তে পঠিত **High Education in India** শীর্ষক প্রবন্ধের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই সময় **Oriental Miscellany** নামক মাসিক পত্রিকার পক্ষ থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে চন্দ্রনাথ **Durga Puja in My Boyhood** নামে একটি বাল্য স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ লেখেন (অক্টোবর, ১৮৭৯)। রচনায় তিনি 'দুর্গাদাস' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। রচনাটি চন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে (স্মৃতিনির্ভর ও সমধর্মী রচনা বিবেচনায়) স্থান পেয়েছে।

এখনও পর্যন্ত চন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় একছত্রও লেখেন নি। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের ফলে বাংলা সাহিত্যে যে সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা দেখা দিয়েছিল তা

চন্দ্রনাথকেও উৎসাহিত করে। কিন্তু বাংলায় কিছু লিখতে তিনি সাহসী হন নি। ১৮৭৯ সালের ৭ই অক্টোবর বাংলা সরকারের লাইব্রেরিয়ান পদে বৃত হয়ে তিনি বাংলা গ্রন্থাদি নিয়মিত মনোযোগ সহকারে পড়তে শুরু করেন এবং একই সঙ্গে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় ইংরেজিতে গ্রন্থ সমালোচনা করতে থাকেন। উক্ত পত্রিকার পৃষ্ঠায়[৭৭] চন্দ্রনাথকৃত 'কৃষ্ণ-কান্তের উইল'-এর (১৮৭৮) সমালোচনা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হন এবং তাঁকে বাংলা লিখবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ আরো বিশদ করে অন্যত্র বলেছেন, 'বঙ্কিমবাবু যখন যোড়াঘাটের (চুঁচুড়া) বাড়ীতে ছিলেন, তখন বাঙ্গালা লিখিবার জন্য আমায় বড়হ পীড়াপীড়ি কারয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—'ভয় করে, বানান ভুল করিয়া হাস্যস্পদ হইব ?' তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'বঙ্গদর্শন' প্রেসে একজন পণ্ডিত আছেন, তিনি বানান ঠিক করিয়া দেন।'[৭৮] বঙ্কিমচন্দ্র যে রমেশচন্দ্র দত্ত ও চন্দ্রনাথ বসুকে মাতৃভাষার দিকে ফেরান, এ কথা বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বলেছেন।[৭৯] কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতি কি ছিল না ? চন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, 'আমি কখনও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ঘৃণা করি নাই। তখন চারিদিকে মাতৃভাষার নিন্দা শুনিতাম, স্কুলে উহা ভাল করিয়া শেখান হইত না; কিন্তু আমি লুকাইয়া বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিতাম। লিখিয়া লুকাইয়া রাখিতাম—কাহাকেও দেখাইতাম না।'[৮০] এই গোপন প্রস্তুতিটুকু ছিল বলেই তিনি প্রথমেই 'শকুন্তলাতত্ত্ব'-এর মত গ্রন্থের লেখক হতে পেরেছিলেন।

চন্দ্রনাথ বসু যখন 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন তখন 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪-৮৯) হাতে। চন্দ্রনাথ ১২৮৭ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে 'বঙ্গদর্শন'-এ কালিদাসের অমর সৃষ্টি 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করলেন। এই প্রবন্ধ রচনার পূর্বে রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে চন্দ্রনাথ সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছিলেন।[৮১] চন্দ্রনাথের 'শকুন্তলাতত্ত্ব'-এর সমাদর করেছিলেন তৎকালীন সারস্বত সমাজ। যখন লেখাটি 'বঙ্গদর্শন'-এ সমাপ্ত হয় নি, তখন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'সাবিত্রী লাইব্রেরী'তে পঠিত 'বাঙ্গালা সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'চন্দ্রনাথবাবু চিন্তাশীল; তিনি বহুকাল কলিকাতা রিভিউয়ের সমালোচক ছিলেন, এক্ষণে ইংরেজী ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা

লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি 'বঙ্গদর্শন'-এ অভিজ্ঞান শকুন্তলের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা ইউরোপীয় সমালোচনা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।'৮২

সত্যই, চন্দ্রনাথ ইংরেজি পরিত্যাগ করে স্থায়িভাবে মাতৃভাষাকে অবলম্বন করলেন। এ বিষয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি, ' 'শকুন্তলাতত্ত্ব' লিখিবার পর সরকারী কার্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরাজী লিখি নাই। লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লেখার ন্যায় অন্য কোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নয়। যখন বাংলায় লিখি তখন যাহা লিখি সম্মুখে মূর্তিমান দেখি; যখন ইংরাজীতে লিখি তখন যাহা লিখি তাহার ও আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে যেন একখানা পর্দা বিলম্বিত দেখি।'৮৩

'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত 'ফুলের ভাষা' (ভাদ্র, আশ্বিন, ১২৮৮; বৈশাখ ১২৮৯) 'অদৃষ্ট' (শ্রাবণ, ১২৮৯) ও 'কোকিল' (ভাদ্র, ১২৮৯) ব্যক্তিগত রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনগর্ভ আপাতলঘু রচনাগুলি এখানে চন্দ্রনাথের আদর্শ। রচনায় দার্শনিক মনন, দূরযানী রোমান্টিক কল্পনা ও মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের পরিচয় আছে। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত চন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধগুলি হল 'ইহলোক ও পরলোক' (অগ্রহায়ণ, ১২৮৯) 'জীবন ও পরলোক' (পৌষ, ১২৮৯) ও 'পরলোক কোথায়' (ফাল্গুন, ১২৮৯)। ইহজীবন চর্চা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মূল লক্ষ্য কিন্তু চন্দ্রনাথ শুধু ইহলোক নয়, পরলোক চর্চায় আগ্রহ দেখিয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ঈষদ্ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'হিন্দুপত্নী' ('বঙ্গদর্শন', মাঘ, ১২৮৯) বঙ্কিমসাহিত্যের কয়েকটি নারীচরিত্রের সমালোচনা। এ ছাড়া 'ব্রহ্মচর্য' ('বঙ্গদর্শন', কার্তিক, ১২৯০) ও 'আমার দেবতা' (মাঘ, ১২৯০) দার্শনিক মননসমৃদ্ধ গুরু প্রবন্ধ।

শ্রীশ মজুমদার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর কার্তিক ও পৌষ সংখ্যায় (১২৯০) চন্দ্রনাথের অভিনব রসরচনা 'পশুপতি সম্বাদ' প্রকাশিত হয়েছিল। এই লঘুরসের রচনাটি চন্দ্রনাথের অপরাপর গম্ভীর রসের রচনার সঙ্গে মেলে না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ' 'হাল্‌কা নিন্দাধর্মী পশুপতি সম্বাদ' লিখিয়া তিনি যদিও তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের আদর্শচ্যুত হইয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন, তথাপি রসরচনাতেও যে তাঁহার হাত ছিল 'পশুপতি

সম্বাদ' তাহাই প্রমাণ করে।'[৮৪] সম্ভবত বঙ্কিমের অজ্ঞাতে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা স্বভাবগম্ভীর বঙ্কিমের অনুমোদন লাভ করেনি। চন্দ্রনাথ বঙ্কিমের বিরাগভাজন হয়ে ও অনুতপ্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। কিন্তু 'হাকিম' বঙ্কিমের 'হুকুম' তাতে নড়ে নি। তিনি ১২৯০ সালের মাঘ সংখ্যার পর 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এই পর্বে 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক কে ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার না চন্দ্রনাথ বসু? এই স্থায়ী প্রশ্নটির মীমাংসা প্রয়োজন। নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'কিছুদিন পরে চন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক হন।'[৮৫] শশিভূষণ বিদ্যালংকারও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৮৬] তথ্যটি ভ্রমাত্মক। যদিও চন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উৎসাহে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় তৃতীয়বার 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু চন্দ্রনাথ কার্যত সম্পাদক ছিলেন না। এ বিষয়ে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের প্রতিবেদন আছে। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশকালে তিনি লিখেছিলেন, '১২৯০ সালের কার্তিক মাসে বঙ্কিমবাবুর যত্নে সঞ্জীববাবুর হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন যখন গ্রহণ করি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তখন উহার সম্পাদনকার্যে প্রধান সহায় ছিলেন। উহা সাধারণত সকলের জানা নাই। বঙ্গদর্শন স্থায়ী হইলে তিনিই তখন প্রকাশ্যে সম্পাদকতা গ্রহণ করিতেন এবং সেজন্য বঙ্কিমবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতিও লইয়াছিলাম।'[৮৭] সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এও তাঁর সহায়তা ছিল। কিন্তু চন্দ্রনাথ কখনই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পান নি।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ হবার পর পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির (১৮৫১-১৯২৮) সঙ্গে বঙ্কিম ও তাঁর সাহিত্যানুচর চন্দ্রনাথ বসুর তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকার ঘটে। সে সময় বঙ্কিমের গানকিভাঙ্গার বাসায় প্রতি রবিবার নিয়মিত প্রখ্যাত লেখকেরা যে সাহিত্য সংগতে একত্রিত হতেন তার বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে জানা যায়[৮৮]। ছাত্রজীবন থেকেই চন্দ্রনাথের একটি অস্বচ্ছ মানস সংকট চলছিল। তিনি একদা দার্শনিক কোম্‌তের পজিটিভিজম্‌ গ্রহণ করেছিলেন। তার আগে ব্রাহ্মসমাজে তাঁর যাতায়াত ছিল। কিন্তু কোম্‌তের মতবাদে ঈশ্বরের স্থান নেই দেখে তাঁর অন্তরে অতৃপ্তি থেকে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। নিজের মানসিক দ্বন্দ্ব ও শশধরের

বক্তৃতায় মন্দোত্তীর্ণ হবার সংবাদ চন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়ে গেছেন, 'ইংরাজীতে দেখিতাম, ইংরাজের মুখে শুনিতাম Religion কেবল ঈশ্বর লইয়া আর কিছু লইয়া নয়। ভাবিতাম তবে ঈশ্বর ছাড়া এই যে এত বস্তু ব্যাপার রহিয়াছে ইহাদের সহিত তবে কি মানুষের কোন ধর্মমূলক সম্বন্ধ নাই? বঙ্কিমবাবুর বাসায় প্রতি রবিবার আমরা এই সকল আলোচনা করিতাম। সেই সময় পূজনীয় শশধর তর্কচূড়ামণির নাম শুনা গেল। ইন্দ্রনাথকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) বলিয়া বঙ্কিমবাবু চূড়ামণি মহাশয়কে একদিন আপন বাসায় আনালেন। চূড়ামণি মহাশয় ধর্মকথা কহিলেন। তিনি যেমন বলিলেন—ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম, অর্থাৎ, যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম—অমনি আমার সকল সংশয় দূর হইল, বিশ্বে যাহা কিছু আছে বিশ্বনাথ হইতে তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম, কারণ বিশ্ব তাহা হইলে আমাদিগকে রক্ষা না করিয়া বিনাশই করে; যাহা এত অন্বেষণ করিয়া পাই নাই তাহা পাইলাম, আমার আনন্দের সীমা রহিল না।'[৮৯]

বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম দিকে শশধরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। কিন্তু শশধরের ইহবিমুখ অধ্যাত্মচিন্তা ও ছদ্ম-যুক্তিবাদ অল্পদিনেই বঙ্কিমের মোহমুক্তি ঘটায়। বঙ্কিম-পরিকর চন্দ্রনাথ কিন্তু তর্কচূড়ামণির বক্তৃতায় বিশ্বাসের একটি সত্যভূমির সন্ধান পেয়ে তাতেই স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। নিজের বিদ্যা, সুগভীর অধ্যয়ন, মননশক্তি তাঁকে স্থানচ্যুত করতে পারল না। সেইজন্য তর্কচূড়ামণির প্রভাব তাঁর রচনাবলী থেকে কালক্রমে ধৌত হতে পারেনি।

চন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে বঙ্কিমানুসরণ ঘটেছে। নিজের উত্তরজীবনে বঙ্কিম 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' (১৯০২)[৯০] ব্যাখ্যায় যে উদার মনস্বিতা ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তার উত্তুঙ্গতা ছিল চন্দ্রনাথের স্পর্ধাতীত। তাই তিনি সংস্কারপন্থা পরিত্যাগ করে গ্রহণ করলেন সংরক্ষণপন্থা। তাঁর কাছে ইতিহাসচেতনা অপেক্ষা ঐতিহ্যচেতনা প্রাধান্য পেল। সাহিত্যজিজ্ঞাসু ক্রমে হয়ে পড়লেন সমাজনীতিরক্ষক। অথচ চন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দান যুক্তিবাদকেও বিসর্জন দিতে পারেন না; তার ফলে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-৯৪) সঙ্গে তাঁর মনঃসান্নিধ্য ঘটে। চন্দ্রনাথের 'গার্হস্থ্যপাঠ' (চৈত্র, ১২৯২), 'হিন্দুবিবাহ' (পৌষ, ১২৯৪) ও 'সংযমশিক্ষা' (১৩১১) প্রভৃতি গ্রন্থ অংশত শশধর

তর্কচূড়ামণির দ্বারা প্রভাবিত; অবশ্য লেখকের 'আচার্যদেব' ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবই বেশি।

৫

বঙ্কিমচন্দ্র শশধর তর্কচূড়ামণিকে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। অনেকেরই ধারণা হয়েছিল বঙ্কিম শশধরের হিন্দুধর্মের নব-ব্যাখ্যায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনিও সেই সময় হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্ম নিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে আলোচনারত, যদিও তাতে শশধর-পন্থার অনুসরণ ছিল না। কেননা তা ছিল অসম্ভব। তা সত্ত্বেও প্রচারিত হয়েছিল বঙ্কিম শশধর-পন্থীও নব্য-হিন্দুধর্মের অন্যতম ব্যাখ্যাতা। তার ফলে বঙ্কিমের সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের বিরোধ আসন্ন হয়ে ওঠে। আদি ব্রাহ্মসমাজ মোটামুটি ভাবে ধর্ম ও সমাজ ব্যাপারে রক্ষণশীল। তাঁরা মনে করতেন তাঁদের ধর্মমত মূল হিন্দুধর্ম অনুমোদিত। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব নিরাকার পরমেশ্বরের আরাধনা, নব্য-হিন্দুরা এই তত্ত্বকে পরম সত্য বলে মানতে রাজী ছিলেন না। তাই নব্য-হিন্দুসমাজের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ বাধে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবন'-এর (শ্রাবণ, ১২৯১) ও 'প্রচার'-এর (শ্রাবণ, ১২৯১) প্রথম সংখ্যায় 'ধর্মজিজ্ঞাসা' ও 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধে নিজস্ব ধর্মমত ব্যাখ্যা করলে বঙ্কিম-সুহৃদ আদি ব্রাহ্ম-নেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় (ভাদ্র, ১২৯১) এর প্রতিবাদ করেন। এই সূত্রেই বিরোধ বাধল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। যখন বাংলা সাহিত্যের দুই যশস্বী লেখক পরস্পরের মধ্যে অহেতুক মসিলেপনের কাজে ব্যস্ত সেই সময় বঙ্কিমের পার্শ্বচর চন্দ্রনাথ বসু তার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েন। বিরোধের পক্ষ পরিবর্তিত হয়ে গেল—বঙ্কিমের স্থানে এলেন চন্দ্রনাথ।

'নবজীবন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১২৯১) 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ঈষদ্ সমালোচনা ছিল। এই প্রবন্ধের উত্তর ও 'নবজীবন'কে আক্রমণ করে একটি স্বাক্ষরবিহীন পত্র 'সঞ্জীবনী' (শ্রাবণ, ১২৯১) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'নবজীবন'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার এর কোন উত্তর দিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'কিন্তু নবজীবনের আর একজন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয় বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বসু ('বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকে) ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; এবং

গালাগালির রকমটা দেখিয়া 'ইতর' শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।...তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামি পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল—'র'। লোকে কাজেই বলিল পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের লেখা। রবীন্দ্রবাবু ইতর শব্দটা চন্দ্রবাবুকে পাল্টাইয়া বলিলেন।'[৯১] বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ কালক্রমে মিটে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ ক্ষমার সঙ্গে একখানি পত্র দিয়ে বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করেছিলেন।[৯২] কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে চন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ চলে এবং ধর্মমত সংক্রান্ত বিরোধ শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের মতাদর্শের বিরোধ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

চন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১২৯৭) হিন্দুদের আহার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বক্তব্যে শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাব ছিল। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি লাভ করতে হলে আহারে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার আবশ্যক এবং ধর্মের জন্য আহারে বিচার হিন্দুধর্মের একটি লক্ষণ। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 'সাহিত্য'-এ (পৃঃ ৩৫৭-৬৩) আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধের বক্তব্য সম্প্রসারিত করে তিনি এখানে বলেন, আহার শুধুমাত্র 'দেহের পুষ্টিসাধন'-এর জন্য নয়, 'আত্মার শক্তিবর্ধন'-এর জন্যও আবশ্যক। লেখক নিরামিষ আহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, আজকের নব্যপন্থী যুবকেরা যে গোমাংস, শূকরমাংস, মুর্গিমাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করছে তা স্বাস্থ্যরক্ষার কারণে নয়, এর পিছনে আছে তাদের লুব্ধতা ও মোহাচ্ছন্নতা।

রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় (পৌষ, ১২৯৮, পৃঃ ১৭১-৮১) 'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত' শীর্ষক প্রবন্ধে চন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি 'প্রাচীন ব্রাহ্মণ বটুদের' ঔদরিকতাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ অনেকক্ষেত্রে বক্তব্যকে ত্যাগ করে বক্তাকে আঘাত করতেও উদ্যত হয়েছে। চন্দ্রনাথ এই প্রতিবাদের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় (পৃঃ ৫৬২-৬৯) আহার সম্পর্কে তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধে পূর্ব বক্তব্যকে আরও একটু বিশদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় ('মাসিক সাহিত্য সমালোচনা', চৈত্র, ১২৯৮, পৃঃ ৪৬০-৬৩) তার প্রতিবাদ করতে বিলম্ব করেন নি।

বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যা হয়েছিল তা ধর্মযুদ্ধ; ধর্মের মত একটি

মৌল বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ। কিন্তু চন্দ্রনাথের সঙ্গে একটি অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর শক্তি অনেক পরিমাণে ব্যয় করেছিলেন তা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। এ যেন তর্কের জন্যই তর্ক, কোন মহৎ উদ্দেশ্য বা সৃষ্টি প্রেরণা এর পিছনে ছিল না।

আহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধের মাঝখানে চন্দ্রনাথ 'সাহিত্য'-এ (মাঘ, ১২৯৮, পৃঃ ৪৬৫-৭৪) 'লয়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন, 'সোঽহং—মানুষ সে-ই—মানুষ পরব্রহ্ম। ···হিন্দুর কঠোরতা কঠিনতা ও নিষ্ঠুরতা সেই সচ্চিদানন্দের কঠোরতা কঠিনতা ও নিষ্ঠুরতার অনুরূপ।···এই কঠিনতার জন্য হিন্দুর হিন্দুত্ব। এইরূপ কঠিনতার গুণেই এক একটা জাতির জাতীয়তা হয় ও জাতীয় উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্ব হয়।' রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় ('সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা', ফাল্গুন, ১২৯৮, পৃঃ ৩৭১-৭৫) চন্দ্রনাথের উক্ত রচনায় 'অন্যায় অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে' বলে তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, 'ব্রহ্মে বিলীন হইবার সাধনা জাতীয়তা রক্ষার বিরোধী' এবং 'য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ আত্মসুখ নহে, বিশ্বসুখ। মনুষ্যত্বের চরম পরিণতি সাধনই তাহার সাধনার বিষয়।' নয় বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের যে ধর্মমতকে রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেছিলেন এখন সেই ধর্মমতের পক্ষাবলম্বন করে তিনি চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। চন্দ্রনাথ এবার ধৈর্যচ্যুত হয়ে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য'-এ 'লয়' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে ঈষদ আঘাত করে লিখেছিলেন, 'আজিকাল আমাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয়ের মধ্যে অনেকে যে বিষম স্বজাতি বিদ্বেষ, বিষম হিন্দুবিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন এবং স্বজাতির শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারদিগকে নকড়া ছকড়া করিতেছেন, ইহাতে একটু রাগ হইতেছে, ক্ষোভও হইতেছে।' প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় (আষাঢ়, ১২৯৯, পৃঃ ১২৫-৩১) যে প্রবন্ধ লেখেন তার নাম 'চন্দ্রনাথবাবুর লয়-তত্ত্ব'। চন্দ্রনাথ 'সাহিত্য'-এ (শ্রাবণ, ১২৯৯, পৃঃ ২৫১-৫৯) আত্মপক্ষ সমর্থন করে 'আমার স্বরচিত লয়-তত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখলে লয় সম্বন্ধে তর্কের শেষ হয়।

চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের বিবাদের সূত্রে লোকেন পালিত কর্তৃক চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়-তত্ত্ব'-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রকাশের কথা উল্লেখ করা দরকার। তিনি 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যায় 'প্রসংগ কথা' পর্যায়ে 'ভেলকি' নামে চন্দ্রনাথ বসুর 'বিরাট লয়-তত্ত্ব'-এর

সমালোচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বিতর্ক আরো কিছুদিন চলেছিল। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে 'সাহিত্য' (পৃঃ ৪১৩-২০) পত্রিকায় প্রকাশিত চন্দ্রনাথের 'কড়াক্রান্তি' প্রবন্ধের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি ব্যঙ্গমূলক উত্তর লেখেন 'কড়ায় কড়া কাহন কানা' ('সাধনা' পৌষ, ১২৯৯, পৃঃ ১৫৬-৬৫) নাম দিয়ে। এখানে তিনি হিন্দু সমাজকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বাণে বিদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চন্দ্রনাথ তথা হিন্দু বিদূষণ মনোভাব আরও প্রকাশ পেল 'বাংলা লেখক' শীর্ষক রচনায় ('সাধনা' মাঘ, ১২৯৯, পৃঃ ১৮১-৮৯)। চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বিরোধ যখন তুঙ্গে সেই সময় 'সাধনা'য় (শ্রাবণ, ১২৯৯) রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট' নামে একটি দীর্ঘ ব্যঙ্গমূলক কবিতা প্রকাশিত হয়। এতে তৎকালীন সচেতন পাঠক সমাজ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, এই কবিতায় চন্দ্রনাথই উদ্দিষ্ট।[৯৩]

এই সময় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬১-১৯৪০) 'তর্কবৈচিত্র্য' নামে একটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য'-এ (ফাল্গুন, ১২৯৯) প্রকাশিত হয়েছিল। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী এবং খ্যাতনামা সাংবাদিক। তাঁর লেখায় কিন্তু সে যুগের নিরপেক্ষ পাঠকের মনোভাব অনেকাংশে ধরা পড়েছিল। দু'জন 'স্বদেশানুরাগী' 'মহৎস্বভাব' ও 'খ্যাতনামা' ব্যক্তির এই দ্বন্দ্বে লেখক দুঃখ বোধ করেছিলেন। লেখক এটাও লক্ষ করেন যে, এই তর্কযুদ্ধের প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ, অপরপক্ষে চন্দ্রনাথ নীরব; এবং 'রবীন্দ্রনাথই প্রত্যেকবার গায়ে পড়িয়া তর্ক তুলিয়াছেন'। এই কারণে লেখকের সহানুভূতির অনেকাংশ চন্দ্রনাথ লাভ করেছেন। একই প্রসঙ্গে অন্য একজন লেখকের মন্তব্য স্মরণীয়। রমাপ্রসাদ চন্দ 'মাসিক বসুমতী'-তে (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯) লেখেন, 'চন্দ্রনাথবাবুর হিন্দুধর্ম ও সামাজিক আচার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের উদারতার অভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে। মতভেদ এই অনুদারতার কারণ নহে।'[৯৪]

হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ও বয়স নিয়ে সমকাল বাদ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। হিন্দু বিবাহ প্রশ্নে নব্য-হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মীরা এমন কি খ্রীষ্টধর্মী জয়গোবিন্দ সোমও জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। চন্দ্রনাথ তাঁর 'হিন্দু পত্নীর আদর্শ' ও 'হিন্দু বিবাহের বয়স ও আদর্শ' প্রবন্ধে বাল্য বিবাহের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)

চন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথকে লেখনী চালনা করতে অনুরোধ করেন।[২৫] সেই অনুসারে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু বিবাহ' নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর হলে ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় তা পাঠ করেন। পরে প্রবন্ধটি 'ভারতী'-তে (আশ্বিন, ১২৯৪) প্রকাশিত হয়। চন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি চয়ন করে এবং মনুর স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বচন উদ্ধৃত করে নিজ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের অবলম্বিত পথকে নিন্দাযোগ্য মনে করেছিলেন। বিবাহ প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে কিছু 'পত্রাপত্রি' হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত চন্দ্রনাথ বসুকে এ সম্পর্কে পত্র দেন। পত্রোত্তরে (পত্র তারিখ ১৭ই আষাঢ়, ১২৯৮) চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথকে 'হিতবাদী'-তে এ সম্পর্কে লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। তার ফলে রবীন্দ্রনাথ 'অকাল বিবাহ' নামে প্রবন্ধ লিখে চৈতন্য লাইবেরীতে পাঠ করেন। চন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র (পত্র তারিখ ২১শে শ্রাবণ, ১২৯৮) থেকে জানা যাচ্ছে চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হন নি। চন্দ্রনাথ বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে বালিকা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' নামিত কবিতায় চন্দ্রনাথের বক্তব্যের হাস্যকরতা উদ্ঘাটিত করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীমান দামু বসু ও চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু' নামে যে কবিতা 'সঞ্জীবনী'-তে প্রকাশ করেছিলেন সে কবিতার তীব্র ব্যঙ্গের লক্ষ্য ছিল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১২৬১-১৩১২) ও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার লেখক চন্দ্রনাথ বসু।[২৬] কারণ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা ছিল নব্য-হিন্দুধর্মের প্রচারক ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী।

যাই হোক, 'সাহিত্য'-এ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রবন্ধ 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য পাঠকের প্রতি' নাম দিয়ে একটি প্রতিবাদ পত্র 'সাহিত্য'-এ প্রকাশের জন্য দেন। কিন্তু 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তা প্রকাশে অস্বীকৃত হলে 'সাধনা'-য় (চৈত্র, ১২৯৯) প্রতিবাদ পত্রটি প্রকাশিত হয়। পরের মাসে অবশ্য পত্রটি 'সাহিত্য' (বৈশাখ, ১৩০০) পত্রিকায়ও 'রবীন্দ্রনাথ বাবুর পত্র' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ অসংকোচে স্বীকার করেন 'চন্দ্রনাথবাবুর সহিত মতভেদ হওয়া আমি আমার দুর্ভাগ্য জ্ঞান করি। কারণ আমি তাঁহার

উদারতা ও অমায়িকতার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অধিকাংশ মত যদি বর্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত না হইত তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রকাণ্ড বাদ-প্রতিবাদে আমার কখনই রুচি হইত না।' এই পত্র প্রকাশিত হবার পর চন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের ('সেভেন ইয়ার্স ওয়ার') বিরাম হয়েছিল।[২৭]

রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথের সম্পর্কের আর একটি দিকও আছে। উভয়ে উভয়ের গুণগ্রাহী ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। কেবল তাঁরা যখন যথাক্রমে ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি হিসাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন তখন তাঁদের বক্তব্য ব্যঙ্গে শাণিত, বক্রোক্তিতে উচ্চকিত কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও স্নেহ বরাবর বর্তমান ছিল। চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশের মাষ্টার মশাইয়ের নাম চন্দ্রনাথ বাবু।[২৮] রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথকে 'ভারতী' তে লেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' রবীন্দ্রনাথের অবিমিশ্র প্রশংসালাভে ধন্য হয়েছে। তিনি যে চন্দ্রনাথের 'বেতালে বহু রহস্য' (১৯০৩) গ্রন্থে ব্যবহারের জন্য টেনিসনের একটি কবিতা অনুবাদ করে তা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন তা তাঁদের অক্ষুণ্ণ প্রীতিবন্ধনের স্মারক। চন্দ্রনাথও রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম মুগ্ধ পাঠক। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ছোট গল্প, কবিতা, উপন্যাস পাঠ করে চন্দ্রনাথ বার বার আপন মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। 'আহার' নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথের বিতর্ক এক সময় তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। 'সাধনা' (পৌষ, ১২৯৮) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'আহার বিষয়ে চন্দ্রনাথবাবুর মত' শীর্ষক প্রবন্ধে চন্দ্রনাথকে তীব্রতম আঘাত দিয়েছিলেন। অথচ, একই সময়ে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্প পড়ে চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন (২৫শে পৌষ, ১২৯৮) তাতে সামাজিক মতবিরোধের সামান্যতম তাপও নেই। বরং পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের প্রতি চন্দ্রনাথের স্নেহ ও শ্রদ্ধায় চিহ্নিত।

হিন্দুবিবাহ ও আহার নিয়ে উভয়ের মতবিরোধের একটি গভীরতর কারণ আমরা লক্ষ করেছি। রবীন্দ্রনাথ অল্পকালের জন্য দ্বিতীয়বার বিলাতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রত্যাগমন করেন ৩রা নভেম্বর, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক তার পরেই তিনি চন্দ্রনাথের প্রবল হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পাশ্চাত্য জীবনে যে কর্মচাঞ্চল্য ও সুস্বাস্থ্য তিনি দেখে এসেছিলেন

সেই মায়াকজ্জল তাঁর চোখে তখনও লাগানো। অথচ, ভারতীয় জীবনে তিনি দেখলেন শুধুই বিবর্ণতা, কর্মবিমুখতা ও স্বাস্থ্যহীনতা। এই পটভূমিতে বিবাহপদ্ধতিতে ও আহারে ভারতীয়তাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। য়োরোপের বয়স্কবিবাহ ও আমিষ আহার যে তাদের উন্নতির কারণ এমন ধারণাও ছিল। তার ফলে চন্দ্রনাথের নিরীহ বক্তব্যের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষেত্রে অহেতুক বাড়াবাড়ি করেছেন বলে মনে করি। চন্দ্রনাথ কোনও একটি পত্রে (?) রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপীয় ছাঁচের প্রকৃতি'-কে নিন্দিত করেছেন (দ্র. চন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, ২১শে শ্রাবণ ১২৯৮)। চন্দ্রনাথের বক্তব্য আংশিক সত্য বলেই মনে হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রমথ চৌধুরীকে একবার জানিয়েছিলেন, 'আমার ভারতীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়োরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে।' (পত্র তারিখ, ২৯শে জানুয়ারী ১৮৯৮)। প্রকৃতি-জ এই পার্থক্যই চন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামাজিক বিষয়ে মতভেদের কারণ।

চন্দ্রনাথের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের (১৮৪৭-১৯০৯) বিরোধ সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের উপর স্থাপিত এবং সেই কারণেই তা দুর্ভাগ্যজনক। চন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্রের কবিতার গুণগ্রাহী ছিলেন। টাউন হলের একটি সভায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়; সেদিন চন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্রের সদ্য প্রকাশিত 'আর্যদর্শন' কবিতাটির অংশবিশেষ আবৃত্তি করে কবিকে শুনিয়েছিলেন।[৯] শশধর তর্কচূড়ামণি সে যুগে হিন্দুধর্মের যে নবব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছিলেন তা অনেক সচেতন বুদ্ধিজীবীর মত নবীনচন্দ্রও সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে চূড়ামণি মশায় ও তাঁর শিষ্যবর্গকে নিয়ে অনেক কৌতুক আছে। অথচ, চন্দ্রনাথ শশধরী-পন্থার সমর্থক। তাই নবীনচন্দ্রের চোখে তিনি 'শশধরী হিন্দু'। পরবর্তীকালে তিনি যে চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তার পিছনে শেষ পর্যন্ত কোন ধর্মীয় মতপার্থক্যও ছিল না; নবীনচন্দ্র নিজেও হিন্দুধর্মের যুগোচিত নব-ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রনাথের বিরোধের কারণ সামাজিক বিষয়ে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। কিন্তু চন্দ্রনাথ-নবীনচন্দ্রের বিরোধ ক্ষুদ্র স্বার্থের উপর দাঁড়িয়ে ছিল।

চন্দ্রনাথ বসু 'স্কুল বুক কমিটি'র প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। নবীনচন্দ্র

তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) কাব্যখানির পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদন চেয়েছিলেন। চন্দ্রনাথ প্রধানত 'পলিটিক্যাল হিন্ট' ('রাজনৈতিক ঠেস') ও 'আদিরসের উপস্থিতি'র জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর অনুমোদনে বাধা দিয়েছিলেন। চন্দ্রনাথের 'প্রথম-নীতি পুস্তক' 'নূতন পাঠ' প্রভৃতি একাধিক গ্রন্থ তখন স্কুল বুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক। নবীনচন্দ্র মনে করেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে 'পলাশীর যুদ্ধ'কে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা, অন্যের বই অনুমোদন পেলে চন্দ্রনাথের নিজের বইয়ের বিক্রি বন্ধ হবে এবং তার ফলে প্রচুর আর্থিক লাভের পথ রুদ্ধ হবে। নবীনচন্দ্র শেষ পর্যন্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে প্রভাবিত করে এবং 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর আপত্তিকর অংশগুলি বর্জন করে 'স্কুল বুক কমিটি'-র অনুমোদন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কি তিনি 'স্কুল বুক কমিটি'-র বিরুদ্ধে এমন জোরালো আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন যে সরকার শেষ পর্যন্ত 'স্কুল বুক কমিটি' ভেঙে দেন। তারপর চন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার যে বর্ণনা নবীনচন্দ্র দিয়েছেন তা সমস্ত সাহিত্যিক শালীনতার বিরোধী; সৌজন্য বোধের সামান্য স্পর্শটুকুও তাতে নেই, সুতরাং তা আলোচনার অযোগ্য।

৬

ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকের পূর্বে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে নি। এমন কি বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ব্যাপ্তির কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়। ৮০-র দশকে বোম্বাই-এর 'ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর' পত্রিকার সম্পাদক পারসী সম্প্রদায়ভুক্ত বেহরাম জি. এম. মালাবারি (১৮৫৩-১৯২২) 'বাল্য-বিবাহ' (Child Marriage) ও 'বলব্যবস্থিত ব্রহ্মচর্য' (Enforced Widowhood) নামে দুটি 'পত্র' (নোটস্) প্রকাশ করেন ১৫ই আগষ্ট, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই 'পত্র' দুখানি ভারতীয় ও ব্রিটিশ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন লোকের কাছে পাঠানো হয়। বস্তুত পত্র দুখানি প্রচারের মধ্যে দিয়ে এতদিনের বিচ্ছিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ পেল[১০০] ('marked the beginning of the all India social reform movement')।

মালাবারি জাতীয় স্বাস্থ্যহানির কারণে বাল্য-বিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার

জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাদান ও সরকারি চাকরিতে নিয়োগের পক্ষে এই ভাবে বিবাহিত ব্যক্তিদের জন্য কয়েকটি বাধা আরোপ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মালাবারির বক্তব্য বাংলাদেশে সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয় নি। 'সোমপ্রকাশ' (৮ই পৌষ, ১২৯১) মন্তব্য করেছিল, 'বাল্য-বিবাহ আমাদিগকে ক্রমে শারীরিক ও মানসিক তেজোহীন করিয়া তুলিতেছে।' মালাবারি বাল্য-বিবাহের বিপক্ষে তাঁর আন্দোলনকে ধর্মযুদ্ধে পরিণত করেন এবং এই প্রচারকার্যে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন।

বাংলাদেশে উচ্চবর্ণের মধ্যে বিশেষত ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে রজোদর্শনের পূর্বে বালিকার বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট রীতি। ১৮৮১ সালের জনগণনায় দেখা গেছে বাংলাদেশে শতকরা ১৪ ভাগ দশমবর্ষীয়া হিন্দুবালিকা হয় বিবাহিতা না হয় বিধবা। বোম্বাই-এ এই অনুপাত ১০ ও মাদ্রাজে ৪·৫। বাল্য-বিবাহের সংখ্যা বেশি হলে সমাজে বিধবার সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা-ও পরিসংখ্যানে দেখা গেছে। মালাবারির অভিমতকে সেদিন অনেকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন এই কারণে যে, তিনি হিন্দুজাতির শক্তিহীনতার মূল কারণটি খুঁজে পেয়েছেন এবং জাতীয় উন্নতির সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন। মনীষী ম্যাক্সমূলর মালাবারিকে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং তিনি ভারতে শিশু-বিবাহ নিবারণের উপর জোর দিয়েছিলেন।[১০১] অনেকে আবার শারীরিক ক্ষমতার (biological fitness) উপরে শাস্ত্রীয় নির্দেশ ও আধ্যাত্মিকতার উপর জোর দিতে চান। সমাজসংস্কারক ভাণ্ডারকর ও রাণাডে মনে করেছিলেন মালাবারি হিন্দুর বাল্য-বিবাহের কুফলগুলি বাড়িয়ে বলছেন। বালিকার সঙ্গে বিবাহিতের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা বা চাকরির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা অনেকে সমর্থন করেন নি। কেননা, সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অভিভাবকরাই দায়ী, পাত্র নিজে নন।

মালাবারি এই আন্দোলনকে ইংলণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত করেন এবং ইংরেজ শাসককে হিন্দুবিবাহে কন্যার বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ করার পক্ষে আইন প্রণয়ন করার যৌক্তিকতা বোঝাতে সমর্থ হন। লোকমান্য তিলক হিন্দুর শাস্ত্রীয় পরিণয় প্রথার উপর বিদেশী সরকারের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অনেকগুলি জনসভায় বক্তৃতা দেন। এই সূত্রেই ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে তাঁর প্রবেশ ঘটে। বাংলাদেশের পত্র

পত্রিকাগুলি হিন্দুবিবাহ প্রথার উপর সরকারি হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অনেক সভা সমিতিতে বিষয়টি আলোচিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'পিতাপুত্র' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, চন্দ্রনাথ বসু এই সময় ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন (? ১৮৮৫)।[১০২]

এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন শোভাবাজারের রাজারা। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ক্যালকাটা মিশনারি কন্‌ফারেন্সে খ্রীষ্টধর্মী ও হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল জয়গোবিন্দ সোম হিন্দুর পরিণয় প্রথাকে প্রশংসা করে একটি 'পেপার' পাঠ করেন। একজন খ্রীষ্টধর্মীর মুখে হিন্দুর বিবাহপ্রথার প্রশংসা শুনে কলকাতার খ্রীষ্টান সমাজ সেদিন বিচলিত হয়েছিল। রেভাঃ ম্যাকডোনাল্ড জয়গোবিন্দ সোমের বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে হিন্দুবিবাহকে কটু মন্তব্যে বিদ্ধ করেন। ক্ষুব্ধ হিন্দু সমাজের পক্ষে শোভাবাজার রাজবাটিতে কুমার নীলকৃষ্ণ ও বিনয়কৃষ্ণ দেব একটি সভার আয়োজন করেন ৬ই আগষ্ট, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হয়েছিলেন সেকালের অগ্রণী বাঙালীরা। সে দিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও রাজবাড়ীর সুপ্রশস্ত হলঘরটি দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রখ্যাত ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। প্রথমে বক্তৃতা করেন জয়গোবিন্দ সোম। তিনি পুনরায় হিন্দুবিবাহের সমর্থনে বলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সভার তৃতীয় বক্তা চন্দ্রনাথ বসু। তিনি জোরের সঙ্গে বাল্য-বিবাহকে সমর্থন করেন, পাশ্চাত্যের স্বেচ্ছা-নির্বাচনের কুফল দেখান এবং হিন্দুর বিবাহ যে আত্মসুখের জন্য নয়, পরিবারের সকলের সুখের জন্য একথাও বলেন। তিনি বলেন নারীর বয়স্ক-বিবাহ হিন্দুর পরিবার প্রথা ও শাস্ত্র বিরোধী।

ইতোমধ্যে ৩৫ বয়স্ক স্বামী হরি মাইতির সঙ্গে সহবাসের ফলে ১০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী ফুলমণির মৃত্যুজনিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজের বিরোধী শক্তিগুলি সংগঠিত হয়। সরকার ১৮৮৯ সালের শেষ দিকে ১২ বৎসরের কম বয়স্কা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস নিষিদ্ধ করে একটি বিল আনেন (Age of Consent Bill)। হিন্দুর ধর্মীয় অধিকারের উপর এই হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বিলটির বিরোধিতা করেন কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেনামে 'এডুকেশন গেজেট'-এ (১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১)

বিলটির প্রতিবাদে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকা' (প্রতিদি যার ১৫০০ কপি বিক্রি হত) এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাল্য-বিবাহ সমর্থ করেছিল (২০শে জানুয়ারী ১৮৯১)। কিন্তু এই গণবিক্ষোভের নেতৃত্ব গ্রহ করেছিল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। শুধু কলকাতা শহরে নয়, 'বঙ্গবাসী' দূ গ্রামাঞ্চলেও সহবাস আইনের বিরুদ্ধে নতুন মত তৈরির কাজে এগিয়ে এসেছিল। এই ব্যাপ্ত গণআন্দোলনে চন্দ্রনাথ বসুর শুধু সহযোগিতা নয় সক্রিয় নেতৃত্ব ছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 'বঙ্গবাসী'-হিতৈষীরা সহবাস আইনের বিরুদ্ধে গড়ের মাঠে এক প্রতিবাদ সভা আহ্বান করেন।[১০৩] জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে এটিই ভারতের প্রথম বৃহৎ জনসভা; এমন কি পরবর্তী-কালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনও (১৯০৫) এর কাছে ম্লান।[১০৪]

শুধু গণবিক্ষোভ পরিচালনা নয়, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় 'ইংরেজের অসৎ অভিপ্রায়' উদ্ঘাটিত করে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে 'আমাদের অবস্থা' (২৮শে মার্চ, ১৮৯১), 'ইংরেজের প্রকট মূর্তি' ও 'অসভ্য হিন্দুর প্রথম ও প্রধান ধারণা', (১৩ই মে, ১৮৯১) 'পরিণাম কি' ও 'অসভ্যের পক্ষে অকপট নীতিই ভাল' (৩রা জুন, ১৮৯১) এই পাঁচটি প্রবন্ধের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার পর এটিই প্রথম রাজদ্রোহের মামলা। স্বভাবতই জনসাধারণ এই মামলায় উৎসুক হয়ে উঠেছিল।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডব্লিউ. সি. পেথেরম জুরির সহায়তায় এই মামলার বিচার আরম্ভ করেন ২৫শে আগষ্ট, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলে মিঃ পুগ, উডরফ ও ইভান্স সরকারের পক্ষে এবং মিঃ জ্যাকসন, এন. এন. ঘোষ, গ্রাহাম্, এস. পি. সিংহ 'বঙ্গবাসী'র পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন। এই মামলায় চন্দ্রনাথের একটি ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তখন তিনি বাংলা সরকারের অনুবাদকের পদে বৃত ছিলেন। সরকার পক্ষ থেকে তাঁকে অন্যতম সাক্ষীরূপে উপস্থিত করা হয়। তিনি সাক্ষ্যদানে অনিচ্ছুক ছিলেন।[১০৫] অবশ্য সরকারী চাপে তাঁকে আদালতে উপস্থিত হতে হয়েছিল এবং উপর্যুক্ত পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে ভাব, ভাষা ও ভঙ্গি বিচারে অন্তত দুটি যে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লিখিত, তা তিনি আদালতকে জানিয়েছিলেন।[১০৬]

স্বীকার করা ভাল, দেশের গণজীবন অপেক্ষা সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গেই চন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিল। জীবনের এই পর্বে দেশের একাধিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন এবং শিক্ষা সংস্কারে অগ্রণীর ভূমিকায় বার বার দেখা দিয়াছিলেন। ১২৮৯ (১৮৮২ খ্রী:) বঙ্গাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে একটি সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার নাম দেওয়া হয় 'সারস্বত সমাজ'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'কলিকাতার সারস্বত সম্মিলন' ('ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯) নামে এক প্রবন্ধ লিখে সারস্বত সমাজের উদ্দেশ্য, অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করেন। চন্দ্রনাথ প্রথমাবধি 'সারস্বত সমাজ'-এর উৎসাহী নেতা। ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্নে এলবার্ট হলে সারস্বত সমাজের একটি অধিবেশন হয়। সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এই সভায় সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গৃহীত হোক, সঞ্জীবচন্দ্রের আনীত এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন চন্দ্রনাথ এবং সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত সভায় আর যে সব প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করেছিল তাদের অন্যতম হল, ভূগোলের পরিভাষা স্থির করা হোক এবং 'তদ্বিষয়ে কি করা কর্তব্য তাহা অনুসন্ধানার্থ একটি সমিতি' গঠন করার প্রস্তাব হয়। সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।[১০৭] সারস্বত সমাজের এক শুভ পরিকল্পনার সঙ্গে চন্দ্রনাথ নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে কাজও কিছু হয়েছিল। কেননা দেখা যাচ্ছে ভৌগোলিক পরিভাষার একটি খসড়া সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। সারস্বত সমাজ অবশ্য দীর্ঘজীবী হয় নি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শৈশবকাল থেকেই চন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৭ই জুন, ১৮৯৪) যে ১০ জন বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন তাঁদের অন্যতম চন্দ্রনাথ বসু। বাকী ন'জন হলেন—রাজনারায়ণ বসু, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার মনিয়র উইলিয়ম, জন বীমস্‌, স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবরণ, ডব্লিউ. ডব্লিউ. হাণ্টার।[১০৮] ২৪শে চৈত্র, ১৩০১ বঙ্গাব্দে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে ১৩০২ বঙ্গাব্দের জন্য 'কর্মকারক' নির্বাচন হয়। পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত

চিত্র ২ : চন্দ্রনাথ বসুর বাংলা হস্তাক্ষর

হন, সভাপতি—রমেশচন্দ্র দত্ত, সহ সভাপতি—চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই উপলক্ষে পরের দিন মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়ীতে যে সম্মিলন হয় সেখানে অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে চন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন।

১৩০২ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি রমেশচন্দ্র দত্ত সরকারী কর্মসূত্রে উড়িষ্যা গমন করলে বাকী ছ'মাসের জন্য চন্দ্রনাথ অস্থায়ী সভাপতির ভার পেয়েছিলেন। পর বৎসর (১৩০৩) তিনি পরিষদের স্থায়ী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।[১০৯] চন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নানামুখী শিক্ষা চিন্তা করেছিল। ২৯শে আষাঢ়, ১৩০৩ বঙ্গাব্দের (১২ই জুলাই, ১৮৯৬) পরিষদের এক সভায় নবীনচন্দ্র সেনের প্রস্তাবক্রমে তৎকালীন শিক্ষা, পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা সংস্কার কামনা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরিষদের পক্ষে দুখানি আবেদন পত্র যথাক্রমে ডি. পি. আই ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠানো হয়েছিল (১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ ও মে, ১৮৯৭)।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা প্রচলনের চেষ্টারও সমর্থক চন্দ্রনাথ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সমাবর্তন ভাষণে মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে শুধু 'দেশাত্মচেতনা' নয়, সুদূর প্রসারী কল্পনাশক্তির পরিচয় দেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই সূত্র ধরে অগ্রসর হন এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফ্যাকাল্টি অব আর্টস'-এর সামনে একটি প্রস্তাব আনেন তাতে এফ. এ., বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় বাংলা, হিন্দী ও উর্দুর অন্তর্ভুক্তির কথা ছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আনীত প্রস্তাব যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বসুও ছিলেন। প্রস্তাবটি অবশ্য গৃহীত হয়নি।[১১০]

৭

চন্দ্রনাথ আদর্শ ও সুখী গৃহপতি ছিলেন। মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন, 'চন্দ্রনাথ প্রেমময় স্বামী ও স্নেহময় পিতা ছিলেন। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্যও ছিল আদর্শ স্থানীয়। তিনি অমায়িক, বিনয়ী, কর্তব্যপরায়ণ, স্বাধীনচিত্ত ও

ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন।'[১১১] এই উক্তির মধ্যে চন্দ্রনাথের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পড়ার সময় গোবরডাঙ্গা নিবাসী যজ্ঞেশ্বর ঘোষের প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র কন্যা-সন্তান মহালক্ষ্মী দাসীর সঙ্গে চন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। কন্যার বয়স ৯ বৎসর। যজ্ঞেশ্বর ঘোষ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন; তিনি কলকাতার রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ট্রীটে পাশাপাশি দুখানি বাড়ী কেনেন। তার মধ্যে ৫নং বাড়ীখানি মহালক্ষ্মীদেবী উত্তরাধিকার সূত্রে পান। চন্দ্রনাথ ঐ বাড়ীতেই বাস করতেন।[১১২] খুব শান্ত, নিস্তরঙ্গ ও ধীর লয়ে তাঁর জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল। মহালক্ষ্মী দেবী রূপবতী ছিলেন না; কিন্তু স্নেহে, প্রেমে ও শ্রদ্ধায় সেই মহীয়সী নারী চন্দ্রনাথের জীবনে গভীর শান্তি ও নিশ্চিন্ততা এনে দিয়েছিলেন। চন্দ্রনাথও স্ত্রী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ছিলেন। তাঁর মন্তব্য, 'বিধাতার কৃপায় আমার পত্নিভাগ্য অতুলনীয়।'[১১৩]

মহালক্ষ্মীর কোন জাগতিক কামনা ছিল না; স্বামী ও সংসারই তাঁর জগৎ। স্নেহে সেবায় নিজেকে তার প্রয়োজনে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার মধ্যে নিজের নারী জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। স্বামী যখন ঋণভারে পীড়িত, তখন তিনি নিজের সামান্য অলংকার স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে স্বামীকে ঋণমুক্ত ও গ্লানিমুক্ত করেন। চন্দ্রনাথের মতে তাঁর সুখী দাম্পত্যজীবনের চাবিকাঠি হল তাঁর বাল্য-বিবাহ। বালিকা বয়সে তিনি স্বামীর ঘরে এসেছিলেন বলে স্বামীর সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনার সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শাস্ত্রকারেরা বালিকাদের বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া সহধর্মিনী গড়িয়া লইবার সুবিধা হয়।'[১১৪] চন্দ্রনাথ বাল্য-বিবাহের উৎসাহী সমর্থক। এর উৎস তাঁর বাল্য-বিবাহজাত সুখী দাম্পত্যজীবন, শাস্ত্র নির্দেশ এখানে অপ্রধান হয়ে পড়েছিল।

চন্দ্রনাথের চার পুত্র—পরেশনাথ, হরনাথ, প্রকাশনাথ ও বংকু। তাঁর তিন কন্যার নাম—দুলু, বুলা ও নানু। এরা সকলেই পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সংসারের কাজে মনোযোগী। চন্দ্রনাথ পুত্র-কন্যাদের ভালবাসা, ভক্তি ও সেবায় চরিতার্থ ছিলেন। একজন গৃহস্বামীর কাম্য সুখ ও আনন্দ তিনি লাভ করেছিলেন। জীবন তাঁকে যেমন দু'হাত ভরে দান

করেছিল, তেমনি কেড়েও নিয়েছিল অনেক কিছু।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র পরেশনাথের মৃত্যু হয়। চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা ফুলবালা (ফুলু) ১৩১৫ বঙ্গাব্দে গতায়ু হন। সবশেষে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বংকু চন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে পরলোক যাত্রা করে। চন্দ্রনাথ নিজে তখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তাঁর দুরারোগ্য কার্বংকলে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, এই সময় প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুতেও 'তিনি বৈদান্তিকোচিত ধৈর্য ও গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন'।[১১৫] অবশেষে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও পরলোকের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৬ই আষাঢ়, সোমবার অপরাহ্ণ ৪ টায় (২০ জুন, ১৯১০) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

চন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ তাঁর মৃত্যু সংবাদ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১১৬] স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১১ই মার্চ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে চন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন :

By the death of Babu Chandra Nath Basu we have lost one of a small band of brilliant graduates—whose career in life has spread the reputation of this University far and wide. His contributions to the literature of Bengal are of abiding and perennial interest, and they will serve to hand his name down to posterity as that of one of the brightest products of English education in this country.[১১৭]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি চন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুতে শিবানন্দ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করে (৫ই ভাদ্র, ১৩১৭)। সেই সভায় অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র চন্দ্রনাথের জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা করে একটি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতাকালে একটি অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেন, 'তাঁহার জীবনী আলোচনা কেবল তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নহে, আমাদের শিক্ষার জন্যও দরকার।'[১১৮]

উল্লেখপঞ্জী

১। চন্দ্রনাথের 'সার্ভিস রেকর্ডস'-এ রয়েছে সেপ্টেম্বর ১৮৪৫; সম্ভবত এণ্ট্রান্স সার্টিফিকেটে বয়স ১ বৎসর কম দেখানো হয়েছিল।

২। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), কলিকাতা, ১৩১১ পৃ ৬৮১

৩। তদেব, পৃ ৬৮১, "ত্রিধারা" গ্রন্থভুক্ত 'বউ কথা কও' রচনায় চন্দ্রনাথ নিজ গ্রামের অন্তরঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন।

৪। তদেব, পৃ ৬৮১

৫। দ্র. উৎসর্গ পত্র, "হিন্দুত্ব"।

৬। চন্দ্রনাথ বসু, "পৃথিবীর সুখদুঃখ", কলিকাতা, ১৩১৩, পৃ ৫

৭। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৮৩

৮। বিপিনবিহারী গুপ্ত, "পুরাতন প্রসঙ্গ", বিশ্বভারতী সং, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ ২০০-২০১

৯। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৮৩

১০। বিপিনবিহারী গুপ্ত "পুরাতন প্রসঙ্গ" ১৩৭৩, পৃ ২০১

১১। যোগেশচন্দ্র বাগল, "কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র", কলিকাতা, ১৩৬৬ পৃ ৬২

১২। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৮৪

১৩। তদেব, পৃ ৬৮৫

১৪। তদেব, পৃ ৬৮৬

১৫। চন্দ্রনাথ বসু "পৃথিবীর সুখ দুঃখ", ১৩১৩

১৬। বিপিনবিহারী গুপ্ত "পুরাতন প্রসঙ্গ", ১৩৭৩, পৃ ৩২৮-২৯

১৭। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৯০

১৮। পরে ইনি নিজামের রাজ্যে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

১৯। "আইন-ই-আকবরী"র অনুবাদক, বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার সদস্য।

২০। চন্দ্রনাথ বসু "পৃথিবীর সুখ দুঃখ" ১৩১৩, পৃ ৪৫-৪৭

২১। B. B. Majumdar, *History of Political Thought from Rammohan to Dayananda*, Vol. I, Calcutta, 1934, p. 276

২২। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১ পৃ ৬৮৭

২৩। চন্দ্রনাথ বসু 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র', সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র", কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃ ১১৩

২৪। নবীনচন্দ্র সেন, "আমার জীবন" (২য় ভাগ), বসুমতী সং পৃ ১৮৬

২৫। বিপিনবিহারী গুপ্ত "পুরাতন প্রসঙ্গ", পৃ ২০০-১

২৬। *The Oriental Seminary Centenary Volume*, Calcutta, 1929, p. 26

২৭। চন্দ্রনাথ বসু "পৃথিবীর সুখ দুঃখ", ১৩১৩ পৃ ৬৬

২৮। তদেব, পৃ ৭৯

২৯। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৮৭

৩০। চন্দ্রনাথ বসু "পৃথিবীর সুখ দুঃখ", ১৩১৩, পৃ ৬৮

৩১। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" (উত্তর ভারত) কলিকাতা, ১৩২২, পৃ ৪৮১

৩২। 'রাজা বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 'বিদ্যাগুরু' উপাধি দিয়া সরস্বতী পূজার দিন যথারীতি অর্চনা করিতেন।' দ্রঃ তদেব, পৃ ৪৬৮

৩৩। "পৃথিবীর সুখ দুঃখ" ১৩১৩, পৃ ৬৯-৭০

৩৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত "সাহিত্য সাধক চরিতমালা"র (৮৩ সং) সালটি আছে ১৮৭১ ; আমরা সরকারি নথিপত্রে পেয়েছি ১৮৭৯। এটিই ঠিক, "সাহিত্য সাধক চরিতমালা"র সালটি ছাপার ভুল।

৩৫। মন্মথনাথ ঘোষ, 'চন্দ্রনাথ বসু', "ভারতবর্ষ" আষাঢ় ১৩৪৩, পৃ ৭৬

৩৬। "পৃথিবীর সুখ দুঃখ", ১৩১৩, পৃ ৭০

৩৭। তদেব, পৃ ৮০

৩৮। "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৮৯

৩৯। "পৃথিবীর সুখ দুঃখ", ১৩১৩, পৃ ৮০

৪০। এখানে উল্লেখ করা দরকার, চন্দ্রনাথও বহুমূত্র রোগে মারা যান।

৪১। "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৮৯

৪২। "পৃথিবীর সুখ দুঃখ" ১৩১৩, পৃ ৮৩

৪৩। তদেব, পৃ ৮৪-৮৫

৪৪। তদেব, পৃ ৮৫-৮৬

৪৫। তদেব, পৃ ৮৬

৪৬। তদেব, পৃ ৮৭

৪৭। *History of services of gazetted and other Officers serving under the Government of Bengal*, Part II, Corrected to 1st July, 1903, p. 435

৪৮। Preface, *An Essay on the Life and Character of Oliver Cromwell*

৪৯। মন্মথনাথ ঘোষ, 'চন্দ্রনাথ বসু' "ভারতবর্ষ" (আষাঢ়, ১৩৪৩), পৃ ৭৬

৫০। যোগেশচন্দ্র বাগল, "বাংলার নব্য সংস্কৃতি" ১৯৫৮, পৃ ৭৮

৫১। তদেব, পৃ ৭৮

৫২। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা', "প্রবাসী" (কার্তিক, ১৩৬২) পৃ ৬৮

৫৩। *Transaction of Bengal Social Science Association*, 1869, p. 1

৫৪। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা' "প্রবাসী" (পৌষ, ১৩৬২), পৃ ৩৪৫

৫৫। *Transaction of Bengal Social Science Association*, 1870, p. XXI-XXII

৫৬। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা' "প্রবাসী" (পৌষ, ১৩৬২), পৃ ৩৪৯।

৫৭। যোগেশচন্দ্র বাগল "বাংলার নব্য সংস্কৃতি", ১৯৫৮ পৃ ৫১

৫৮। *The Proceedings and Transaction of the Bethune Society, from November 10th 1859 to April 20th 1869*, Calcutta, 1870 p. CXXXVII

৫৯। মন্মথনাথ ঘোষ, 'চন্দ্রনাথ বসু' "ভারতবর্ষ" (আষাঢ় ১৩৪৩) পৃ ৭৬

৬০। তদেব, পৃ ৭৬

৬১। যোগেশচন্দ্র বাগল, "মুক্তির সন্ধানে ভারত" (পরিবর্ধিত নূতন সং) ১৩৭৯ পৃ ১০৫

৬১। **1. The creation of a strong body of public opinion in the**

country; 2. The unification of the Indian races and peoples upon the basis of common political interests and aspirations; 3. The promotion of friendly feeling between Hindus and Mohammedans; and, Lastly, the inclusion of the masses in the great public movements of the day.

S. N. Banerjee, *A Nation in Making*, Reset and Reprinted, London, 1963, p. 39

৬৩। J. C. Bagal, *History of Indian Association*, Calcutta, 1953, p. 13

৬৪। S. N. Banerjee, *A Nation in Making*, 1963. p. 41

৬৫। J. C. Bagal, *History of Indian Association*, 1953. p. 17

৬৬। যোগেশচন্দ্র বাগল "মুক্তির সন্ধানে ভারত", ১৩৭৯, পৃ ২৬৪

৬৭। দ্র. দেবীপদ ভট্টাচার্য, "রবীন্দ্রচর্যা", কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ ৪৪

৬৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্কিমচন্দ্র', "আধুনিক সাহিত্য"

৬৯। "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৯০

৭০। রাজনারায়ণ বসু, "আত্মচরিত" প্র-স, ১৩১৫ পৃ ২০৭

৭১। তদেব, পৃ ২০৭

৭২। চন্দ্রনাথ বসু 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র', "কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র" ১৯৬৪, পৃ ১১১-১২

৭৩। রবীন্দ্রনাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র', "জীবনস্মৃতি" ১৯৬২

৭৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র জীবনী" (১ম), পরিবর্ধিত সং ১৩৫৩, পৃ ৫৪

৭৫। রবীন্দ্রনাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র', "জীবনস্মৃতি", ১৯৬২

৭৬। 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র', "কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র", ১৯৬৪, পৃ ১১২

৭৭। *Calcutta Review*, 1879, No. 137, p. XIX-XX1V

৭৮। 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র', "কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র", ১৯৬৪, পৃ ১১৬

৭৯। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা', তদেব, পৃ ১০৩

৮০। চন্দ্রনাথ বসু 'বন্ধু বৎসল বঙ্কিমচন্দ্র', তদেব, পৃ ১১৬

৮১। "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৯০;

৮২। প্রবন্ধটি 'হরপ্রসাদ রচনাবলী'র ১ম খণ্ডে (১৩৬৩) সংকলিত হয়েছে।

৮৩। "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম),১৩১১, পৃ ৬৯০

৮৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'চন্দ্রনাথ বসু', "সাহিত্য সাধক চরিতমালা" (৮৩) দ্বি-সং, পৃ ২৯

৮৫। নবীনচন্দ্র সেন, "আমার জীবন" (২য় ভাগ) বসুমতী সং,পৃ ১৯০

৮৬। শশিভূষণ বিদ্যালংকার, "জীবনী কোষ" (৩য় খণ্ড), পৃ ৫৩১

৮৭। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, 'নিবেদন', "বঙ্গদর্শন" (বৈশাখ, ১৩০৮)

৮৮। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বঙ্কিমজীবনী" তৃ-সং (১৩৩৮ পৃ ৪৫৩)

৮৯। "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৯১

৯০। "প্রচার"-এ (শ্রাবণ, পৌষ ১২৯৩; বৈশাখ, চৈত্র ১২৯৫) প্রকাশিত হয়

৯১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়'

৯২। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র', "জীবনস্মৃতি" (১৯৬২)

৯৩। নবীনচন্দ্র একাধিকবার চন্দ্রনাথ বসুকে 'হিং টিং ছট্ বাবু' বলে উল্লেখ করেছেন; দ্র. "আমার জীবন"

৯৪। রমাপ্রসাদ চন্দ্র, 'গোড়ার কথা ও শেষের কবিতা', "মাসিক বসুমতী", অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯, পৃ ২৩৭

৯৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্রজীবনী" (১ম) পরিবর্ধিত নূতন সং, পৃ ১৮৯

৯৬। তদেব, পৃ ১৭২

৯৭। রমাপ্রসাদ চন্দ, "মাসিক বসুমতী", অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯, পৃ ২৩৭

৯৮। দেবীপদ ভট্টাচার্য, "রবীন্দ্রচর্চা", ১৯৭৩, পাদটীকা পৃ ৩২

৯৯। নবীনচন্দ্র সেন "আমার জীবন" (২য় ভাগ), পৃ ১৫৬

১০০। Heimsath. Charles, H, *Indian Nationalism and Hindu social reform*, Princeton, N. Y., 1964, p. 151

১০১। সম্পাদকীয়, "সোমপ্রকাশ" (১১ শ্রাবণ, ১২৯৩)

১০২। কালিদাস নাগ সম্পাদিত "অক্ষয় রচনা সম্ভার" (প্রথমার্ধ), ১৮৮৭ শকাব্দ, পৃ ১৬

১০৩। হারাধন দত্ত, "বঙ্গবাসী, কৃষ্ণচন্দ্র, দেশ ও কাল" ১৩৭২ পৃ ২২

১০৪। কালিদাস নাগ, "অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার পরিচিতি" ১৮৮৭ শকাব্দ পৃ ২৮

১০৫। Even an unwilling witness Babu Chandra Nath Basu, the Government Translator, had to admit that the people

were dissatisfied with the Government for its interferrence with their marriage laws. Syamananda Banerjee, *National awakening and the Bangabasi,* Calcutta, 1968, p. 155

১০৬। অজিতচন্দ্র সরকার, 'সমাজ ও পরিবার মধ্যে ঠাকুরদাদা', "অক্ষয় রচনাসম্ভার পরিচিতি", ১৮৮৭ শকাব্দ, পৃ ১০৪-৮

১০৭। মদনমোহন কুমার, "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস" (১ম), কলিকাতা, ১৩৮১, পৃ ২০৪

১০৮। তদেব, পৃ ১৪৫

১০৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত "সাহিত্য সাধক চরিতমালা" (৮৩), পৃ ১৮

১১০। *Hundred years of the University of Calcutta,* . Calcutta, 1957, p. 145-6

১১১। মন্মথনাথ ঘোষ, 'চন্দ্রনাথ বসু' "ভারতবর্ষ" (আষাঢ় ১৩৪৩), পৃ ৭৭

১১২। চন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনের অজ্ঞাত তথ্যগুলি সরবরাহ করেছেন চন্দ্রনাথের পৌত্রী শ্রীমতী অমিয়বালা মিত্র ও অধ্যাপক যামিনী মোহন কর।

১১৩। চন্দ্রনাথ বসু "পৃথিবীর সুখ দুঃখ" ১৩১৩, পৃ ৭২

১১৪। তদেব, পৃ ৭৪

১১৫। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, "পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু", কলিকাতা, ১৩১৭, পৃ ২৫

১১৬। *Amrita Bazar Patrika,* 20.6.1910

১১৭। *University of Calcutta Convocation Addresses,* Vol. IV, 1907-1914, Calcutta, 1914, p. 1182-83

১১৮। "পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু" গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত পরিষদের শোক প্রস্তাব।

চন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা

১.

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য 'কৃতবিদ্য' বাঙালীর মত চন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে ইংরেজি ভাষায় লিখতে শুরু করেন। এ সম্পর্কে তাঁর প্রাগুক্তি রয়েছে, 'ইংরাজীতে বেশী আকৃষ্ট হওয়ায় মনটা কতক ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছিল। ...তখন ইংরাজী লিখিয়া বড় সুখ হইত।'[১] ছাত্রজীবনে 'প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন' (?) ও স্বসম্পাদিত 'ক্যালকাটা য়ুনিভারসিটি ম্যাগাজিন'-এ ইংরেজিতে সাহিত্যালোচনা ও প্রবন্ধাদি লিখেছেন। যখন বি. এ. পাস করেন নি তখনই সুপ্রসিদ্ধ 'বেঙ্গলী' পত্রিকার নিয়মিত লেখক তিনি। এছাড়া 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' ও 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় চন্দ্রনাথের একাধিক লেখা বেরিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, ওই সময়ের প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ক্যালকাটা য়ুনিভারসিটি ম্যাগাজিনের কোন কপি পাওয়া যায় না। 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বাক্ষরবিহীন রচনাগুলি থেকে চন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট লেখাটি চিনে নেওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে ছাত্রজীবনে ইংরেজি রচনায় তাঁর দক্ষতার প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্যোত্তীর্ণ ইতিহাসের খ্যাতিমান ছাত্র চন্দ্রনাথ বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ মঞ্চে বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭), পরে তিনি তা 'থ্যাকার স্পিংক' থেকে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন (মূল্য বার আনা, এখনকার ৭৫ পয়সা)। বক্তৃতার শিরোনাম 'An Essay on the Life and Character of Oliver Cromwell' (১৮৬৭)। আমাদের পক্ষে এই অতি-দুষ্প্রাপ্য রচনাটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। চন্দ্রনাথ নিজের বক্তৃতার বিষয়বস্তু হিসাবে ইংলণ্ডের ইতিহাসের বিখ্যাত পুরুষ অলিভার ক্রমওয়েলের (১৫৯৯-১৬৫৮) জীবনী ও চরিত্রকে নির্বাচন করেছিলেন। এবং এই নির্বাচন তাৎপর্যশূন্য নয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার শুভ সংস্পর্শ আমাদের ইতিহাস-

চেতনাকে জাগিয়েছিল। শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাই প্রচুর ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, কিন্তু সে ইতিহাস প্রধানত পৃথিবীর ইতিহাস, বিশেষত ইংলণ্ডের ও রোমের। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-৯৪) 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (১৮৬২) 'রোমের ইতিহাস' (১৮৬৪), 'পুরাবৃত্তসার' (১৮৫৮) তার সাক্ষ্য। এই সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভারতের ইতিহাস চর্চাও শুরু হয়েছিল। এ বিষয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির (১৭৮৪) নানামুখী পরিকল্পনা ও কর্মপ্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সন্ধান সোসাইটির প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদেরা করেছিলেন। সোসাইটির গবেষণা ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্রতী হন। তা সত্ত্বেও জাতির অতীত ইতিহাসের প্রতি কৌতূহল, অতীত গৌরবের অনুসন্ধান ও তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রথম দেখেছিল 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২), এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) একটি জলন্ত দেশপ্রেমের সঙ্গে মিলিয়ে ভারত-ইতিহাসের পুনর্বিচার শুরু করেছিলেন কিন্তু তা চন্দ্রনাথের 'An Essay on the Life and Character of Oliver Cromwell' (১৮৬৭) বক্তৃতার পরবর্তীকালের ঘটনা।

ভারত-ইতিহাস নয়, ইংলণ্ডের ইতিহাস থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচিত হলেও তা তাৎপর্যবিহীন নয়, বরং তা লেখকের সজাগ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বিপ্লবের নায়ক অলিভার ক্রমওয়েল চিরপোষিত রাজতন্ত্র ও বহুকালব্যাপী সম্মানিত প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে antiquity ও authority-র মূলেই আঘাত করেছিলেন। ক্রমওয়েল-যুগের সেই ঝঞ্ঝা, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও বেদনা মহাকবি মিলটনের বর্ণিত 'স্যাটান' চরিত্রে আত্মগোপন করে আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশেও antiquity ও authority ভাঙার পর্ব শুরু হয়েছিল। সে যুগের যুবচিত্তের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহকে মহাকবি মধুসূদন প্রতিফলিত করলেন স্বর্ণলংকার সমুদ্রতীরে। ক্রমওয়েলের কাল অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিল চন্দ্রনাথের সজাগ মন। সুতরাং বিষয় নির্বাচনে তিনি যুগধর্মকে খণ্ডিত করেন নি।

অলিভার ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত পুরুষ এবং কিংবদন্তীর নায়ক। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, অসমসাহস ও বিদ্রোহচেতনাকে

অবলম্বন করে তিনি অতি সাধারণ অবস্থা থেকে ক্রমে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে রাজসিংহাসনের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। ক্রমওয়েল প্রভাবিত পার্লামেন্টের বিচারে প্রথম চার্লস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন (৩০শে জানুয়ারী, ১৬৪৯)। চার বৎসর পর পার্লামেন্টের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি লঙ্ পার্লামেন্টের ভগ্নাবশেষ ('র‍্যাম্প পার্লামেন্ট') ভেঙে দেন যদিও তিনি ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। অথচ, তিনি রাজার আসনে বসেন নি, ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর 'ইনস্ট্রুমেণ্ট অব গভর্ণমেণ্ট' নামক নতুন সংবিধান অনুসারে নিজেকে লর্ড প্রোটেকটর ঘোষণা করে ইংলণ্ডের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়েছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর পিউরিটান দৃষ্টিভঙ্গী সকল আদর্শের উপরে স্থান পেয়েছিল। বৈদেশিক বিষয়ে ও পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছিলেন।

ক্রমওয়েলের জীবনী ও চরিত্র নিয়ে এই আলোচনা প্রধানত 'অ্যাকাডেমিক' ও ইতিহাসজিজ্ঞাসু ছাত্রের হলেও তা তুচ্ছতায় অবনামত হয়নি এই কারণে যে, চন্দ্রনাথ ক্রমওয়েলের ধর্মীয় চেতনার ('religious fervor') বিকাশের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ইংলণ্ডের 'রয়ালিস্ট' ও 'অ্যারিস্টোক্রাট' ঐতিহাসিকদের চোখে ক্রমওয়েল হলেন 'hypocrit and knave'। কেননা তিনি দেশের রাজাকে হত্যা করেছিলেন এবং যুগপ্রচলিত সম্মানিত প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করেছিলেন। চরিত্রগত অনপনেয় কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে চন্দ্রনাথ সপ্তদশ শতকের এই মহোত্তম ব্যক্তিত্বকে ('greatest man of the 17th century') স্বর্ণপ্রভ মূর্তিতে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

ক্রমওয়েলের মনে বিশুদ্ধ ধর্মভাব জাগরণের ইতিহাস বর্ণনা লেখকের লক্ষ্য। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি নগরজীবনের বিলাস ত্যাগ করে গ্রামে বিধবা মাতার কাছে ফিরে আসেন। এই সময় তাঁর চিন্তা ও অনুভূতিতে গভীর পরিবর্তন আসে যা তাঁর রাজনৈতিক মহত্ত্বের গোপন সূত্র। যদিও রক্ষণশীল ঐতিহাসিকেরা তাঁকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতারক ('religious and political hypocracy') বলে নিন্দিত করেছেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, জীবনের এই পর্বে ক্রমওয়েল জাগতিক অহংকারের পরিবর্তে একটি মহোত্তম হতাশা ও বিষাদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং মানুষের শাশ্বত দুঃখবোধ

সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। যার ফলে তাঁর চরিত্রে একটি স্থায়ি পরিবর্তন এসেছিল। এই সময় তিনি কিছু কিছু অলৌকিক দৃশ্য দেখেন এবং তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে দিব্য-জীবনের প্রতি একটি মহৎ পিপাসা ('God-seeking soul')। এই সময় মিসেস সেণ্ট জনকে লেখা এক পত্রে ক্রমওয়েলের বিষাদমগ্নতা ও তা থেকে উত্তরণের সংবাদ পাই (পত্র তারিখ: ১৩ই অক্টোবর, ১৬৩৮)।

ক্রমওয়েলের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজভাবেই ঈশ্বরীয় প্রেমের বিকাশ হয়েছিল এবং এইভাবেই তিনি 'পিউরিটান' বা ধর্মীয় ব্যাপারে রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন। যাজকতন্ত্র প্রভাবিত পার্লামেণ্ট ভেঙে তিনি যে গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাকে বলা যায় 'Great Politico-religious Democracy'। তিনি ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে দেবতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটাতেই চেয়েছিলেন, 'to infuse into the Constitution of England a theocratic spirit' এবং তাঁর দৃষ্টি আরও বৃহৎ কিছু অন্বেষণ করেছে, 'to establish the reign of God and godliness on earth'।

সপ্তদশ শতকের এই বিতর্কিত এবং (কারও কারও মতে) ঘৃণিত মানুষটির চরিত্রের মূল উপাদান যে অলৌকিক ঐশ্বরিক অনুভূতিতে মাধুর্যময় ছিল চন্দ্রনাথ তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ক্রমওয়েলের রক্ষনশীলতা, প্রবল নীতিবাদ ও পিউরিটানিজমের মধ্যে লেখক আপন মনের সাযুজ্য অনুভব করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ক্রমওয়েলের জীবন ও চরিত্র থেকে একটি জীবন্ত নীতিও তিনি পেয়ে গেছেন:

> Do everything in the proper hour, and in the name of God and you will find success on earth and happiness in Heaven.

চন্দ্রনাথের ধর্মে বিশ্বাসী ও নীতিতত্ত্ব আবিষ্কারে আগ্রহী মূর্তিটি তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য ইংরেজি রচনার মধ্যেও অস্পষ্ট হয়ে থাকেনি।

২.

চন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা তাঁর লেখা চারটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম তিনটি প্রবন্ধ, 'What is the Best Practicable Method of Educating Hindu Women?', 'The Present System of Education in the

University of Calcutta' এবং 'Some University Matters' 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা'য় যথাক্রমে ৩০শে জানুয়ারী ১৮৬৮, ৩০শে মার্চ ১৮৬৮ ও ? ১৮৭২ তারিখে পঠিত হয় এবং প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধ উক্ত সভার ১৮৬৯ ও ১৮৭৩ সালের 'ট্রানজাকশন'-এ মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সম্ভবত মুদ্রিত হয়নি। চতুর্থ প্রবন্ধ, 'High Education in India' বেথুন সোসাইটিতে ২৫শে এপ্রিল ১৮৭৮ সালে পঠিত হয়েছিল। পরে ক্যানিং লাইব্রেরী থেকে পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে লেখক তা প্রকাশ করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে নব্য-বঙ্গে স্ত্রীজাতির জাগরণ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল কিন্তু শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ বিষয়ে এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সরকারি ঔদাসীন্য দূর হয়নি। লর্ড ক্যানিং চেয়েছিলেন, ব্যক্তিগত দানের ভিত্তিতে এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারিত হোক। তাঁর সময়ে সরকারি সাহায্য কেবল বালক বিদ্যালয়গুলির জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছিল।[২] উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে কেশবচন্দ্র সেনের অদম্য উৎসাহে এদেশে নারী শিক্ষার ব্যাপারটি প্রকৃত গতি লাভ করে। ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীজাতির উন্নতি সাধন এই সভার কার্যবিবরণীতে স্থান পেয়েছিল। এই সভার পরিপূরকরূপে 'বয়স্কা নারীগণের শিক্ষার্থে' গঠিত হয় 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা সভা'। উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ প্রগতিমনা ব্রাহ্ম যুবকেরা গঠন করেছিলেন 'বামাবোধিনী সভা' (১৮৬৩)। নারীগণের মানসিক উন্নতি বিধান, বয়স্কা নারী শিক্ষার আয়োজন প্রভৃতি নানাবিধ কাজ তাদের কার্যধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সভার মুখপত্র 'বামাবোধিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে।

ব্রাহ্ম সমাজের পাশাপাশি হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকেও স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রয়াস হয়েছিল। প্রথমে প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষা ও পরে বয়স্কা নারী-শিক্ষা বিস্তারে 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' (এপ্রিল, ১৮৬৪) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[৩] মিস কার্পেণ্টার ও বিদ্যাসাগর এদের কার্যধারায় সন্তুষ্ট ছিলেন। সরকারের শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টে 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'র সপ্রশংস উল্লেখ আছে। চন্দ্রনাথ উত্তরপাড়া হিতকরী সভার কার্যাবলীর প্রশংসা করেছেন।[৪] ব্রাহ্ম ও হিন্দু সমাজের মত আর্যসমাজও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহাকন্যা বিদ্যালয় জাতীয় নারী

শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন।

এই পর্বে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে স্মরণযোগ্য প্রয়াস করেছিল 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা' (১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৬৬)। এই সভার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সভার শিক্ষা শাখার অন্যতম সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু লেখেন, **'What is the Best Practicable Method of Educating Hindu Women ?'**

প্রবন্ধের শুরুতে, হিন্দু সমাজের প্রচলিত ধারণা যে, শিক্ষার প্রভাব নারীর চরিত্রহানির, সামাজিক অশুচিতা ও পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়, এই জাতীয় রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি জাতীয়ভাবের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার পক্ষপাতী। অন্যদিকে আমাদের নারীরা শিক্ষিত হলে আমাদের সংকীর্ণ সংসার-সীমায় যে স্বর্গের সুষমা দেখা দেবে এমন কথা আবেগকম্পিত কণ্ঠে চন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন:

> **Blessings of education enliven each Hindu home and render it a sort of little earthly paradise in which the genius of wisdom, animating the soul of the lovely girl, will be like that heavenly messenger in the bowers of Eden, who charmed Adam with the exquisite music of her speech and ravished his soul with high divine philosophy.'**

আলোচ্য প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজের দুর্মর রক্ষণশীলতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে দেশের নারী শিক্ষা বিস্তারে কতগুলি গঠনমূলক ও বাস্তব প্রস্তাব (**'practical method'**) উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রথমত, আমাদের গ্রাম্য পাঠশালার পুরাতন 'সর্দার পোড়ো'-পদ্ধতি (**'monitarial system'**) আধুনিক নারী শিক্ষার ব্যাপারেও গ্রহণ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে প্রথমেই কিছু নির্বাচিত ছাত্রীকে শিক্ষিত করে তোলা হবে, যারা পরে ব্যাপক স্ত্রীশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়ত, নারী শিক্ষার বিরোধীরা ভয় পান এই ভেবে যে একই বিদ্যালয়ে সর্বজাতির শিক্ষার্থিনীরা সমবেত হবার ফলে আমাদের প্রাচীন জাতিবিন্যাস ভেঙে পড়বে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। চন্দ্রনাথের প্রস্তাব, **'there should be gradation of schools corresponding to the gradation of**

castes'। ভিন্ন বর্ণের ছাত্রীর জন্য ভিন্ন বিদ্যালয় চেয়েছেন লেখক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন কিছু লোকের জাত্যভিমানকে তুষ্ট করার জন্য প্রথম কিছুদিন এই ব্যবস্থা চালু হোক। পরে আপনা থেকেই এই ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। তৃতীয়ত. দেশের জনস্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রসারে ('promotion of public health and industry') নারীদের সহায়তা আবশ্যক। সে জন্যও তাদের দ্রুত শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। এই শিক্ষাকে আকর্ষনীয় করতে হলে তাপ, বিদ্যুৎ, আলো প্রভৃতি সহজ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সহজবোধ্য করে ও মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে। দরকার মত হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে। বস্তুত দেশের স্ত্রীশিক্ষায় চন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি চান। বিজ্ঞানশিক্ষা দেশীয় নারীদের মন থেকে যুগপ্রাচীন কুসংস্কারগুলি দূর করবে।

অন্তঃপুরে বন্দিনী বিবাহিতা নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা কি হবে চন্দ্রনাথ সে সম্পর্কেও বাস্তবপন্থা নির্দেশ করেছেন। তিনি বিবাহিতা নারীদের জন্য sectional family school গঠনের প্রস্তাব করেছেন। এই ব্যবস্থায় সমগ্র শহরকে এমনভাবে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে যাতে প্রত্যেক ভাগে ২০ থেকে ৩০টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি প্রতি পরিবারে গড়ে ৩ জন শিক্ষার্থিনী থাকেন তাহলে প্রতি ভাগে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়াবে ৬০ থেকে ৯০। এরা তাদের নির্দিষ্ট বিভাগের কোন সম্রান্ত ও উদার ভদ্রলোকের বা সমাজসেবীর গৃহে একত্রিত হয়ে শিক্ষা লাভ করবে। 'মনিটারিয়াল'-পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলারা (প্রয়োজনে য়োরোপীয় শিক্ষিকা) এইবার তাদের শিক্ষার ভার নেবে। ক্রমে এই পদ্ধতি গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। যেহেতু শহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে মানুষের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ সহযোগিতার মনোভাব বেশি, সেই কারণে এই পদ্ধতি সেখানে সহজেই কার্যকর হতে পারবে।

এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার জন্য সরকার হালকা ধরণের শিক্ষাকর বসাতে পারেন। কিন্তু সে কর বাধ্যতামূলক হবে না, অনেকটা দান গ্রহণের মত হবে। চন্দ্রনাথের নারীশিক্ষা পরিকল্পনার এটাই হল রেখাচিত্র। লেখকের মতে যদি এই পরিকল্পনা কার্যকর হয় তবে '(It) will make the ladies of Bengal the 'ministering angels' of our homes.'

মেকলে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'মিনিটে' (১৮৩৫) ভারতবর্ষের শিক্ষা পরিকল্পনায় filtration theory বা অভিসেচন তত্ত্বের প্রয়োগ চেয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ শাসক রাজনৈতিক কারণে তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির ভ্রান্তি বুঝেছিল। ভারতের মেধাবী ছাত্ররা ক্রমে অধিক সংখ্যায় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে থাকেন। এই ঘটনায় শাসক সম্প্রদায়ের টনক নড়ে এবং তাঁরা শাসন কর্তৃত্ব স্বহস্তে অটুট রাখার প্রয়োজনে উচ্চশিক্ষার মূলে আঘাত করতে অগ্রসর হন। ব্যয় বাহুল্যের অজুহাতে শিক্ষা সংকোচের নীতি গৃহীত হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। সরকারের উচ্চশিক্ষা সংকোচনের নীতির প্রতিবাদ করেছিল 'ভারতবর্ষীয় সভা'। চন্দ্রনাথ বসু 'ভারতবর্ষীয় সভা'র অন্যতম উদ্যোক্তা এবং তিনি এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় (২রা জুলাই ১৮৭০) বক্তৃতাও করেছিলেন।

চন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষা সংকোচনের সরকারি নীতি ও যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করে 'বেথুন সোসাইটি'তে 'High Education in India' শীর্ষক একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন (২৫শে এপ্রিল ১৮৭৮)।

এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসন ইতিহাসের একটি মহোত্তম ঘটনা—গুরুত্বপূর্ণ, বিস্ময়কর ও অপ্রতিম। রেলপথ স্থাপন, সেতু নির্মাণ প্রভৃতি কাজের দ্বারা জড়জগতের ওপর আধিপত্য বিস্তারের অসীম শক্তির জন্য নয়, ইংরেজ যদি আধ্যাত্মিক শক্তির কিছু পরিচয় দিতে পারে তবে তা-ই হবে এ দেশে তাদের চিরস্থায়ী অবদান। অথচ ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের বিরুদ্ধে একটি জোরালো দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

ভারতে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের বিরুদ্ধবাদীদের চন্দ্রনাথ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: (ক) যাঁরা মনে করেন অতীতের সুমহান ঐতিহ্যে পূর্ণ ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে য়োরোপীয় সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটানো অর্থহীন; (খ) যাঁরা মনে করেন, দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে ব্যয়বহুল ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ একটি বিলাস মাত্র; (গ) যাঁরা মনে করেন, ব্রিটিশ রাজত্ব সুরক্ষিত করার জন্য ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার অপ্রয়োজনীয়। কারণ, উচ্চশিক্ষা রাজনৈতিক অসন্তোষের জন্ম দেয় এবং

(খ) যাঁরা মনে করেন, ইংরেজি শিক্ষার প্রকৃতি অগভীর এবং তা প্রয়োজনানুগ নয়।

প্রথম ভাগের বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যে সারবত্তা বিশেষ নেই। বিলাতে তখন শোনা যাচ্ছিল, '‘British Raj’ in India is a grave philosophical mistake'। এঁদের বক্তব্যে সেই কথারই প্রতিধ্বনি। এই মতবাদ আরো গুরুত্বহীন এই কারণে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন একটি সুকঠিন সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয় ভাগের বিরুদ্ধবাদীরাই সংখ্যায় বেশি এবং তাদের মূল বক্তব্য ইংরেজি শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করে সমগ্র ভারতবাসী অথচ তার ফল ভোগ করে শহরের মুষ্টিমেয় ধনিক সন্তান। এখন দেখা প্রয়োজন, এঁদের বক্তব্যের সারবত্তা কতখানি? বাংলার শিক্ষা-অধিকর্তার প্রদত্ত ১৮৭৬-৭৭ সালের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে চন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, শিক্ষাখাতে ব্যয়ের একটি বিরাট অংশ আসে ছাত্র বেতন, জরিমানা ও ছাত্রদের দেয় চাঁদা থেকে এবং তা যোগায় উচ্চশিক্ষা লাভেচ্ছু ছাত্রদের অভিভাবকেরা। এঁরা যদিও মধ্য-আয় বিশিষ্ট; কিন্তু এঁরাই প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধাপরায়ণ, বুদ্ধিমান অথচ সংসারের দুর্ভার বহন করতে হয় বলে তাঁরাও দরিদ্র। সুতরাং শিক্ষাখাতে সামান্য সরকারি অনুদান অপাত্রে পড়ে না।

তাছাড়া উচ্চশিক্ষার ফল থেকে দরিদ্র নিরক্ষর ভারতবাসী প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত হচ্ছে না। একজন শ্রমিক বা কৃষক হয়ত মিলটন বা শেক্‌সপীয়রের মহৎ সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে উদাসীন, বিজ্ঞানের রকমারি গবেষণা হয়ত তার কাছে আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনহীন কিন্তু সেও চায় সৎ ও যোগ্য উকিল, ডাক্তার বা অফিসার। সুতরাং উচ্চশিক্ষার পরোক্ষ ফলভাগী সেও। উচ্চশিক্ষা একটি বিলাসমাত্র এবং অধিকাংশ বিলাস দ্রব্যের মতই তা অনিষ্টকর, এ জাতীয় মতও প্রতিবাদযোগ্য। কারণ আমরা বিস্মৃত হই যে, অতীতে হিন্দুরা মননসাধনা ও বিদ্যাচর্চায় সুউচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। এমন কি মুসলমান বিজয়ের পরও যে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব অবসিত হয়নি, সে কেবল একনিষ্ঠ বিদ্যাচর্চার জন্যই। সুতরাং শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা বিলাস নয়, বরং তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার

প্রয়োজনেই আজ ইংরেজিবিদ্যা শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি—'that is certainly an imperative necessity without which existence is impossible.'

তৃতীয় ভাগের বিরুদ্ধবাদীদের মতে, উচ্চশিক্ষা রাজনৈতিক বিপদের সূচনা করে। এঁদের মতে, 'education and disloyalty run in parallel lines and there is no disloyalty where there is no education.' চন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, যেখানে শিক্ষা নেই, সেখানে অবিশ্বস্ততা নেই একথা ঠিক নয়, বরং এর বিপরীতই সত্য। শিক্ষিত কলকাতাবাসী সরকারের 'লাইসেন্স ট্যাক্সে'র মৌখিক বিরোধিতা করেছে মাত্র, কিন্তু সুরাটের অশিক্ষিত ব্যবসায়ীরা প্রত্যক্ষ দাঙ্গার মত করেছিল। কলকাতার সংবাদপত্রগুলি কখনও কখনও সরকারের সমালোচনা করে বটে কিন্তু তার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা নয়, ইংরেজের চরিত্র সংশোধন।

চতুর্থ ভাগের বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে লেখক একমত যে, আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এক্ষেত্রে ভারতে উচ্চশিক্ষাকে বাস্তবমুখী ও প্রয়োজনভিত্তিক করে তুলতে হবে। ভারতের যুগপ্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্যা আছে। দর্শন ও মনন চর্চায় আজও সে শ্রেষ্ঠ। ইংরাজ আজ বস্তুমুখী জীবনের মাঝখানে তাকে আহ্বান করে নিল। নতুন জীবনের উপযোগী হতে হলে আমাদের বিজ্ঞান বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। আমাদের বুদ্ধি ও মনন শক্তি আছে, সুতরাং বিজ্ঞান শিক্ষা করা অসম্ভব হবে না। সেই দিকে লক্ষ রেখেই আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হবে, এই ছিল চন্দ্রনাথের অভিমত। তিনি বলেছেন, 'Therefore, the study of science ought to occupy the largest and most important place in Indian intellectual education.'

তাহলেই ভারতের আত্মমুখী চিন্তা বিশ্বমুখী হয়ে উঠবে। লেখক জোর দিয়ে বলেছেন, আজ অথবা কাল য়োরোপের শিল্পবিদ্যা ('industrial arts') আমাদের গ্রহণ করতেই হবে এবং তার ভিত্তি হবে বিজ্ঞানবিদ্যা ('scientific knowledge')। সুতরাং আমাদের পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞান শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি চাই এবং চন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন, এটাই বর্তমানে আমাদের মত মহান জাতির 'great and glorious destiny.'

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চন্দ্রনাথ উত্তর জীবনে এর বিপরীত কথা বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, এদেশে ব্যাপক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন নেই। সীমিত ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান বিস্তার প্রয়োগ চেয়েছেন তিনি। ভারতকে বা 'হিন্দু'কে বাঁচতে হলে তাকে অধ্যাত্মবিদ্যাই চর্চা করতে হবে, এই জাতীয় কথা তাঁর মুখে বার বার শোনা গেছে।

'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা'র ৫ম বর্ষে চন্দ্রনাথ শিক্ষা-সংক্রান্ত যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন তা হল 'Some University Matters.' এই প্রবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার ও পরীক্ষা-পরিকল্পনা বিষয়ে কতগুলি গঠনমূলক প্রস্তাব আছে। শুধুমাত্র পরীক্ষা-পরিচালন নয়, উচ্চশিক্ষা বিস্তারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব সামান্য নয়। পাঠ্যসূচী তৈরি ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি ছাত্রদের মনে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি তার অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদনে বিশ্ববিদ্যালয় অমনোযোগী হলে বিশ্ববিদ্যালয় তার মুখ্য উদ্দেশ্য থেকেই বিচ্যুত হবে।[৫]

চন্দ্রনাথের পরিণত অর্থ নৈতিক চিন্তার ছাপ আছে ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর তিনটি প্রবন্ধে—'Thoughts on the Present Social and Economical Condition of Bengal and its Probable Future' (১৮৬৯), 'The Duke of Argyll on the Permanent Settlement of Bengal.' (১৮৭১) এবং 'Political Economy and the Famine in Bengal' (১৮৭৪)। প্রথম প্রবন্ধটি 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা'র 'অর্থনীতি ও বাণিজ্য' শাখায় পঠিত হয়ে (২১শে জানুয়ারী, ১৮৬৯) উক্ত সভার ১৮৬৯ সালের 'ট্রানজাকশন'-এ মুদ্রিত হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় এবং তৃতীয় প্রবন্ধটি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে লেখক প্রেসিডেন্সি প্রেস থেকে ছাপিয়ে তা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন (মূল্য চার আনা)। সৌভাগ্যক্রমে এই দুষ্প্রাপ্য রচনাটি আমাদের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। লেখকের প্রগতি-শীল অর্থনৈতিক ভাবনার দিক থেকে প্রবন্ধগুলি মূল্যবান।

'Thoughts on the Present Social and Economical Condition

of Bengal'—নামিত প্রবন্ধটি নানাদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। কিঞ্চিদধিক ১০০শ বৎসর পূর্বে রচিত এই প্রবন্ধটিতে লেখক বাংলার কৃষিজীবী ও গ্রাম্য কারুজীবী সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার যে বিবরণ দিয়েছেন ও তার সমাধানের ইংগিত করেছেন বর্তমান কালেও তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

আমাদের দেশের রায়ত সম্প্রদায় প্রাগৈতিহাসিক পদ্ধতিতে চাষ করে, প্রাকৃতিক কারণেই তারা বিচ্ছিন্ন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত জমি চাষ করে। নিজেদের মূলধন না থাকায় সহজেই জমিদার ও লোভী মধ্যস্বত্বভোগীদের শিকারে পরিণত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী রিচার্ড টেম্পলের গ্রামে সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব চন্দ্রনাথের অভিনন্দন লাভ করেছে। কেননা, এই সব গ্রাম্য ব্যাঙ্ক থেকে কৃষিঋণ পাওয়া যাবে, কৃষকেরা মহাজনের কবল থেকে মুক্ত হবে এবং হয়ত পরিশ্রমলব্ধ ফসল বিক্রি করে কিছু কিছু সঞ্চয় করতে সক্ষম হবে। ক্রমে য়োরোপীয় উন্নত কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে এবং large scale farming-এর উপকারিতা বুঝে নরওয়ের peasant properties-এর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধন একত্রিত করে নিজেরা সমিতিবদ্ধ হবে। সরকারের পরিকল্পনা ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাকে স্বাগত জানিয়েও চন্দ্রনাথ বলেছেন, এইসব আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বে যা জরুরি তা হল কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার। এদেশের জমিদার-কৃষকের জটিল সম্পর্ক, জমির উপর কৃষকের স্বত্ব সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন ('ordinary principles of the law of tenancy') প্রভৃতি কারণেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাংলার কৃষি-অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন কাম্য তা ব্যাপক জনশিক্ষা ('exclusive system of popular education') ব্যতীত সম্ভব নয়।

গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাকে বিস্তীর্ণ করতে পারলে শুধু যে কৃষিজীবী সম্প্রদায় উপকৃত হবে তা নয়, গ্রামের তন্তুবায়, সূত্রধর, কর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি যারা বংশানুক্রমিকভাবে স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করে সেই কারুজীবী সম্প্রদায়ও উপকৃত হবে। বস্তুত এরাই বাংলার জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশ। এদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নও জড়িত। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার ফলে আমাদের কাছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বদ্ধ দুয়ার খুলে গেল বটে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের গ্রামীণ শিল্পগুলি শুধু

পিছু হটছে। ইংলণ্ড-ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেনে প্রকৃত লাভবান হচ্ছে ইংলণ্ডই। ইংলণ্ডের কলে প্রস্তুত কাপড়ের মূল্য বাংলার হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের মূল্য অপেক্ষা কম। এখন যদি এই অসম প্রতিযোগিতায় বাংলার বস্ত্রশিল্পকে দাঁড়াতে হয়, তাহলে য়োরোপীয় যন্ত্রবিদ্যাকে গ্রহণ করে আমাদের শিল্পে তার যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের একটি বাড়তি সুবিধা আছে। ইংলণ্ড বহু অর্থ ব্যয়ে বাইরে থেকে কাঁচামাল আমদানি করে, অপরপক্ষে ভারতের উর্বর মাটিতে প্রচুর কাঁচামাল উৎপন্ন হয়। স্বদেশের সুলভ কাঁচামাল ও সুলভ মজুরির শ্রমিকের সঙ্গে য়োরোপীয় উন্নত শিল্পবিদ্যা একত্রিত হলে আমাদের অর্থনীতিতে স্বর্ণযুগ সূচিত হওয়া অসম্ভব নয়।

বাংলায় শিল্পস্থাপন অন্য গুরুতর কারণেও জরুরি। আমাদের প্রাচীন জাতিবিন্যাস অনুসারে নিম্নবর্ণের এবং নিম্নবিত্তের মানুষেরা বিদ্যালাভের অধিকারী ছিল না। কিন্তু কলকাতা শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত ইংরেজি-বাংলা বিদ্যালয় ('Anglo-vernacular system of institution') স্থাপিত হওয়ায় ব্যাপক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে 'ইতর সাধারণ' না হলেও গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষক ও কারিগররা কিছুটা ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগ্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে ওকালতি বা ডাক্তারির মত learned profession গ্রহণ করবে, কিন্তু তাদের সংখ্যা কিছুতেই শতকরা ২ ভাগের বেশি হবে না। বাকীদের সম্পর্কে চন্দ্রনাথ অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করেছেন, 'the entire number of artizen boys who have received any amount of education are at present candidates for service, or, which is the same thing for admission into the well known *Keraneedom of Bengal.*'

গ্রামীণ স্বাধীন বৃত্তিজীবী ঘরের শিক্ষিত যুবকেরা কেরানীগিরির উমেদারি করবে এই কারণে যে, জাতিগত বৃত্তির সঙ্গে সামাজিক হীনমন্যতা জড়িয়ে থাকে। তাই কর্মকার, তন্তুবায়, স্বর্ণকার প্রভৃতি মানুষেরা শিক্ষাগ্রহণের পর জীবিকা হিসাবে কুলবৃত্তি গ্রহণ করবে না এবং কেরানীবৃত্তি গ্রহণের জন্য উৎসুক হবে, এটা স্বাভাবিক। ইংরেজ তার বাণিজ্যিক অফিসগুলিতে কেরানীকুল তৈরী করছে বটে কিন্তু সে চাকরির ক্ষেত্রও সংকীর্ণ। সুতরাং

শেষ পর্যন্ত দুঃসহ বেকারজীবনই তাদের নিয়তি হয়ে ওঠে।

বাংলার নিজস্ব শিল্পগুলির জনপ্রিয়তা হারাবার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, ইংরেজি-বাংলা বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত মানুষেরা উন্নত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়ায় বাংলার নিজস্ব শিল্পসামগ্রী অপেক্ষা য়োরোপের কলে প্রস্তুত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবিশিষ্ট দ্রব্যগুলি তাদের মন টানে। দ্বিতীয়ত, মান্ধাতার আমলের যন্ত্র দিয়ে তৈরি শিল্পদ্রব্যে সূক্ষ্ম শিল্পচেতনা দুর্লভ। এখন আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে কিভাবে আমাদের গ্রামীণ ও লোকশিল্পগুলিকে বাঁচানো যায়। কেননা, এখনও এগুলি বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সক্ষম। সুতরাং এর সঙ্গে য়োরোপীয় বিজ্ঞান ও উচ্চ কারিগরী বিদ্যার সংযোগ চাই। গ্রামীণ শিল্পগুলিতে যুগোচিত পরিবর্তন সাধন করতে পারলে দেশের সর্বস্তরের মানুষ কর্মে নিযুক্তির সুযোগ পাবে। সর্বোপরি দেশীয় লোকেরা অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পাবে। যে অর্থ অপ্রসূ ও অচল ('unproductive and idle') তা সচল ('circulating') হয়ে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করবে। বাংলায় ব্যাপক শিল্পোদ্যোগ দেখা দিলে বাংলার শ্রমশক্তি (যা সোনা ও রূপার চেয়েও দামী) সঠিকভাবে বিনিযুক্ত হবে। শ্রমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য বাড়বে। শিক্ষিত যুবকেরা স্বাধীনবৃত্তির দিকে ঝুঁকবে। এইভাবেই বিশ্বের শিল্পের বাজারে বাংলার শিল্প স্থান করে নেবে।

চন্দ্রনাথ বসু আলোচ্য প্রবন্ধে যে বাস্তব ও গঠনমূলক অর্থনৈতিক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন এবং বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বনিয়াদ সুদৃঢ় করার ব্যাপারে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা সেযুগে দুর্লভ। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি স্বনামখ্যাত মনীষীরা ছিলেন জাতীয়তাবাদের স্বপ্নদর্শী। রাজনারায়ণ পরিকল্পিত ও নবগোপাল মিত্র প্রবর্তিত 'হিন্দু বা চৈত্র মেলা'য় (১৮৬৭) স্বদেশী শিল্প গুরুত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় স্বদেশিয়ানার আবেগ যতখানি ছিল, বাস্তবদৃষ্টি ততখানি ছিল না। চন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম অর্থনীতিজ্ঞান ও সূচ্যগ্র বাস্তবদৃষ্টি অবলম্বন করে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। তাই বক্তব্য কোথাও আবেগে স্ফীত-ফেনিল হয়ে ওঠে নি। চন্দ্রনাথের লিখিত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটির মধ্যে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার শুনতে পেয়েছেন, 'the birth-cry of Swadeshism in Bengal'.[৬] বাংলার

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে চন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। সেই স্থান নির্দেশ করে ডঃ মজুমদার যা বলেছেন তা প্রাণধানযোগ্য—

> The importance of Chandra Nath Bose in the history of political thought of Bengal lies in the fact that he was the first to draw the attention of public to the necessity of encouraging Indian manufacturers.[৭]

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৫-১৯৩২) জাতীয়তাবোধ জাগরণের অন্যতম হোতা বলে চন্দ্রনাথ বসুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।[৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) কার্যকারিতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব চন্দ্রনাথ লিখিত 'Duke of Argyll on the Permanent Settlement of Bengal' (১৮৭১) প্রবন্ধে মোটামুটি সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্নওয়ালিসের লিখিত এক 'মিনিট' থেকে জানা যায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণায় দ্বারা কর্নওয়ালিস চেয়েছিলেন ইংলণ্ডের অভিজাত ভূস্বামীদের আদর্শে ভারতে একটি ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি করতে। কর্নওয়ালিসের প্রত্যাশা ছিল সম্পত্তির জাদু ও চিরস্থায়ী জমা মিলিত ভাবে উৎপাদিকা শক্তি রূপে কাজ করবে। ভারতীয় মূলধন জমির প্রতি আকৃষ্ট হবে, জমির মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে, কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন হবে এবং সব মিলিয়ে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। ভারতীয় জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের ফলে জাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ভারতে 'বাজার' সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ব্রিটিশ রাজের অনুগত এক বিশেষ প্রভাবশালী শ্রেণী উদ্ভূত হবে, যার রাজনৈতিক তাৎপর্যের কথাও কর্নওয়ালিস ভেবেছিলেন।

কর্নওয়ালিসের কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তাঁর প্রবর্তিত নীলাম আইনের ('সূর্যাস্ত আইন') বিধানে অনেক পুরাতন জমিদার বংশের অন্তর্ধান ঘটল। তাদের স্থানে এল কলকাতার বেনিয়ান-মুৎসুদ্দী সম্প্রদায়ের নব্য-ধনীরা যারা মূলত ছিল absentee। ফলে পত্তনীদার, দর পত্তনীদার, সে পত্তনীদার প্রভৃতি অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব ঘটল। এই উপজমিদারদের বহন করার বোঝাও কৃষকদের স্কন্ধে চাপল। বাংলায় দরিদ্র কৃষকের নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

মূল উদ্দেশ্যই এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। 'সোমপ্রকাশ' (৯ই মাঘ, ১২৭৮) মন্তব্য করেছিল, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অশ্বশালার বানর হইয়াছে।'

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই ব্রিটিশ শাসকদের মনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিরূপতা দেখা দেয়। সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমর্থন করতেন। শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) এবং দ্বিতীয়ার্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) রায়তদের দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন থেকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণগ্রাহী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমর্থন করতেন। 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; আমরা সমাজবিপ্লবের অনুমোদক নহি।' মধ্যবিত্ত-মানস সুলভ সমাজ-বিপ্লব ভীতি হয়ত অসঙ্গত ছিল না, তবে তার থেকেও বড় কারণ, সে যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকরি নির্ভর যে স্বচ্ছল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল তা অটুট থাক, এই ছিল কাম্য। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশের কৃষকদের যে 'কপাল ভেঙেছিল' তা লক্ষ করেছিলেন। বঙ্কিমের পূর্বেই ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ভুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮) ও কোমতপন্থী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধতা করেছিলেন এবং রায়তদের দুর্দশামোচনের চেষ্টা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও পাবনার কৃষক বিদ্রোহের (১৮৭৩) পূর্বে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে সচেতনতা দেখা যায় নি বললে অন্যায় হয় না। চন্দ্রনাথের আলোচ্য প্রবন্ধ এই ঘটনার পূর্বে রচিত (১৮৭১)। সুতরাং সমগ্র প্রবন্ধে কৃষকদের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষিত হয় নি। আইনের সূক্ষ্মবিচার প্রধান স্থান পেয়েছে।

লর্ড ডালহৌসী কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'নিয়োগাদি বিষয়ক আইন'-এর বলে এদেশের জমিদারদের উপর বিশেষ কর প্রস্তাব করেন। পরে শিক্ষা কর ও পথ কর ('education cess and road cess') নামেও দুটি কর প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণা পত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটারী ডিউক অব আর্গাইলের নিকট মীমাংসার জন্য প্রেরিত হয়। কাউন্সিলের ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন কর প্রস্তাবের অনুকূলে মত দেন। লর্ড আর্গাইল তাঁদের সঙ্গে একমত হয়ে প্রস্তাবিত শিক্ষা ও পথ কর প্রবর্তনে

সম্মতি দিলেন। শিক্ষিত বাঙালী-মধ্যবিত্ত শ্রেণী একে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বিরোধী মনে করেছিল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'for the purpose of considering a petetion to parliament against the imposition of land cess, as calculated to involve a breach of the permanent settlement'. ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রধানত বাংলাদেশের জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত হয় (১৮৫১)। এদের কর্মসূচীতে জমিদারী ও ভূমি-সংক্রান্ত আইনাদি পর্যালোচনা প্রাধান্য পেত। এই সভার মূল বক্তব্য হল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ এবং যেহেতু এই বন্দোবস্ত লর্ড কর্নওয়ালিসের ঘোষিত চুক্তি অনুসারে 'চিরস্থায়ী'; সুতরাং তার কোন পরিবর্তন ঘটানো চলবে না। 'সোমপ্রকাশ'.(১২ই বৈশাখ, ১২৭৮) লেখে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শিক্ষা ও রথ্যাকর এবং ব্রিটিশ জাতির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল বটে কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সীমিত। এঁদের অর্থনৈতিক চিন্তায় দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। চন্দ্রনাথ নিজে জমিদার-তালুকদার না হয়েও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর উৎসাহী সদস্য। তাঁর 'Duke of Argyll on the Permanent Settlement of Bengal' প্রবন্ধে অ্যাসোসিয়েশনের মতবাদ ধ্বনিত।

শিক্ষা ও পথকর প্রস্তাবের পক্ষে ডিউক অব আর্গাইলের প্রধান যুক্তি হল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সত্ত্বেও যখন জমিদাররা আয়কর দিচ্ছেন তখন প্রস্তাবিত কর দিবেন না কেন? বিশেষত without such cesses 'the material and intellectual progress of the country' can not be worked out. চন্দ্রনাথ ক্ষুরধার বিশ্লেষণের সাহায্যে আর্গাইলের যুক্তির অসারতা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে আয়কর এবং শিক্ষা বা পথকর একজাতীয় নয়। আয়কর একটি সাধারণ কর এবং কোন অর্থেই তা 'স্থানীয় কর' (local tax) নয়। সব প্রদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের উপরেই তা প্রযোজ্য কিন্তু শিক্ষা বা পথকর শ্রেণী বিশেষের উপর প্রযুক্ত কর এবং তার সাহায্যে ইচ্ছাকৃতভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে। জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের

দিকে তাকিয়ে লেখক যুক্তি সমাবেশ করেছেন। ফলে প্রবন্ধে সূচ্যগ্র ও শাণিত বুদ্ধির ছাপ থাকলেও বিচারে সাপেক্ষতা বর্জনা করতে পারেন নি। কর্নওয়ালিশের প্রতি অনুরাগও অস্পষ্ট নয়। লেখক তাঁকে পুনঃপুনঃ 'noble framer of permanent settlement' বলে উল্লেখ করেছেন।[৯]

চন্দ্রনাথ উভয় দেশের ভূমিস্বত্ব ও খাজনা-তত্ত্ব (doctrine of rent-charge) নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করে দেখিয়েছেন, ইংলণ্ডে ভূমির উপর সরকার ও জমিদারের যৌথ মালিকানা স্বীকৃত, কিন্তু আমাদের দেশে যিনি পুরুষানুক্রমে জমি ভোগদখল করেন তিনিই মালিক। মোগল সম্রাটগণও জমি থেকে জমিদারকে উৎখাত করেননি। বলা বাহুল্য, লেখকের যুক্তির অবতারণা নিখুঁত হলেও[১০] অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়। এই স্ববিরোধিতা উনবিংশ শতাব্দীর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অনেক মনীষীর মধ্যেই দেখা গেছে।

ক্যাম্বেলের শাসনকালে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে বঙ্গদেশের রাঢ়, উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ব-বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কুখ্যাত উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের (১৮৬৬) ও লক্ষাধিক লোকক্ষয়ের স্মৃতি তখনও মানুষের মনে জাগরূক ছিল। ১৮৭৩ সালের দুর্ভিক্ষে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, যার বাংলা নাম 'ভারতবর্ষীয় সভা' সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এই সভা উৎপাদিত শস্য, শস্যহানি ও প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রভৃতির পরিসংখ্যানসহ সরকারের নিকট একখানি স্মারকলিপি পাঠান। সেদিন 'ভারতবর্ষীয় সভা'র পক্ষে জমিদার ও অর্থবান মানুষেরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের গঠনমূলক কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।[১১] এই সভার উৎসাহী সদস্য চন্দ্রনাথ বসুর লিখিত প্রবন্ধ 'Political Economy and the Famine in Bengal' সভার মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ মুদ্রিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি 'ভারতবর্ষীয় সভা'র উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবান। এই প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ সরকার ও শস্য ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালীর অর্থনীতি চিন্তায় যে সব পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ্‌দের প্রভাব ছিল তাঁদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ, জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও হেনরি টমাস বাকল প্রধান। চন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে মিলের 'পলিটিক্যাল ইকনমি' গ্রন্থে বর্ণিত তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ও নিষ্ফলতা দেখিয়ে বলেছেন, 'Political

economy as a science of selfishness, can not solve all the problems of social life.' এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, প্রথম জীবনে বঙ্কিম মিলের দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরবর্তীকালে সে প্রভাব ত্যাগ করেছিলেন।[১২] চন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে বাকলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, 'পলিটিক্যাল ইকনমি' বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণযোগ্য; বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ প্রশ্নাতীত নয়। সুতরাং এখান থেকেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দুর্ভিক্ষের মত একটি বিরাট ও ব্যাপক বিষয় 'পলিটিক্যাল ইকনমি'র সাধারণ নিয়ম দিয়ে সমাধান করা যায় না।

দুর্ভিক্ষ কাকে বলে?

কোন নৈসর্গিক কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের হ্রাস হলে বা জনসাধারণের সমগ্র বা একটি অংশকে শস্য ব্যবসায়ীরা খাদ্য যোগাতে অসমর্থ হলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সাময়িক অস্বাভাবিক অবস্থা বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে ও তার উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থা চালু করে সমগ্রভাবে বা আংশিক ভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন, আমদানি করবে কে? খাদ্য ব্যবসায়ীরা না সরকার নিজে? 'পলিটিক্যাল ইকনমি'র প্রবক্তা এই কাজকে ব্যবসায়ীদের পবিত্র জন্মগত অধিকার বলে নির্দেশ করেছেন। অথচ, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলা-বিহারের ৬ কোটি ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন যোগানো যখন আবশ্যক হয়ে পড়েছে তখন ব্যবসায়ীরা তথাকথিত speculation-এ ব্যস্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে সরকারকেই অগ্রণী হয়ে খাদ্য আমদানি ও তার সুষ্ঠু বণ্টনের ভার নিতে হবে। ধরে নেওয়া গেল 'পলিটিক্যাল ইকনমি'র তত্ত্বানুসারে ব্যবসায়ীরাই খাদ্যশস্য আমদানি করলেন, কিন্তু অধিক লাভের আশায় তা প্রধানত ধনী-অধ্যুষিত অঞ্চলে বিক্রি হবে, কিন্তু দরিদ্র-প্রধান অঞ্চলে খাদ্য যোগাবে কে? চন্দ্রনাথের উত্তর, 'Government, the Government—none but the Government.'

খাদ্য বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা কি হবে তা নিয়েও চন্দ্রনাথ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে 'পলিটিক্যাল ইকনমি'র তত্ত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় কার্যকর হলেও দুর্ভিক্ষের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা যায়। সুতরাং খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে সরকারের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ নীতিশাস্ত্র সম্মত ('fair and legitimate')।

তাছাড়া সরকারই পারেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের উদ্বৃত্ত দেশ থেকে

খাদ্যশস্য আমদানি করে দুর্ভিক্ষ-কাতর মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় তিন মাসের খাদ্য মজুত করতে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ইংলণ্ড এ বিষয়ে নীরব। কেউ কেউ বলছেন, খাদ্যশস্য পরিবহণের মত জাহাজের অভাব ইংলণ্ডের নীরবতার কারণ। চন্দ্রনাথ বলেছেন, ব্রিটিশ নৌবাহিনী জগৎ বিখ্যাত—নৌযুদ্ধে তাঁরা বার বার ইতিহাস রচনা করেছেন। এখন বাংলার ক্ষুধার্ত জনগণের মুখে অন্ন যোগাতে যদি ইংলণ্ডের নৌবাহিনী এগিয়ে আসে তবে তার গৌরব-মুকুটে আর একটি পালক যুক্ত হবে। এবং সমগ্র বিশ্ব তাঁর এই নৈতিক বীরত্ব ('moral heroism') দেখে মুগ্ধ ও হতবাক হয়ে যাবে। বেশ বোঝা যায়, চন্দ্রনাথ ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। সে যুগের পক্ষে তা অস্বাভাবিক ছিল না। চন্দ্রনাথের আবেগাত্মক মন্তব্য,

> Let England but do this act, and she will find herself enthroned by the universal voice of mankind as the noblest and most fearless guardian of Humanity.

৪.

'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা'র 'ব্যবহারশাস্ত্র ও আইন ('Jurisprudence and law') শাখায় চন্দ্রনাথ বসু 'A Few Points connected with the Registration of Assurances' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন (?, ১৮৭০)। সভার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের 'ট্রানজাকশন'-এ তা মুদ্রিত হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল গ্রাজুয়েট চন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে রেজিষ্ট্রেশন আইন নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করেছেন।

১৮৬৪ সালের ১৬ আইনে এ দেশে স্থাবর সম্পত্তির রেজিষ্ট্রেশন বলবৎ হয় ও ১৮৬৬ সালের ২০ আইনে তা সংশোধিত হবার পর জনসাধারণের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশনের গুরুত্ব ও উপযোগিতা উপলব্ধ হয়েছে। আইন প্রণয়নের প্রাথমিক স্তরে আইন প্রণেতারা ১০০শ টাকার কম মূল্যের সম্পত্তির রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করেন নি। ফলে কেউ কেউ বেশি মূল্যের সম্পত্তি ১০০ শ টাকার কম মূল্যের বেশি সংখ্যক দলিল তৈরি করে সম্পত্তি লেনদেন করেছে এবং এই ভাবেই রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত বিধি পাশ কাটাবার চেষ্টা হয়েছে। যদিও এই প্রচেষ্টা ব্যাপক নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রেজিষ্ট্রেশন-

জেনারেল মিঃ বিভারলি তাঁর ১৮৬৮-৬৯ সালের রিপোর্টের ২১তম অনুচ্ছেদে যে কোন মূল্যের স্থাবর সম্পত্তিসহ সব রকম সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

একটি স্থায়ী ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে যে জটিলতা সৃষ্টি হবে চন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আইনের এবংবিধ সংশোধন মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। তিনি বলেছেন, এই আইন চালু হলে মানুষের সততার পরিবর্তে আইনই বেশি মূল্য পাবে; তাছাড়া আইনের বন্ধন খুব বেশি হলে মানুষ আইন ভাঙার বিভিন্ন রন্ধ্র পথ সন্ধান করবে এবং জীবন থেকে সততা, চরিত্রগুণ, সর্বোপরি পারস্পরিক বিশ্বাস (যার উপর ভারতীয় জীবন দাঁড়িয়ে আছে) ক্রমে বিলীন হয়ে যাবে। চন্দ্রনাথ এই কারণে আইনের নাগপাশ কিছু উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

চন্দ্রনাথ বসু ইংরেজিতে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সমালোচনা করেছিলেন। তিনি 'বেঙ্গল লাইব্রেরী'র লাইব্রেরিয়ানের পদে বৃত হন ৭ই অক্টোবর, ১৮৭৯ তারিখে এবং কিঞ্চিদধিক ৭ বৎসর তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। লাইব্রেরীর প্রধান হিসাবে প্রতি বৎসর বাংলা সরকারের কাছে তিনি ইংরেজিতে যে রিটার্ন পাঠাতেন তা গতানুগতিক গ্রন্থবিবরণ মাত্র ছিল না। তিনি রিপোর্টে পূর্বভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত এবং লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত প্রতিটি বইয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা যুক্ত করে দিতেন। এই ভাবে সমসাময়িক সাহিত্য সমালোচনার দুরূহতম কাজটি তিনি করেছিলেন। এই ধারা পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুসরণ করেছিলেন (১৮৮৬-৯৪)। তৎকালীন অধিকাংশ গ্রন্থকার ছিলেন চন্দ্রনাথের সুহৃদশ্রেণীর অন্তর্গত। সর্বোপরি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তখনকার সাহিত্যগুরু এবং তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ। তা সত্ত্বেও চন্দ্রনাথের সমালোচনায় কোথাও সাপেক্ষতা আসেনি, বরং ওই রিটার্নগুলি চন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম সমালোচনশক্তির পরিচায়ক। প্রমাণ স্বরূপ আমরা চন্দ্রনাথ বসুর স্বাক্ষরিত রিপোর্টগুলির মধ্য থেকে ১৮৮০ সালে সরকারের নিকট প্রেরিত রিটার্নের নির্বাচিত অংশ বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত করে দিলাম।

একই সঙ্গে তিনি প্রসিদ্ধ 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার 'Critical

notices' পর্যায়ে নিয়মিত বাংলা গ্রন্থ সমালোচনা শুরু করেন। কিন্তু স্বাক্ষর-বিহীন লেখাগুলি থেকে চন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনা খুঁজে পাওয়া আজ দুঃসাধ্য। তবে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্তত দুখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তকের সমালোচনা তিনি যে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। চন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন, 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ তাঁর লেখা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)-এর সমালোচনা পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৩] ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে আমরা জানতে পারি, ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধ'-এর 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর সমালোচক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু।[১৪]

চন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ইংরেজি সমালোচনা নানাকারণে মূল্যবান। উপন্যাসের রূপ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় চন্দ্রনাথ যে অনধিকারী ছিলেন না তার প্রমাণ পাই তাঁর প্রথম বাংলা লেখা, 'নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য' শীর্ষক ('বঙ্গদর্শন' বৈশাখ, ১২৮৭) প্রবন্ধে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর গঠনরীতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এর কাহিনীতে কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্য নেই, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী তীব্র গতিতে অশ্বের মত ছুটে চলেছে। এমন একটি ঘটনাও সন্নিবেশিত হয় নি যা বাস্তব জগতে ঘটে না। প্রধান দুটি নারী চরিত্র—রোহিনী ও ভ্রমরের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লেখকের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। চন্দ্রনাথের মতে, রোহিনী ও ভ্রমর বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স সৃষ্টির অনন্য উদাহরণ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যও বর্তমান। সমাজ রোহিনীকে কিছুই দেয়নি, তাই রোহিণীও সমাজকে কিছুই দিতে চায় না—সে সমাজ-বিদ্রোহিনী। ভ্রমরের মধ্যে রোমান্সের আর-এক রূপ। সে সমাজ ও পরিবারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। চন্দ্রনাথ আবেগপূর্ণ ভাষায় উভয় চরিত্রের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এই বলে,

> The romance of Rohini is grossly material ; the romance of Bhramar is sublimely spiritual. We read the former with more philosophic interest ; we read the latter with deep moral enthusiasm. We regard the former as a little Epicurean lyric ; we regard the latter as a great world-epic..

সাহিত্য থেকে সমাজতত্ত্ব নিষ্কাশনে সমালোচকের প্রবণতা এখানেও দেখা যায়। চন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে একটি জীবন্ত নীতি অনায়াসেই পেয়ে গেছেন, **'Society should therefore do all that it can do to prevent the formation of Rohinis......is, we think, the object of Krishna-kanter Will.'**

উক্ত সমালোচনায় কাহিনী গ্রন্থনে বঙ্কিমের অসামান্য সাফল্যও আলোচিত হয়েছে। চন্দ্রনাথের মতে এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বর্ণনা সাফল্যের তুঙ্গ স্পর্শ করেছে। বর্ণনাগুলি এমনই বর্ণময় যে, মনে হয়, লেখকের মধ্যে যথার্থ কবিত্বশক্তি বর্তমান। ঔপন্যাসিক হিসাবেই বঙ্কিমের প্রধান পরিচয়। চন্দ্রনাথ বঙ্কিমের এই পরিচয়কে অস্বীকার করে বলেছেন, বঙ্কিম প্রধানত কবি, কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর গঠন যেহেতু কাহিনীমূলক তাই গদ্য তার আদর্শ ভাষা। সেজন্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে অনায়াসে বলা যেতে পারে **'poems in prose.'**

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর এই সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল।

ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২) চন্দ্রনাথের মনের উপর গভীর ও চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যগুরু, কিন্তু তাঁর মনন দীক্ষা হয়েছিল ভূদেবের কাছে। বাল্যবিবাহের যৌক্তিকতা, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বিশ্বাসগুলির উৎস ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধ'। যদিও ভূদেবের মনস্বিতা ও মানসিক উদারতার চূড়া চন্দ্রনাথ স্পর্শ করতে পারেন নি, তবু তিনিই চন্দ্রনাথের 'পরমারাধ্য আচার্যদেব' এবং 'পারিবারিক প্রবন্ধ' তাঁর মতে **'a work of Hindu domestic philosophy.'**

ভূদেব যে আদর্শ হিন্দু পরিবারের স্বপ্ন দেখতেন, সে পরিবার পারস্পরিক স্নেহে প্রীতিতে ও শ্রদ্ধায় চিহ্নিত। তাকে ভূদেব নিজ পরিবার জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার জন্য চন্দ্রনাথ 'পারিবারিক প্রবন্ধ'কে বলেছেন **a remarkable autobiography.** সাহিত্য বিচারে চন্দ্রনাথের এই চকিত মন্তব্যগুলি যে উপলব্ধিতে গভীর তা বোঝা যায়।

চন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় তাঁর উত্তর জীবনে ইংরেজিতে লেখা তিনটি প্রবন্ধ পুস্তিকায় বিধৃত হয়ে আছে। তিনি আত্মকথায় জানিয়েছেন, 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮২) লিখিবার পর সরকারি কার্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরাজী লিখি নাই।'[১৫] অথচ, সরকারি কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পরই (১৯০৪) তিনি তিনটি প্রবন্ধ ইংরেজিতে লিখে প্রচার করেন। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের অবাস্তবতা দেখিয়ে তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় বাংলায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। পরে 'বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী' থেকে প্রবন্ধটি ছাপিয়ে 'পার্টিসন প্রহেলিকা' নামে প্রকাশ করেছিলেন (মূল্য দুই আনা)। এই অতি-দুষ্প্রাপ্য লেখাটি আমাদের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ইংরেজিভাষী জনগণ ও সরকারি ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রবন্ধটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে পুস্তিকাকারে ছাপিয়েছিলেন। নাম: 'The Partition Riddle'—based on the Bangabasi Newspaper. (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯)। বক্তব্যকে আরও ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত করার উদ্দেশ্যে তিনি এর একটি ৭ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট লেখেন 'The Partition Agitation' নামে (মূল্য সাত পেনি)। পুস্তিকায় লেখকের নাম ছিল না ; পরিবর্তে তিনি 'Explained by the writer of the Partition Riddle' শব্দগুলি বসিয়েছিলেন। উভয় পুস্তিকার প্রকাশ কাল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ। পরের বছর চন্দ্রনাথ লেখেন, 'England's Administration of India' (১৯০৭)। দুর্ভাগ্যবশত পুস্তিকাটি আমরা কোথাও দেখতে পাইনি।

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের সীমারেখা পুনর্বিন্যাসের অজুহাতে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ পরিকল্পিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমষ্টিকে কলকাতার রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা বিদেশী সরকারের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গের আদেশ ঘোষিত হয়। পরদিন ৮ই জুলাই 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা'র অধিবেশনে ভূপেন্দ্রনাথ বসু এই প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি করেন। বাঙালীর উদ্দীপ্ত স্বদেশ প্রেম সেদিন অবমানকর সরকারি প্রস্তাবের প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে। সে যুগের জাতীয় নেতাদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল রসুল, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ অনেকেই সেদিন স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেশ মাতৃকার চরণে গীতিমাল্যের অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। তিনি রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তন করে স্বদেশের অধিবাসীকে ভ্রাতৃত্বের ঐক্যবন্ধনে বেঁধে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে নতুন আবেগ সঞ্চার করেছিলেন।

উপর্যুক্ত জাতীয় বীরদের কম্বুকণ্ঠ প্রতিবাদের সঙ্গে বর্ষীয়ান চন্দ্রনাথ বসুও তাঁর অনুচ্চ কণ্ঠ যুক্ত করেছিলেন। এই সময়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পত্রাবলীতে আবেগপ্রাধান্য ছিল স্বাভাবিক। চন্দ্রনাথ কিন্তু আবেগহীন ভাষায় তীক্ষ্ণ যুক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে ও পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের শূন্যগর্ভতা ও অসারতা প্রতিপাদনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই কারণে ঐ সময়ের অজস্র রচনার ভিড়ে চন্দ্রনাথের বক্তব্য হারিয়ে যাবার নয়।

এখন চন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ ধারা অনুসরণ করা যেতে পারে -

লর্ড কার্জন 'বঙ্গভঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। কারণ, বাংলাকে পোলাণ্ডের মত বিভাজন করা হচ্ছে না। কার্জন বোঝাতে চেয়েছেন, বাংলার জন্য কেবল এক প্রস্থ রাজকর্মচারীর বদলে দুপ্রস্থ কর্মচারী, দুটি স্বতন্ত্র তহবিল ও দুভাগের জন্য দুজন ছোটলাট নিযুক্ত করা হচ্ছে মাত্র। চন্দ্রনাথের মতে, সাধারণ দৃষ্টিতে 'বঙ্গবিভাগ' ব্যাপারটি তাই একটা প্রহেলিকার মত রহস্যময়। আমাদের দেশে যৌথ পরিবার প্রায়ই বিভক্ত হয়, সুতরাং 'বিভাগ' বলতে কি বোঝায় তা আমরা জানি। সরকারি ব্যক্তিরা যা-ই বলুন না কেন, আমরা জানি এ 'বিভাগ'ই।

এই বিভাগ প্রয়োজন হল কেন তার সপক্ষে সরকার তিনটি প্রধান কারণ দেখিয়েছেন—(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ; (২) বঙ্গরাজ্যের বিস্তার ও (৩) জনসংযোগের অসুবিধা। চন্দ্রনাথ 'The Partition Riddle' পুস্তিকায় এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত আলোচনাকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন এবং দেখিয়েছেন সরকারপক্ষের প্রদত্ত তিনটি কারণই ভিত্তিহীন, অবাস্তব ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত।

গভর্ণমেণ্ট বলছেন যে, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে একজন শাসনকর্তার পক্ষে তার শাসনকার্য সুচারুরূপে সম্পাদিত

করা সম্ভব নয়। চন্দ্রনাথের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকারের দুটি বিভাগের কাজ বাড়ে, ডাকবিভাগের (বেশি লোককে চিঠি বিলি করতে হয় বলে) এবং পুলিশ বিভাগের (বেশি লোকের প্রতি নজর রাখতে হয় বলে)। এদের মধ্যে ডাক বিভাগ ভারত সরকারের সংস্থা, বঙ্গের গভর্নরের সেখানে কোন দায়িত্ব নেই। এ ছাড়া আদালতের কাজ বাড়ে, ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেশি সংখ্যায় স্কুল ও কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেক্রেটারি পদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত সেক্রেটারি নিয়োগ করে সহজেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। তা সত্ত্বেও যখন বার বার বলা হচ্ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সুশাসনের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে তখন বুঝতে হবে শাসনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে চলেছে এবং এখন তা হবে 'autocratic in spirit and idea'.

রাজ্যের বিস্তৃতির প্রশ্নটি আরও অগভীর। ইংরেজ শাসনে দূর ও নিকটের প্রভেদ বিশেষ নেই। রাজধানীর ২০০ মাইল বা ২ মাইল দূরে যেখানেই ঘটনা ঘটুক না কেন তদন্তের প্রণালী একই। সুতরাং দূরত্ব ও নিকটত্বের প্রশ্নটি অবান্তর। দূরত্ব যদি সুশাসনের অন্তরায় হয় তাহলে প্রশ্ন করা যেতে পারে কলকাতা থেকে ময়মনসিংহ অপেক্ষা উড়িষ্যা দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও সুশাসিত হল কি করে? বস্তুত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে রাজধানী থেকে দূরত্ব-নিকটত্বের কোনও সম্বন্ধ নেই। স্থানীয় রাজকর্মচারীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার উপর তা নির্ভরশীল। জনসংযোগের প্রশ্নটিও অনুরূপভাবে ভিত্তিহীন। ইংরেজ জাতি তাদের বর্ণগর্বে দেশীয় কৃষক, কর্মকার, স্বর্ণকার, তন্তুবায় প্রভৃতি স্বাধীনবৃত্তিজীবিদের সঙ্গে মিশবেন এমন আশা করা যায় না। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মাঝে মাঝে গ্রাম পরিভ্রমণ করেন বটে কিন্তু তাঁরা গ্রামের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে পশু শিকার ও আমোদ-প্রমোদ করে চলে আসেন। গ্রাম্যলোকের অভাব অভিযোগ তাঁদের কর্ণে পৌঁছয় না। বর্ণের আভিজাত্যই যেখানে প্রতিবন্ধক সেখানে বঙ্গবিভাগ দ্বারা মনের পরিবর্তন অসম্ভব। চন্দ্রনাথ তিক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'Partition will not work the miracle of the Englishman in India in love with the coloured men'.

সরকার পক্ষের আর একটি যুক্তি হল, বঙ্গবিভাগ দ্বারা উন্নত প্রশাসন প্রবর্তন বাঙালীর ধনবৃদ্ধির ('increase of wealth') সহায়ক হবে। কিন্তু

বাংলার হিন্দুমুসলমান প্রজার অদৃষ্ট এমনই যে তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ধনবৃদ্ধি হবে ইংরেজ চা ব্যবসায়ী ও বণিকদের।[১৩] কলকাতার পরিবর্তে চট্টগ্রামে বন্দর স্থাপিত হলে তা তাদের স্বল্প ভাড়ায় চা রপ্তানীর সহায়ক হবে এবং তাদের ধনভাণ্ডার ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠবে। চট্টগ্রামের বন্দরের জেটি, পন্টুন, ক্রেন ও পণ্যাগারে দেশীয় লোক চাকরি পেলে তারা দুটো পয়সা হাতে পাবে সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মদে জুয়ায় অমিতাচারে তারা সে পয়সা ব্যয় করে ফেলবে। সুতরাং বাঙালীর জাতীয় ধনবৃদ্ধি সরকারের কাম্য নয়, ইংরেজ 'সিবিলিয়ান' ও ইংরেজ বণিকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখেই 'পার্টিশন্' প্রস্তাব করা হয়েছে।

চন্দ্রনাথের 'Partition Riddle' পুস্তিকার বক্তব্য সমসাময়িককালে প্রশংসিত হয়েছিল। তাতে উৎসাহিত হয়ে এবং নিজের বক্তব্য বিশদ করার উদ্দেশ্যে চন্দ্রনাথ আর একটি ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকা লেখেন, 'The 'Partition Agitation' নামে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে কয়েকজন উদারমনা ও নিরপেক্ষ ইংরেজ কতগুলি প্রশ্ন তুলেছিলেন, লেখকের বর্তমান পুস্তিকায় তাদের উত্তর দেবার চেষ্টা আছে।

প্রথমত, গভর্নমেণ্ট সুশাসনের অজুহাতে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব করেছিল এবং তার জন্য যে যুক্তি দেখানো হয়েছিল তা বাঙালী প্রত্যাখ্যান করেছে। বঙ্গবিভাগের গূঢ়তম উদ্দেশ্য যে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনাকে ধ্বংস করা, এ রহস্য বাঙ্গালীর কাছে উদঘাটিত হয়েছে বলে বাঙালীর প্রতিবাদের কণ্ঠ এত উচ্চতা লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, লক্ষ করার বিষয় গণবিক্ষোভ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গেই বেশি অনুভূত হচ্ছে। অথচ প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগে ঢাকা হবে নতুন প্রদেশের রাজধানী। এ থেকে বোঝা যায়, পূর্ববঙ্গবাসীরা এই প্রস্তাব অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেন নি। কারণ, কলকাতার সঙ্গে এমন কতগুলি অনুষঙ্গ মিশে আছে যে হৃতগৌরব ঢাকা নগরীর পক্ষে তার স্থান পূরণ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, চন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর কাছে রাজনৈতিক পরিবর্তন মূল্যহীন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব সামাজিক জীবনে অনুভূত হতে থাকে। বাঙালী জাতির সামাজিক ঐক্য (solidarity of Bengalee race) বিনষ্ট হবে যদি দেশের ভূভাগ—যে কোনও কারণেই হোক, দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বর্তমান বাঙালী জাতির যে চিন্তাসাম্য, অনুভূতিসাম্য

ও মানসিক সাম্য বর্তমান কোনও ভাবে তা বিভক্ত ও বিনষ্ট হলে কালক্রমে বাঙালীজাতিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং পৃথক সরকার দ্বারা বাংলার দু খণ্ড দীর্ঘ দিন শাসিত হলে তাদের মননে ও চিন্তায় এই বিভাজনের ছাপ পড়তে বাধ্য। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে নয়, শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী জাতিগঠনের চিন্তা থেকেই চন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকারের অভিসন্ধিমূলক দেশবিভাগের প্রতিবাদ করেছিলেন।

উল্লেখপঞ্জী

১। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), কলিকাতা ১৩১১, পৃ ৬৮৯

২। R. C. Majumdar. ed, 'Female education', "*British Paramountcy and Indian Renaissance*" Part II, Vol X, Bombay, 1965, p. 65.

৩। যোগেশচন্দ্র বাগল, "বাংলার নব্যসংস্কৃতি", ১৯৫৮, পৃ, ১১-১৩

৪। চন্দ্রনাথ বসু, 'স্লেচ্ছ পণ্ডিতেব কথা', "নবজীবন" (ফাল্গুন, ১২৯৪), পৃ ৪৭৬

৫। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা', "প্রবাসী" (পৌষ, ১৩৬২), পৃ ৩৪৯

৬। B. B. Majumdar, "*History of Political Thought from Rammohan to Dayananda*" Vol I, Calcutta, 1934, p 279.

৭। Ibid, p 276

৮। দ্র: Bipinchandra Pal, "*Memories of my Lifea nd Time*"*s* Vol I, 1932.

৯। "সোমপ্রকাশ" (১২ই বৈশাখ, ১২৭৮) প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছিল, 'উহা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) লার্ড কর্নওয়ালিস মহোদয়ের কীর্তিস্তম্ভ-স্বরূপ, ব্রিটিশ জাতির ন্যায়পরতা ও বাক্যনিষ্ঠার উজ্জ্বল পতাকা-স্বরূপ এবং বঙ্গদেশের মঙ্গল-তারকা স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।'

১০। চন্দ্রনাথ বসুর লেখা প্রকাশ করে "*Calcutta Review*" পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন যে, লেখকের বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে

একমত না হলেও লেখকের প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের জন্যই লেখাটি ছাপা হচ্ছে।

১১। যোগেশচন্দ্র বাগল, "মুক্তির সন্ধানে ভারত", ১৩৭৯, পৃ ২৩৫

১২। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' (১ম প্র), "কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র", ১৯৬৪, পৃ ১৬

১৩। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৯০

১৪। "ভূদেব চরিত" (২য় ভাগ), ১৩৩০, পৃ ৩১২

১৫। "বঙ্গভাষার লেখক" (১ম), ১৩১১, পৃ ৬৮০

১৬। A. Tripathi, 'The Partition of Bengal', *"The Extremist Challange"*, Calcutta,. 1967, p 93

চন্দ্রনাথের রচনাবলী

চন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'শকুন্তলাতত্ত্ব' 'বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিকভাবে ৭টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, ১২৮৭ ও আষাঢ় ১২৮৮)। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (দ্বি-সং ১২৯৬)। এই প্রবন্ধ লিখে চন্দ্রনাথ রাতারাতি বিখ্যাত হয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' শিক্ষিত মহলে বহুলপরিচিত। এশিয়াটিক সোসাইটির (১৭৮৪) প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬-৯৪) শকুন্তলা ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। মনিয়র উইলিয়মস্ (১৮১৯-৯৯) শকুন্তলার একটি সংস্করণ বের করেন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ বঙ্গাক্ষরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং দেবনাগরী অক্ষরে কাউলের ভূমিকাসহ ১৮৬০এ 'শকুন্তলা' সম্পাদনা করেন। এ ছাড়া বিদ্যাসাগরের অনুবাদ (১৮৫৪) প্রভৃতি শিক্ষিত সমাজে পঠিত হত। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের পুনর্বিচার শুরু হল, তখন ধারাবাহিকভাবে বাংলায় কালিদাসচর্চা শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) 'শকুন্তলা মিরন্দা দেসদিমোনা' ("বঙ্গদর্শন", বৈশাখ, ১২৮২) লিখে এই ধারার সূত্রপাত করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' ("বঙ্গদর্শন", বৈশাখ ১২৮৫) প্রবন্ধ লিখে কালিদাসকে শেকস্পীয়রের সঙ্গে অন্বিত করে বিচার করলেন। বেশ বোঝা যায়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের তুলনায় ভারতীয় সাহিত্যের সামর্থ্য বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন সেকালের শিক্ষিত মানুষেরা। চন্দ্রনাথ বসু সেই ধারা অনুসরণে লেখেন 'শকুন্তলাতত্ত্ব'।

প্রবন্ধ-নাম থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে চন্দ্রনাথ কালিদাসের অমর নাট্যকাব্য থেকে একটি তত্ত্ব নিষ্কাশনে আগ্রহী যার জন্য তিনি সমকালে

প্রশংসিত, পরবর্তীকালে নিন্দিত এবং বর্তমানকালে উপেক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর "শকুন্তলাতত্ত্বে"র তত্ত্বাংশ বাদ দিলেও যে সাহিত্যাংশ থাকে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আজকের বিচারেও তা অমলিন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'শকুন্তলা মিরন্দা দেসদিমোনা' প্রবন্ধে যদিও ঘোষণা করেছিলেন, 'শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এ স্থলে আয়াস করিলাম' তা সত্বেও সমগ্র আলোচনার মধ্যে তার প্রমাণ নেই। বরং লেখক সাহিত্যের সূক্ষ্মবিচারে শেকস্‌পীয়রকেই উচ্চ স্থান দিয়েছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তাঁর আলোচনায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন শেকস্‌পীয়রকে।[১] চন্দ্রনাথের প্রবন্ধে এঁদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। বঙ্কিমের 'ভারতভূমির প্রতি ভালবাসা দেখিয়া' (দ্রঃ উৎসর্গপত্র, 'শকুন্তলাতত্ত্ব') চন্দ্রনাথ গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু ওই 'উৎসর্গপত্র' থেকেই জানা যাচ্ছে, বঙ্কিম অভিজ্ঞান শকুন্তলাকে 'ভারতের' শ্রেষ্ঠকাব্য বলে মনে করলেও চন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তা 'জগতের' শ্রেষ্ঠ কাব্য।[২] চন্দ্রনাথ প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন, কালিদাস জগৎশ্রেষ্ঠ। 'তুমি শুধু ভারতের কালিদাস নও, তুমি জগতের কালিদাস।' ('শকুন্তলাতত্ত্ব', ৭ম পরিচ্ছেদ) চন্দ্রনাথ এই মনোভাব সমস্ত আলোচনায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

'শকুন্তলাতত্ত্ব' প্রবন্ধটি সাতটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের নাটকত্ব বিচার'। লেখক যে কেবল অভিজ্ঞান শকুন্তলের নাটকত্ব বিচারের উপর জোর দিয়েছেন এবং কালিদাসের নাটকের অপূর্ব কবিত্ব আলোচনার গণ্ডিভুক্ত করেন নি তা তিনি গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' ঘোষণা করেছেন।[৩] তার ফলে যে রোমান্টিক প্রেমের অপূর্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্য অভিজ্ঞান শকুন্তলের সাহিত্যিক উৎকর্ষের কারণ তা চন্দ্রনাথের আলোচনায় অঙ্গীভূত হয় নি। কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে অসচেতনও ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ প্রায় ২০ বৎসর পরে (আশ্বিন, ১৩০৯) তাঁর শকুন্তলা-সম্পর্কিত আলোচনায় সেই কাজটি করেছেন।

আলোচনার শুরুতে লেখক মনুষ্যচরিত্রকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একপ্রকার মনুষ্য বাহ্যজগতের দ্বারা অনুশাসিত হয় আর একপ্রকার মনুষ্য আছেন যাঁরা বাহ্যজগৎ শাসন করেন। দুষ্মন্ত এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র। চন্দ্রনাথের মতে, 'দুষ্মন্ত একজন পুরুষকারপূর্ণ মহাপুরুষের ছবি'। চিত্তসংযমে

তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। তপোবনে শকুন্তলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ-কারের পর যখন তাঁর হৃদয় আবেগচঞ্চল এবং তিনি শিথিলধৈর্য হয়েছেন সেই মুহূর্তেও তিনি কর্তব্যবিস্মৃত হন নি। 'ধর্মানুরাগ এবং কর্তব্যজ্ঞান এই অলৌকিক চরিত্রের মূল ভিত্তি'।

দুষ্মন্ত হিন্দু রাজা; হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজসংস্কারে তাঁর অগাধ ভক্তি। তাই শকুন্তলার সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর 'মনোধর্ম' ধর্মসংস্কারকে অতিক্রম করে নি। তিনি আবেগচঞ্চল হৃদয়ভার নিয়েও শকুন্তলার জাতি ও জন্মপরিচয় জানতে আগ্রহী হয়েছেন। ঠিক এই মানসিক অবস্থার শীর্ষ মুহূর্তে কালিদাস অপূর্ব নাটকীয় কৌশলে ভ্রমর-তাড়নার ঘটনাটি সংযোজিত করেছেন। এর ফলে দুষ্মন্তের হৃদয়ের চাঞ্চল্য আরও বর্ধিত হল কিন্তু তখনও তিনি সংযত-চিত্ত। এক্ষেত্রে 'দুষ্মন্তের ধর্মানুরাগ এবং আত্মসংযমশক্তি কম হইলে তিনি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কাজ করিয়া ফেলিতেন'। এই ধর্মানুরাগের ও চিত্ত সংযমের আর একবার পরিচয় পাওয়া গেল শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে। চরণ-দলিতা ফণিনীর ন্যায় শকুন্তলার বিষময় বাক্য ও ঋষিকুমার শার্ঙ্গরবের শাপাগ্নি সত্ত্বেও তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করলেন না। ঋষিবাক্যে তাঁর শ্রদ্ধা আছে। তথাপি ঋষি যখন তাকে পরস্ত্রী (স্মৃতিভ্রষ্ট দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা পরস্ত্রীই) গ্রহণ করতে বলেন তখন ধর্মের বৃহত্তর নীতির কাছে তা তুচ্ছ মনে হয়। এইভাবে দুষ্মন্ত নারীর রূপমোহকে জয় করেছেন এবং বাহ্যজগতের উপর জয়ী হয়েছেন। আবার হারানো নিদর্শনাঙ্গুরীয়টি দেখে তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন কিন্তু 'ভস্মাবশেষ' হননি। পরিণীতা স্ত্রীকে ত্যাগ করার অনুশোচনায় 'দুষ্মন্তের হৃদয় আশাশূন্য অনন্ত যন্ত্রণাগার' কিন্তু অসুরবধে আহূত হওয়ামাত্র তিনি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে কর্মজগতের আহ্বানে বহির্গত হলেন। চন্দ্রনাথের মতে, এখানেই দুষ্মন্ত চরিত্রের মহত্ত্ব ও নাটকত্ব। তিনি হিন্দুরাজা; তাই হৃদয়শাসনকে প্রাধান্য না দিয়ে ধর্মের অনুশাসন ও কর্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

চন্দ্রনাথের 'শকুন্তলাতত্ত্ব' 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হওয়ার আগের মাসে লেখকের প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য' ('বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৮১) প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের হৃদয়প্রাবল্যকে নিন্দিত করেছিলেন এবং তা যে ভারতে অনুসরণীয় নয় একথাও বলেছিলেন। চন্দ্রনাথ কালিদাসের নাটকের দুষ্মন্ত চরিত্রের মধ্যে

ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী 'বাহ্যজগৎ অনুশাসক মনে'র সন্ধান পেয়ে গেছেন। 'নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য' প্রবন্ধের বক্তব্যের পরিপূরক হিসেবে দুষ্মন্ত এখানে উপস্থাপিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দুষ্মন্ত চরিত্রের 'নিগূঢ় অন্তর্লোকচারী অপ্রত্যক্ষ নাটকত্ব' আলোচিত হয়েছে। 'অপ্রত্যক্ষ নাটকত্ব' বলতে চন্দ্রনাথ চরিত্রের অন্তর্লোকে সঞ্চারিত দ্বন্দ্ব বুঝেছেন। শেকস্‌পীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকে রোমিও চরিত্রে প্রেমের বিঘ্ন বাহ্যঘটনাসম্ভূত—দুই রাজবংশের চির-শত্রুতাজনিত। কালিদাসের দুষ্মন্ত চরিত্রে এ জাতীয় বিঘ্ন কিছু নেই। শকুন্তলা বয়ঃপ্রাপ্তা, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা 'বিবাহের ঘটকালিতে নিযুক্ত', এমন কি প্রণয়ে মাতা গৌতমীর প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় বর্তমান, কণ্বও 'উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় আছেন'। সুতরাং বাইরের বিঘ্ন নয়, দুষ্মন্তের প্রেমের একমাত্র বিঘ্ন তাঁর অন্তর্জগতের জ্ঞানমূলক ধর্মভাব। দুষ্মন্তের মনের সংঘর্ষ—আত্মভাব এবং আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষ—সে মনের আত্মপরতার এবং সমাজপরতার সংঘর্ষ—সেই মনের এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের সংঘর্ষ।' চন্দ্রনাথ এখানে নাটকীয় চরিত্রের গভীরতর অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিই ইংগিত করেছেন। তাঁর আলোচনায় গভীরতার স্পর্শ আছে এই কারণে যে তিনি নাটকীয় চরিত্রের এই দ্বৈতলীলার মূল অনুসন্ধান করেছেন সমাজজীবনের অগ্রগতির ধারার মধ্যে। একপ্রকার মানুষ আছেন যাঁরা প্রচলিত সংস্কার নির্বিচারে মেনে চলেন, এঁদের মধ্যে সমাজপরতা প্রাধান্য পায়। আর এক প্রকার মানুষ আছেন যাঁরা জ্ঞানকে অবলম্বন করে যুগপ্রাচীন সংস্কারগুলিকে উপেক্ষা করেন, এঁদের মধ্যে আত্মপরতা প্রাধান্য পায়। মানুষের ইতিহাস সমাজ-পরতা থেকে আত্মপরতার দিকে যাত্রা করেছে। দুষ্মন্ত হিন্দুশাস্ত্র ও সংস্কারে বিশ্বাসী আবার প্রয়োজনে জ্ঞানভাব অবলম্বন করে তিনি প্রাচীনতার মোহবন্ধনও ছিন্ন করেন। মানবসভ্যতার ইতিহাসের দুই বিপরীতমুখী ক্রিয়া তাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়েছে। চন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'দুষ্মন্ত গূঢ় ঐতিহাসিক চরিত্র'। দুষ্মন্ত চরিত্র একই সঙ্গে দ্বৈতভাবের লীলাস্থল। দুই বিপরীতমুখী ভাব সংঘর্ষে ('সমাজপরতা' ও 'আত্মপরতা') চরিত্রটি সজীবতা লাভ করেছে। চন্দ্রনাথের মতে 'ইহাই অভিজ্ঞান শকুন্তলের অপ্রত্যক্ষ নাটকত্ব'।

নাটকীয় চরিত্র বিশ্লেষণে ও ভাববস্তু ব্যাখ্যায় সমাজতত্ত্ব আলোচনা হয়ত

অপ্রাসঙ্গিক। তা সত্ত্বেও চন্দ্রনাথ দুষ্মন্ত চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন সে সত্যটুকু বিস্মৃত হওয়া যায় না। এ সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উৎকলনযোগ্য মন্তব্য করেছেন, 'চন্দ্রনাথ বসু এই দৃশ্যকে (শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান দৃশ্য) অবলম্বন করিয়া একটি সার্বভৌম ইতিহাসতত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। ...কালিদাস জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক ইতিহাসের এই বিবর্তনক্রমের রহস্যভেদ করিয়াছিলেন, কেননা, কবি প্রতিভায় ভবিষ্যৎ ইতিহাস নিহিত থাকে।'[৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম—'শকুন্তলা—নাটকের চরিত্র'। অর্থাৎ আলোচনায় নাটকের চরিত্র হিসাবে শকুন্তলা-চরিত্র বিচারের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু লেখক এখানে প্রকৃতপক্ষে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং এই আলোচনার পরিধি বাড়িয়ে পুরুষ ও নারীর পৃথক স্বভাববৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। এই বিশ্লেষণে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়।

১. পুরুষের দেহ বলিষ্ঠ; রমণীর দেহ কোমল। প্রমাণ, 'দুষ্মন্তের দেহস্তম্ভ গিরিচর হস্তীর ন্যায় প্রভূত বলব্যঞ্জক'; 'নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকাফুল আর নবপ্রস্ফুটিত শকুন্তলা একই বস্তু'।

২. পুরুষ দৈহিক বলে কষ্টসহিষ্ণু; রমণী হৃদয়ের বলে কষ্টসহিষ্ণু এবং কষ্টসহিষ্ণুতায় রমণী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রমাণ, যে শকুন্তলা ক্ষুদ্র কলস বহন করতে ভার বোধ করেন এবং দুচারটে বৃক্ষমূলে জলসেচন করে আলুথালু হয়ে পড়েন, তিনিই কণ্বের আশ্রম থেকে হস্তিনাপুর পর্যন্ত সুদীর্ঘপথ হেঁটে এসেও শ্রান্তি বোধ করেন না। হৃদয়ের গুণে কোমলতম নীলোৎপলপত্র অবস্থা বিশেষে কঠিনতম শমীবৃক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

৩. কর্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম; রমণীর হৃদয় সাপেক্ষ ধর্ম।

৪. পুরুষচরিত্র বিস্তারগুণ বিশিষ্ট; রমণীচরিত্র গভীরতাগুণ বিশিষ্ট। প্রমাণ, শকুন্তলা হৃদয়ের মোহে বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হন, দুর্বাসার ভয়ংকর অভিশাপও তার কর্ণগোচর হয় না। তাই পুরুষ চরিত্রবিস্তারে সমুদ্রবৎ— রমণী হৃদয়-গভীরতায় সমুদ্রবৎ।

৫. পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অনেকটা স্বাধীন; রমণীর আধ্যাত্মিকতা জড়জগৎসাপেক্ষ। প্রমাণ, শকুন্তলা দুষ্মন্তকে চোখের সম্মুখে পেতে চান। তার জন্য তাঁকে হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্চর্যতম জড়জগতের সৃষ্টি করে নিতে হয় এবং

সেখানে তিনি দুষ্মন্তকে পান। চন্দ্রনাথের মন্তব্য 'রমণীমণ্ডলে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কবি'।

৬. পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তির ফল; রমণীর বুদ্ধি হৃদয়ের অভিব্যক্তি-মাত্র। প্রমাণ, দুষ্মন্ত অরক্ষিত শকুন্তলার হাত ধরতে উদ্যত হলে শকুন্তলা নিষেধ করেন। দুষ্মন্ত তাকে যুক্তি দ্বারা বোঝাতে চান গুরুজনের সম্মতি ব্যতীত আত্মসমর্পণ সম্ভব। শকুন্তলা হৃদয়ময়ী—তাই জ্ঞানমূলক বিচার বুঝলেন না; তিনি পুনরায় গুরুজনের নাম করে দুষ্মন্তকে নিবৃত্ত করলেন।

৭. 'রমণী বৈপরীত্যের আধার—কোমল হইয়াও কঠিন, দুর্বল হইয়াও বলিষ্ঠা, শ্রমকাতর হইয়াও কষ্টসহিষ্ণু, নরম হইয়াও দৃঢ়, বুদ্ধিমতী হইয়াও বিচারশক্তিহীনা, আধ্যাত্মিক হইয়াও জড়জগৎসাপেক্ষ।' 'জগতে রমণীর ন্যায় রহস্য আর নাই।'

রমণী চরিত্রের রহস্যময়তা ও রোমান্টিকতা উনবিংশ শতাব্দীর কবি-সাহিত্যিকদের আকর্ষণ করেছিল। অন্যত্র চন্দ্রনাথের বক্তব্য কোথাও কোথাও রোমান্টিকতা বিরোধী হলেও এখানে তিনি কালিদাসসৃষ্ট শকুন্তলা চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে রোমান্টিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

'শকুন্তলাতত্ত্বে'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে চন্দ্রনাথ এই নাটকের 'প্রেমতত্ত্ব' বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। দুষ্মন্ত সম্পর্কে পূর্ব বক্তব্য সংশোধন করে এবার তিনি বললেন দুষ্মন্ত 'কিছু বেশি স্ত্রীপ্রিয়'। শকুন্তলা ও তার সখীদ্বয়কে দেখে তাঁর মধ্যে রূপানুরাগের সৃষ্টি হয়েছে। বর্ধিত রূপলালসার জন্য তিনি শকুন্তলার ওষ্ঠ বাহু প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গের সৌন্দর্য দেখতে থাকেন। সখীদ্বয়ের কথোপ-কথনে যখন তিনি জানতে পারেন, শকুন্তলার উপযুক্ত পতিলাভের ইচ্ছা হয়েছে তখন তাঁর অন্তর মিলনকামনায় পূর্ণ হল।

তপোবন কন্যা শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণকন্যা ভেবে সংশয় থেকে গেল। ক্রমে সে রহস্যও উন্মোচিত হলে দুষ্মন্ত শকুন্তলার শ্রমকাতরতা দেখে নিজে কষ্ট অনুভব করেন। চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এখন প্রেমের স্নেহময় মূর্তি প্রকটিত হইল'। লেখক দুষ্মন্ত হৃদয়ে প্রেমবিকাশের প্রতিটি স্তর উন্মোচন করে দেখিয়েছেন। লাবণ্যপ্রতিমা শকুন্তলাকে দেখার পর লোলুপ রাজার হৃদয় ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে স্নেহময় প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে, এই বিশ্লেষণে চন্দ্রনাথ যথার্থই রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

একইভাবে তিনি শকুন্তলার হৃদয় পরিবর্তনের মনোজ্ঞ চিত্র আমাদের

উপহার দিয়েছেন। প্রেম সঞ্চারের পর শকুন্তলা লজ্জাবশত অনেকটা ধীর স্থির—স্থানত্যাগ করার ক্ষমতাটুকুও হারিয়েছেন। প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে লুকোচুরি খেলা একটু আছে বটে তবে তা স্বাভাবিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে নি। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু শকুন্তলাকে নিন্দিত করে বলেছিলেন, 'দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ একপ্রকার লুকোচুরি খেলা। …শকুন্তলার এ সকল 'বাহানা' আছে; মিরান্দার সে সকল নাই।'৫ অনেকটা বঙ্কিমের মতের প্রতিবাদ করে চন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রথম প্রেমসঞ্চা-চারের সময় রমণী অধিকতর লজ্জাশীলতা হেতু এইরূপ লুকোচুরি করিয়া থাকে। রমণীর অস্তিত্ব হৃদয়গত। যে যত হৃদয়াধীন, বাহ্য অভিব্যক্তি তাহার তত কষ্টকর' (পরিচ্ছেদ ৪)। দুষ্মন্তের হৃদয়ে প্রেমসঞ্চারের পর জ্ঞানের কাষ হয়েছে—তিনি বিঘ্ন কল্পনা করেছেন, জাতি বিচার করেছেন। শকুন্তলায় এ সব কিছুই নেই, তার মন একেবারে বিচলিত হয়ে উঠল। 'রমণী হৃদয়প্রধান বলেই শকুন্তলার প্রেমসঞ্চারের এই ভিন্ন প্রণালী'।

'শকুন্তলাতত্ত্ব' যেমন চন্দ্রনাথের খ্যাতির কারণ; তেমনি এর পঞ্চম পরিচ্ছেদ তাঁর অখ্যাতির সহায়ক। পরিচ্ছেদটির নাম 'অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থ'। এখানে লেখকের হিন্দুত্বের অভিমান ও তত্ত্বজ্ঞানের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যসৌন্দর্য বা নাটকত্ব বিশ্লেষণ না করে অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টার মধ্যে লেখকের স্বধর্মচ্যুতি যে ঘটেছে তা উল্লেখ না করলেও চলে। চন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত—'অভিজ্ঞানশকুন্তলা কাব্যাকারে সাংখ্যদর্শন'। বিবিধ সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য অন্বেষণে লেখকের শ্রমের চিহ্ন এখানে বর্তমান।

কালিদাসের বিশ্রুত নাট্যকাব্য থেকে তিনি কয়েকটি অর্থ আবিষ্কারে আগ্রহী হয়েছেন এবং অনায়াসে তা পেয়েও গেছেন—

১. 'ব্যক্তিবিশেষের পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয়; তাহা সমস্ত সমাজের শুভাশুভের কারণ। ইহা অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অর্থ'।

২. শকুন্তলায় হৃদয়ের প্রাধান্য। তিনি প্রণয়মুগ্ধ হয়ে সামাজিক কর্তব্য (অতিথিসেবা যার অন্যতম) ভুলে গেলেন। এই আত্মভাব শিক্ষাদ্বারা সমাজমুখী করতে হয়, নচেৎ দুর্বাসার শাপ নিয়তির মত নির্মম হয়ে ওঠে। 'তাহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের দ্বিতীয় অর্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তল জগতের একখানি প্রধান সমাজতত্ত্ব-জ্ঞাপক নাটক'।

৩. হিন্দুসমাজে শুধু হৃদয়ের মিলনকে বিবাহ বলে না। বিবাহ সামাজিক সুখদুঃখের নিয়ন্তা। অতএব সমাজকে সাক্ষী রেখে তার সম্মতি নিয়ে বিবাহ করতে হয়। দাম্পত্যসম্বন্ধ সমগ্র সমাজের সেবায় নিযুক্ত না হলে পবিত্রতা লাভ করে না। 'দুষ্মন্ত সে প্রণালীতে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ না করিয়া মহাপাপ করিলেন এবং মহা-অনিষ্ট ঘটাইলেন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের তৃতীয় অর্থ।'

৪. দুষ্মন্ত পুরুষত্বের প্রতিমা—শক্তির জীবন্ত মূর্তি কিন্তু তিনিও রিপুর শাসনে নীতিভ্রষ্ট। মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় এই ভীতিজনক রিপুর দাসত্ব আজও মানুষের মধ্যে বর্তমান। মানবজাতির এই মানসিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব অভিজ্ঞানশকুন্তলে চিত্রিত হয়েছে। 'ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল এই তত্ত্বেরই দৃশ্যকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অর্থ।'

৫. দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা পুরুষ ও প্রকৃতির দৃশ্যমান মূর্তি। 'কুমারসম্ভবে' কালিদাস সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। সেখানে তিনি সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতির আধ্যাত্মিক মিলন চিত্রিত করেছেন। 'অভিজ্ঞানে' পুরুষ ও প্রকৃতির সাংসারিকভাবে মিলন। আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষের দ্বারা প্রকৃতি শাসিত হয়; সংসারাশ্রমে প্রকৃতির দ্বারা পুরুষ শাসিত হয়। এই প্রভেদ বোঝাবার জন্য মহাকবি শকুন্তলাকে দিয়ে দুষ্মন্তের পদস্খলন দেখালেন এবং দেখালেন এ জগতে পুরুষমাত্রই দুষ্মন্তের ন্যায় বিপদগ্রস্ত। 'ইহাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পঞ্চম অর্থ'।

৬. 'তিনি (কালিদাস) অভিজ্ঞানশকুন্তলে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, ঐন্দ্রিয়িক শক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিলে চলিবে না, সমাজকে সুসংস্কৃত এবং নীতিপ্রবণ করিয়া সমাজরূপ মহাশক্তিও প্রয়োগ করিতে হইবে। অভিজ্ঞানশকুন্তল মানসিক শক্তি এবং সমাজশক্তির মহাকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠ অর্থ'।

লেখক এইভাবে তাঁর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন—'সেই মহাতত্ত্বই (পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব) অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রাণ। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্যাকারে সাংখ্যদর্শন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থতত্ত্বের চরমসীমা'।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন চন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার অনেক আগেই নাটক সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন' তার নীতি ঘোষণা করে বলেছিল, 'মানব-

প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব প্রকটন করাই নাটকের উদ্দেশ্য।' (সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, শ্রাবণ ১২৮১) চন্দ্রনাথের তত্ত্বানুসন্ধান প্রবণতা 'বঙ্গদর্শন'-এর ঘোষিত নীতির পরিপূরক। পরবর্তীকালে চন্দ্রনাথের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" ('বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১২৮৮) শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে শ্রীশচন্দ্র চন্দ্রনাথের অনুসরণে মধুসূদনের অনুপম মহাকাব্য থেকে তত্ত্ব আবিষ্কারে উৎসাহ দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এর এই জাতীয় সমালোচনারীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি এই তত্ত্বান্বেষী সমালোচনাকে লক্ষ করে বলেছেন—'আজকাল যাঁহারা সাহিত্য সমালোচনা করিতে বসেন তাঁহারা কাব্য হইতে একটা কিছু নতুন কথা বাহির করিতে চেষ্টা করেন। কবির ভাবের সহিত আপনার মনকে মিশাইবার চেষ্টা না করিয়া কোমর বাঁধিয়া খানাতল্লাশি করিতে উদ্যত হন। অনেক বাজে জিনিস হাতে ঠেকে, কিন্তু অনেক সময়েই আসল জিনিসটা পাওয়া যায় না।' ('কাব্যসাহিত্য')

আমাদের মনে হয়, 'বঙ্গদর্শন'-এর যে কয়জন লেখক (অবশ্যই চন্দ্রনাথ অন্যতম) সাহিত্য থেকে তত্ত্ব নিষ্কাশনে অতি-উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তাঁরা আগে 'আসল জিনিস'টার খোঁজ করে, পরে 'খানাতল্লাশি' করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁদের সমালোচনাপাঠে কাব্যরসিককেও নিরাশ হতে হয় না।

দুই দশক পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থে চন্দ্রনাথের রচনার নমুনা হিসেবে 'শকুন্তলাতত্ত্ব'-এর ৫ম পরিচ্ছেদটি উদাহৃত হয়েছিল (দ্রঃ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত 'সাহিত্য সম্পুট', ১৯৬০) ফলে 'শকুন্তলা' নাটকের আলোচনায় চন্দ্রনাথ যে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও সাহিত্যের রস আস্বাদনের পরিচয় দিয়েছিলেন তা বৃহত্তর পাঠকসমাজের অগোচরে থেকে গেছে। প্রবল হিন্দুয়ানি ও সমাজতত্ত্ব আবিষ্কারের আগ্রহ তাঁকে একালের পাঠকসম্প্রদায় থেকে করুণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নতুবা দেখা যেত তত্ত্ব আবিষ্কারের ঝোঁক সত্ত্বেও চন্দ্রনাথের সাহিত্যবিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। রক্ষণশীল মনোভাব সত্ত্বেও অভিজ্ঞানশকুন্তলের মত অনুপম নাট্যকাব্যের রসাস্বাদনের তিনি সম্পূর্ণ অধিকারীই ছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শকুন্তলা-নাটকের গৌণ চরিত্রগুলির নাটকীয় প্রয়োজন

আলোচিত হয়েছে। নাটকের মুখ্য চরিত্রদুটির বিকাশে ও মূল ভাব পরিস্ফুটনে গৌণ চরিত্রগুলির ভূমিকা বিচার করে চন্দ্রনাথ প্রাগ্রসর চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমেই মহর্ষি কণ্ব চরিত্র। তিনি প্রাচীন ভারতের একজন প্রখ্যাত ঋষি। তিনি ব্রহ্মসেবায় নিবিষ্ট থেকেও মানবসমাজ ত্যাগ করেন নি। পতিগৃহ যাত্রাকালে শকুন্তলাকে তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা তাঁর মানবসমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। চন্দ্রনাথের মন্তব্য, 'কণ্ব একটি কুলবধূকে যে উপদেশ দিয়াছেন, সে উপদেশ সমস্ত মানবজাতির সংসারধর্মের মূলমন্ত্র'। মহর্ষি কণ্ব স্বর্গাভিলাষী ঋষি হলেও পৃথিবীর জীবজন্তু-তরুলতার প্রতি স্নেহ বিসর্জন দেন নি। পৃথিবীর সকল বস্তুর প্রতি সেবা ও প্রীতির মন্ত্র শকুন্তলা তাঁর পালকপিতার কাছ থেকেই পান। তাই চন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'মহর্ষি কণ্ব অভিজ্ঞানশকুন্তলের মেরুদণ্ড' তখন তা অত্যুক্তি মনে হয় না।

শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত দুজনেই মহর্ষি কণ্বের শিষ্য। তাদের জীবনপ্রণালী ও শিক্ষা একপ্রকার হওয়া সত্ত্বেও তারা অভিন্ন নয়। দুই তাপসবালকের মধ্যে স্বভাবের পার্থক্য আছে। 'শার্ঙ্গরব কিছু বাহ্যদর্শী; শারদ্বত অন্তর্দর্শী'। শকুন্তলাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত দুষ্মন্তকে শার্ঙ্গরব যেখানে ক্রোধপ্রজ্বলিত বিষধরের ন্যায় দংশনে উদ্যত হয়েছেন সেখানে শারদ্বত স্থির, গম্ভীর ও অবিচলিত।

গৌতমী 'ধর্মনিষ্ঠা প্রবীণা মাতৃভাবযুক্তা রমণী'। এই জননীস্বরূপা রমণী শকুন্তলার প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী। তাঁরই মাতৃত্বের আশ্রয়ে শকুন্তলার নারীত্ব বিকশিত হয়েছে। সেই অর্থে তিনিও মহর্ষি কণ্বেরই অংশ— অভিজ্ঞানশকুন্তলের 'মেরুদণ্ডস্বরূপা'।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার চরিত্র ও মনোগত পার্থক্য নির্ণয়ে চন্দ্রনাথের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭) রচিত হবার বহুপূর্বে চরিত্র দুটির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য চন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়েছিল। লেখকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা এবং অনসূয়া এই তিনটিতে এক। তিনটি একত্রে প্রতিপালিত; তিনটির একই কাজ, একই চিন্তা, এক হৃদয়'। সকল বিষয়ে এক হয়েও এদের ব্যক্তিত্ব পৃথক্। অনসূয়া সংসারানভিজ্ঞ সরলা বালিকা, প্রিয়ংবদা যৌবনবতী, পরিণত ও চতুরা। চন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন—'অনসূয়া কিছু বালিকা

বালিকা রকম। ...অনসূয়াটি ফুলের কুঁড়ি এখনও ফুটে নাই, কিন্তু, ফোট-ফোট। শকুন্তলাটি ফুটিয়াছে, — কিন্তু নববিকশিত পদ্মের ন্যায় সে-ফুলের সমস্ত গৌরব পাপড়ি ঢাকা। প্রিয়ংবদা গোলাব ফুল—কুঁড়ি ফুটিয়াছে মাত্র, কিন্তু তাহাতেই সুগন্ধ ছড়াইতেছেন।' শকুন্তলা-অনসূয়া-প্রিয়ংবদা চরিত্রের এই সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় যথার্থ সাহিত্যজিজ্ঞাসুর।

সপ্তম পরিচ্ছেদে, মহাভারতের 'শকুন্তলোপাখ্যান' কালিদাসের হাতে কি রূপান্তর লাভ করেছে তা বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতের পরিচিত কাহিনীতে দুষ্মন্ত মহিমাবর্জিত ইন্দ্রিয়সেবী পুরুষমাত্র। কালিদাস মহাভারতের কাহিনীকে রূপান্তরিত করেছেন দুষ্মন্ত চরিত্রের দুটি দিক বিশেষভাবে দেখাবার জন্য। ১. তাঁর ঐন্দ্রিয়িক শক্তির প্রাধান্য। ২. তাঁর মানসিক শক্তির বিকাশ। মহাকবি কালিদাস চরিত্রটিতে একটি নতুন মাত্রাও সংযোজন করেছেন। ব্যাসের মহাভারতোক্ত শকুন্তলা-উপাখ্যানের সঙ্গে কালিদাসের নাট্যকাহিনীর সূক্ষ্ম পার্থক্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) রসদৃষ্টিতে প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।[৬] অক্ষয়চন্দ্র এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু মন্তব্য করেছিলেন মাত্র, সেক্ষেত্রে চন্দ্রনাথ একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনাই করেছেন।

মহাভারতে একটি দৈববাণীর উল্লেখ আছে। কালিদাস তার স্থানে দুর্বাসার শাপ পরিকল্পনা করেছেন—সার্থক এই নাট্যপরিকল্পনা! এর ফলেই কঠিন যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকা পুনর্মিলিত হল। কামনামুক্ত হওয়ায় তাদের মিলন স্বর্গীয় বিভায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। এ সম্পর্কে চন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ রসবিচার ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন—'বসন্তের রাগগর্ভ মুকুল শরতের ম্রিয়মাণ কুসুমে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই অদ্ভুত নাটকের রঙ্গভূমি। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই মহাকবির মহাস্বপ্নের আকার।'

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'-এর কয়েকটি নাট্যমুহূর্তের তাৎপর্য চন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেই প্রথম ধরা পড়েছিল। এক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যের রসোপভোগকে খণ্ডিত করে নি। যেমন,

ক. 'অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদম্'—আশ্রমের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের অনেকটা কালিদাস শব্দপ্রয়োগগত কৌশলের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। চন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা—'তিনটি কি চারিটি বই কথা নয়, কিন্তু শুনিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। মনে হয় যেন আমরাই সেই শান্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতেছি।' (পরি ১, পৃ ৯)

এ ব্যাখ্যায় লেখকের অনুভবের সুদূর সীমান্ত পর্যন্ত আমাদের কাছে ধরা পড়ে যায়।

খ. ভ্রমর-তাড়না সংক্রান্ত ঘটনা সন্নিবেশের নাটকীয়তা এবং রাজমাতার অনুরোধ রক্ষার জন্য বিদূষক মাধব্যকে ঘটনাস্থল থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মধ্যে যে নাটকীয়তা আছে তা চন্দ্রনাথেরই আবিষ্কার বললে ভুল হয় না।

গ. একই ভাবে দুষ্মন্তচরিত্র পরিস্ফুটনে রাজমাতা চরিত্র, নাটকীয় বাঁক ফেরাতে রাক্ষস সংবাদের প্রয়োজনীয়তা বা হংসপদিকার গীতের গভীর তাৎপর্য প্রভৃতি চন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণীদৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়েছিল। নাটকবিচারে এই দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্য নাটকের গভীর অধ্যয়ন থেকে তিনি পেয়েছিলেন।

ঘ. দুর্বাসার শাপ ঘটনার অসাধারণ নাটকীয় গুরুত্ব চন্দ্রনাথই প্রথম লক্ষ করেন। তিনি বলেছেন, দুর্বাসার শাপ নাটকের সমগ্র কাহিনীকে দুটি স্পষ্টভাবে বিভক্ত করেছে: 'শাপোচ্চারণ হইতে অঙ্গুরীয়ক পুনঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত এক ভাগ; অঙ্গুরীয়ক পুনঃপ্রাপ্তি হইতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন পর্যন্ত আর এক ভাগ।' চন্দ্রনাথ এরূপ বিভাগের সঙ্গত কারণও নির্দেশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথও শকুন্তলা-নাটকের সৌন্দর্য আস্বাদন করতে গিয়ে দুর্বাসার শাপের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিজ্ঞানের নায়ক-নায়িকার উপর ঋষি শাপের প্রভাব বিশদ করে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন। নাম: 'দুর্বাসার শাপ' (১৩২৪)। দুর্বাসার শাপ যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা নয়, কবির ন্যায়বোধ তথা ধর্মবোধের প্রকাশক সেকথা চন্দ্রনাথই প্রথম বলেন। তাঁর মতে দুর্বাসার শাপ অভিজ্ঞানের কবির moral justice-এর পরিচায়ক, রবীন্দ্রনাথের মতে তা poetic justice এবং হরপ্রসাদের কাছে তা social justice রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

চন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারের এই রসদৃষ্টি সর্বত্র রক্ষা করতে পারেন নি। অভিজ্ঞানশকুন্তলের অনবদ্য নাট্যসৃষ্টিকে মধ্যস্থ করে তিনি সমাজচিন্তায় মুখর হয়েছেন। এখানেই তাঁর আলোচনার সীমাবদ্ধতা। তিনি নৈতিক ও ধর্মীয় উপদেশের ভিত্তিতে নাট্যবিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছিলেন। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ আপন প্রেমভাবনার সঙ্গে অন্বিত করে 'শকুন্তলা'য় সৌন্দর্য-আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছেন। যে প্রেম দেহগত তা ক্ষণস্থায়ী। তা সুলভ বলেই সহজে হারায়। যে প্রেমের পিছনে তপস্যা নেই তা

রবীন্দ্রনাথের কাছে নিন্দিত। দুঃখের অগ্নিদহনে প্রেম খাঁটি হয়, হেমদীপ্তি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ প্রেম সম্পর্কে এই ভাবনার পরিপূরক হিসাবে 'শকুন্তলা' কে পেয়েছেন এবং কোন ধর্মীয় বা সংকীর্ণ নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার না করে চিরকালীন সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি 'শকুন্তলা'র ধর্মীয় ও নৈতিক লক্ষ্য অস্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ অন্য প্রসঙ্গে বলেছেন—

'ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত।' ('কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা,' পৌষ ১৩০৮)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লক্ষ্য সৌন্দর্য আবিষ্কার। তা সত্ত্বেও তিনি দুর্বাসার শাপের ধর্মীয় তাৎপর্যকে লঘু করেন নি। তাঁর মন্তব্য, 'গুরুতর পাপে গুরুতর শাস্তি। যে যে কোন ঝোঁকে পড়িয়া আপনার ধর্ম পালন করিতে না পারে তাহাকে শাস্তি পাইতেই হয়।' ('দুর্বাসার শাপ,' ১৩২৪)

তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবণতা সত্ত্বেও চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের আলোচনার ভিত্তি যে এক, এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশীর (জ. ১৯০২) প্রতিবেদন আছে। তিনি লিখেছেন, 'চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা পড়িলে দেখা যাইবে উভয়েই সাহিত্য ও সমাজ, সৌন্দর্য ও কল্যাণ দুটিকেই আলোচনার বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে কল্যাণ-নিরপেক্ষ মনে করেন না। তাঁহার বক্তব্য—'সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণ-দীপ জ্বলে।'···সাহিত্য সৌন্দর্য ও সমাজকল্যাণ ধারা দুটির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন। রবীন্দ্রনাথের বিচারে শকুন্তলা নাটকের মহত্ত্বের মূলে আছে এই দুটি ধারার সুষ্ঠু সমন্বয়। চন্দ্রনাথ বসুর আলোচনার ভিত্তিও ইহাই।'[৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শকুন্তলা' (১৩০৯) নামিত আলোচনায় কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাট্যকাব্যের যে সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছেন তা অতুলনীয় এবং তা মহাকবির লেখনীর যোগ্য, তবু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাত অনেকগুলি অংশ ২০ বছর আগেই চন্দ্রনাথের রসদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। উভয়ের রচনাংশ পাশাপাশি উৎকলন করলে তাঁদের যে দৃষ্টিসাম্য ঘটেছিল তা সহজেই অনুভব করা যায়[৮]—

চন্দ্রনাথ। 'অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদং—তিনটি কি চারিটি বই কথা নয়,

কিন্তু শুনিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। মনে হয় যেন আমরাই সেই শান্তি রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি।' (পরিচ্ছেদ ১)

রবীন্দ্রনাথ। 'নাটকের প্রারম্ভেই শান্তি-সৌন্দর্য সংবলিত এমন একটি সম্পূর্ণ জীবন নিভৃত পুষ্পপল্লবের মাঝখানে প্রাত্যহিক আশ্রমধর্ম, অতিথিসেবা, সখীস্নেহ ও বিশ্ববাৎসল্য লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল।' ('শকুন্তলা')

চন্দ্রনাথ। তরুলতার কাছ থেকে শকুন্তলার বিদায়, মাতৃহীন মৃগশিশুর প্রতি কর্তব্য, পর্ণশালার দ্বারদেশে পুঁড়ি ধান্যের উপচার, কণ্বের উদ্বেগ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। চন্দ্রনাথ নাটকের এই অংশগুলির মর্মার্থ গদ্যানুবাদে দিয়েছেন। (পরিচ্ছেদ ৬)

রবীন্দ্রনাথ। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে কণ্বের উক্তি, 'ওগো সান্নিহিত তপোবন তরুগণ / তোমাদের জল না করি দান / যে আগে জল না করিত পান।' এবং শকুন্তলার উক্তি, 'আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে আমার পা যেন উঠিতেছে না।' প্রভৃতি ঘটনা ও উক্তি পরম্পরা। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মূল শ্লোকগুলির কাব্যানুবাদ করেছেন। ('শকুন্তলা')

চন্দ্রনাথ। হংসপাদিকার গীতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন চন্দ্রনাথ। এবং মাধব্যের উক্তি 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ' উদ্ধার করে রাজার চিত্তচাঞ্চল্য ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। (পরিচ্ছেদ ৪)

রবীন্দ্রনাথ। রাজপ্রেয়সী হংসপদিকার গীত ও মাধব্যপ্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথও আলোচনা করেছেন। হংসপদিকার গীতের কবিকৃত কাব্যানুবাদ: 'নবমধুলোভী ওগো মধুকর' ইত্যাদি। ('শকুন্তলা')

চন্দ্রনাথ। 'শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা এবং অনসূয়া এই তিনটি এক।' (পরিচ্ছেদ ৬)

রবীন্দ্রনাথ। 'একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক-তৃতীয়াংশ।' ('কাব্যের উপেক্ষিতা')

চন্দ্রনাথ। কালিদাসের অভিজ্ঞানের সঙ্গে শেকস্‌পীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের তুলনা করেছেন চন্দ্রনাথ। উভয় নাটকেই অপরিণামদর্শী প্রেম বর্ণিত। অবশ্য লেখক শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কালিদাসকে।

রবীন্দ্রনাথ। 'শেকস্‌পীয়রের রোমিয়ো-জুলিয়েট প্রভৃতি নাটকে তাহার (প্রবৃত্তির) ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শকুন্তলার মত এমন প্রশান্ত গম্ভীর, এমন সংযতসম্পূর্ণ নাটক শেকস্‌পীয়রের নাটকাবলীর মধ্যে

একখানিও নাই।' ('শকুন্তলা')

'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১২৮৮) প্রকাশ করে চন্দ্রনাথ রাতারাতি বিখ্যাত হয়েছিলেন। গ্রন্থখানি সমকালে অবিমিশ্র প্রশংসাবাণী দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩), রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি তৎকালীন মনীষীরা 'শকুন্তলাতত্ত্ব'-এর প্রশংসা করেছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যানুচরের লেখা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'A single hour of study of the Sakuntala by a Bengali author, Baboo Chandranath Bose, is worth all that Europe has had to say on Kalidasa, not excepting even Goethe's well-known eulogy'[৯]

'শকুন্তলাতত্ত্ব'-এর গদ্যরীতি ও রচনাশৈলীর প্রশংসা অনেকেই করেছেন। 'এর অংশবিশেষ এক সময় আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত হত'।[১০] 'শকুন্তলাতত্ত্ব' থেকে চন্দ্রনাথের গদ্যের ঈষদ্ নমুনা উদ্ধৃত হল—'ক্ষুদ্র কলসের ভারে শকুন্তলার ক্ষুদ্র বাহুলতা এলাইয়া পড়িল; শ্রমাধিক্যবশতঃ তাহার ধমনী প্রবাহিত শোণিত স্রোত খরতর হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ করপদ্মটিকে অধিকতর লোহিতবর্ণ করিয়া তুলিল; তাহার নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল এবং নব যৌবনোন্নত বক্ষ ঝটিকাবিক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনীর ন্যায় তরঙ্গিত হইয়া উঠিল; তাঁহার সুকোমল মুখখানি স্বেদবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইল এবং সেই স্বেদবিন্দুতে তাহার কর্ণের শিরীষ পুষ্পগুলি অতি সুকোমলভাবে জড়াইয়া গেল; তাহার অলকগুলি তাহার হস্তের অবরোধ না মানিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।'

এই গদ্যের সৌন্দর্য ও তরঙ্গিত আবেগ আমাদের মুগ্ধ করে। বঙ্কিমের গঠিত গদ্যের ভূমিতেই চন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং গদ্যের সেই রাজ্যকে তিনি বর্ধিত করেছিলেন যা রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যকে স্পর্শ করেছিল। উপর্যুক্ত অংশটিতে যে গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে তাকে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের পাশে স্থাপন করলে অনুপযুক্ত মনে হয় না।

'ত্রিধারা' (১২৯১) বিবিধ বিষয় নিয়ে চন্দ্রনাথের লেখা কতগুলি প্রধানত মন্ময়পন্থী রচনার সংকলন। রচনাগুলিকে লেখক তিনটি ধারায় বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম ধারা—অনন্ত মুহূর্ত, পাখিটি কোথায় গেল? ছায়া,

বউ কথা কও, দুইটি হিন্দুপত্নী, সুখের হাট ও সৌন্দর্যের মেলা, ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয় ধারা—কেতাব কীট, ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা, জীবনের কথা। তৃতীয় ধারা—সিদ্ধিদাতা গণেশ, বাঙালীর প্রকৃত কাজ, বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র, দেবধর্মী মানুষ, পাপপুণ্য। এই বিন্যাসের মধ্যে চন্দ্রনাথের সজাগ রসদৃষ্টির পরিচয় আছে। প্রথম দুটি ধারায় প্রধানত সাহিত্যবিষয়ক এবং তৃতীয় ধারায় ধর্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক রচনাগুলি স্থান পেয়েছে।

'অনন্ত মুহূর্ত' 'প্রচার'-এ (বৈশাখ ১২৯৫, পৃ ১১-১৭) প্রথম প্রকাশিত হয়; পরে 'ত্রিধারা' সংকলনের সিংহদ্বারে স্থান পেয়েছে। লেখায় দার্শনিক ভাবনার স্পর্শ আছে, তবে সাহিত্যের রসাস্বাদনই মুখ্য। কাল চলিষ্ণু। কবি সেই কালপ্রবাহ থেকে একটি মুহূর্ত বেছে নেন এবং তার স্থায়ী রূপ দেন কাব্যে, সাহিত্যে। 'ওথেলো', 'শকুন্তলা', 'রামায়ণ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কয়েকটি তাৎপর্যময় মুহূর্ত চন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার রসাস্বাদন করেছেন। রসগ্রাহী আলোচনা হিসাবে 'অনন্ত মুহূর্ত' সার্থক সৃষ্টি। চন্দ্রনাথ এখানে ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের দ্বারাও কিছু প্রভাবিত হয়েছেন; কবি ব্রাউনিংয়ের বহুশ্রুত উক্তি Instant made Eternity-র আলোকে তিনি বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ পেতে চান।

দেসদিমোনা চরিত্রের মাধুর্য কয়েক বৎসর আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে ধরা পড়েছিল (দ্র 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা', 'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৮২)। সম্ভবত এই 'ইতালীয় বালা'র পাতিব্রত্য ভারতীয় নারীদের আদর্শের অনুকূলতা করেছিল বলে চন্দ্রনাথ চরিত্রটিতে মুগ্ধ ছিলেন। ওথেলোর তীব্র ভর্ৎসনার মুখে স্বামীকে প্রত্যাঘাত না করে দেসদিমোনার সংক্ষিপ্ত নম্র উক্তি 'I will not stay to offend you.' এই কথা বলে সে নীরবে স্থান ত্যাগ করল। এটিই লেখকের কাছে অনন্ত মুহূর্ত বলে প্রতিভাত হয়েছে।

শকুন্তলা নাটকের একটি দৃশ্য। শকুন্তলা স্বামিচিন্তায় একান্ত মগ্ন এবং তার বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত। সেই মুহূর্তে কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসার আবির্ভাব। সেই মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠে 'অয়মহং ভো' শুনে হিমালয় অরণ্য পশুপক্ষী ভীত সন্ত্রস্ত। অথচ সেই বজ্রধ্বনি শকুন্তলার মগ্নতা ভাঙতে ব্যর্থ। এটিই 'শকুন্তলা' নাটকের একটি অনন্ত মুহূর্ত। অনুরূপভাবে 'রামায়ণ'-এ রামচন্দ্র পতিব্রতা সীতাকে আর একবার লোকসমক্ষে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে

বললেন। অভিমানাহতা সীতার কাছে তা অসহ্য মনে হল, তিনি জননী ধরিত্রীর গর্ভে প্রবেশ করলেন কিন্তু 'তখনও তাহার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত' (ভর্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্)। এই চিত্রটির মধ্যে অনন্তকাল যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-উপন্যাসে মৃত্যুকালে ভ্রমর স্বামী গোবিন্দলালকে বলেছিল, 'আশীর্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই'। স্বামিগতপ্রাণা ভ্রমর স্বামীর পাপ ক্ষমা করতে পারল না, তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারল না, এমন কি মৃত্যুমুহূর্তেও কঠোরতা ত্যাগ করতে পারল না, এখানেই উপন্যাসের একটি মুহূর্ত অনন্ত মুহূর্ত হয়ে গেল।

আলোচনার শেষ দিকে লেখকের রসদৃষ্টি দার্শনিক ভাবনায় বিলীন হয়েছে। চন্দ্রনাথের মন্তব্য, কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই কবিরা কালকে বেঁধে ফেলেন—'ঈশ্বর অনন্ত মুহূর্ত'।

'পাখীটি কোথায় গেল?' একটি সুন্দর রসপ্রবন্ধ। অসীম মমতা দিয়ে একটি পাখি পোষা হয়েছিল। সে লেখক ও তাঁর পরিবারের অন্যদের 'হৃদয় খাঁচায়' স্থান পেয়েছে। ক্রমে অনন্ত আকাশের স্বপ্ন ভুলে 'পাখী এখন খাঁচার নেশায় ভোর'। প্রবন্ধের শেষাংশে এই পাখির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লেখকের মন দার্শনিক ভাবনায় পূর্ণ হয়েছে। ক্ষুদ্র পাখি আজ মৃত্যুর সরণি বেয়ে অনন্ত হয়ে উঠেছে। লেখকের দৃষ্টিতে সমস্ত প্রকৃতি আজ পক্ষীময়। সঙ্গে সঙ্গে লেখকের অন্তরও অনন্তময় হয়ে উঠল। তুচ্ছ বস্তুর সূত্র ধরে চন্দ্রনাথের ভাবনা এখানে সহজ দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ। এই জাতীয় মিশ্ররীতির অনেকগুলি প্রবন্ধ চন্দ্রনাথ লিখেছেন।

'ছায়া' প্রবন্ধটিও দার্শনিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ। প্রচলিত ধারণা 'ছায়া কিছুই নয়, অতি অসার, অতি অপদার্থ'। চন্দ্রনাথের মতে, ছায়া প্রাণময়, নিয়ত পরিবর্তনশীল। দিকচক্রবালে সূর্যের নিয়ত স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে ছায়ার আকৃতি পালটায়—কখনও দীর্ঘ, কখনও ক্ষুদ্র, কখনও সোজা, কখনও বাঁকা। সজীব পদার্থের মতই সে ক্রিয়াচঞ্চল। বলা বাহুল্য চন্দ্রনাথের এই আবিষ্কারে স্বকীয় চিন্তার পরিচয় আছে। বৃক্ষ স্থূল, বস্তুময় ও স্পর্শযোগ্য; বৃক্ষের ছায়া সূক্ষ্ম, কল্পনাময় ও স্পর্শাতীত। বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষের আত্মা—'স্বপ্নবৎ বৃক্ষত্ব মাত্র'।

জড়বস্তুকে ছায়াবিশিষ্ট করে ঈশ্বর এই জগতের মাঝখানে আর একটি ছায়াময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ছায়া আত্মত্যাগের ফল। গাছ তার রঙ,

স্থূলতা লাবণ্য তেজ রস ফুলের সৌরভ ফলের সুস্বাদ ত্যাগ করে ছায়া হয় এবং তখনই সে আতপতাপিত পথিকের শান্তির আশ্রয় হয়ে ওঠে। বুদ্ধ ও চৈতন্য সংসার ঐশ্বর্য ভোগবিলাস ত্যাগ করে সূক্ষ্ম ছায়ারূপী হয়েছিলেন বলেই দুঃখতপ্ত মানুষকে আশ্রয়ছায়া দান করেছিলেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে চন্দ্রনাথ একটি অভিনব অথচ অব্যর্থ দর্শন পেয়ে গেছেন। যুবতী তার অঙ্গলাবণ্য ও যৌবনসৌন্দর্য সন্তানকে দান করে ছায়ারূপিণী জননী হন। তাই যুবতী অপেক্ষা জননী সুন্দর, বৃক্ষ থেকে ছায়া। মানুষেরও কর্তব্য সর্বস্ব ত্যাগ করে ছায়ারূপ ধারণ করা। তাতেই মনুষ্যজীবনের সফলতা।

'বউ কথা কও' প্রবন্ধে কমলাকান্তী ঢংয়ে 'লঘু সুরে গভীর কথা' বলা হয়েছে। লেখকের মতে বাঙালীর সনাতন গৃহবধূর ত্যাগ ও গৌরব বাংলার 'বউ কথা কও' পাখি অসীমলোকে প্রচার করে। বংশধারা রক্ষা হিন্দুর কাছে অতি পবিত্র কর্ম; বধূ সেই পবিত্র কর্মের সহায়ক বলে আমাদের পরিবারজীবনে বধূর স্থান অতি উচ্চে। উনবিংশ শতাব্দীতে অনেকেই গৃহ ও পরিবারজীবনের অবরোধ থেকে নারীমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন, চন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন গৃহ-অবরোধেই নারীজীবনের সার্থকতা।

'দুই হিন্দু পত্নী' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের দুটি প্রধান নারী চরিত্রের আলোচনা। প্রবন্ধটি প্রথমে 'প্রচার'-এ (ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৫, পৃ ২১২-২০) প্রকাশিত হয়েছিল, পরে 'ত্রিধারা'য় গ্রন্থভুক্ত হয়। সংস্কৃত পুরাণ সংহিতায় নির্দিষ্ট পতিব্রতা নারীর মানদণ্ডে চরিত্র দুটির বিচার করেছেন লেখক। সূর্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই পতিমুগ্ধ ও ভক্তিমতী। তা সত্ত্বেও নারী চরিত্রের চরম পরীক্ষাকালে তাদের আচরণ ভিন্ন হল। সূর্যমুখী স্বামীর মধ্যে আত্মবিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। তাই স্বামীর সুখ-কামনায় নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীর দ্বিতীয় বার বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। শেষে নারীর স্বাভাবিক সপত্নীবিদ্বেষবশত তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হল। শেষ পর্যন্ত সূর্যমুখীর মধ্যে 'যেটুকু আমিত্ব ছিল, প্রেমে যেটুকু স্বার্থের ভাঁজ ছিল' তা ত্যাগ করে তিনি স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন। সুতরাং চন্দ্রনাথের মতানুযায়ী, 'সূর্যমুখী প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শানুযায়ী পূর্ণমাত্রায় হিন্দুপত্নী অর্থাৎ প্রেমের চরমমূর্তি'।

ভ্রমরের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল পৃথক। সে স্বামীর অবৈধ প্রণয়কে ক্ষমা করে নি, পরুষকণ্ঠে তিরস্কার করেছে। 'তবে কি ভ্রমর

হিন্দুপত্নী নন ?' লেখকের মতে, ভ্রমরও হিন্দুপত্নী। স্বামীর অসামাজিক প্রেমের জন্য তার রাগ আছে কিন্তু স্বামীর প্রতি তার হৃদয়ে এখনও ভক্তি। বস্তুত ভ্রমর অধর্মের বিরোধী। তার জন্যই অধর্মাচারী স্বামীর প্রতি সে বিরূপ। এও প্রেমধর্মেরই লক্ষণ। এই প্রেমরহস্য একমাত্র হিন্দুপত্নীতেই দেখা যায়। সুতরাং ভ্রমরও হিন্দুপত্নীর আদর্শানুযায়ী নির্মিত। এখানেউল্লেখ করা যায়, পরবর্তীকালে হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৮৬৪-১৯২৬) বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন, 'ভ্রমর হিন্দুরমণীর আদর্শ নহে।'[১১]

'সুখের হাট ও সৌন্দর্যের মেলা' চন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দৃষ্টির পরিচয়বাহী প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির উপর অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) দাবী আছে। ডঃ কালিদাস নাগ সম্পাদিত 'অক্ষয় রচনা সম্ভারে'র প্রথম ভাগে (১৮৮৭ শকাব্দ, পৃ ১০৪-৮) রচনাটি স্থান পেয়েছে। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মনে করেন রচনাটি চন্দ্রনাথ বসুর হওয়াই সম্ভব। তিনি যুক্তিও দেখিয়েছেন যে, 'ত্রিধারা'য় গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার পরও দীর্ঘদিন অক্ষয়চন্দ্র জীবিত ছিলেন কিন্তু তিনি এই গ্রন্থভুক্তির কোন প্রতিবাদ করেন নি।[১২] রচনাটির বিষয় ও ভাষা বিচারে আমাদের মনে হয় রচনাটি চন্দ্রনাথ বসুর ভাবাই সঙ্গত।

প্রবন্ধটির উৎস রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) 'আলোচনা' (১২৯০) গ্রন্থের 'ডুব দেওয়া : এক কাঠা জমি' শীর্ষক রচনাটি। লেখাটিতে রবীন্দ্র-নাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ নেই, বরং সমর্থন আছে।[১৩] রবীন্দ্রনাথ এক বিঘা জমিতে বিশ্বদর্শন করতে বলেছেন, চন্দ্রনাথ সে বক্তব্যকে প্রসারিত করে বলেছেন : 'বিশ্বের প্রত্যেক বিঘাতে বা প্রত্যেক বালির কণাতে শুধু বিশ্ব নয়, স্বয়ং বিশ্বনাথ বর্তমান।' কণাতে বিশ্বনাথের দর্শনাকাঙ্ক্ষা থেকে বোঝা যায় চন্দ্রনাথের মনের একটি প্রান্ত রোমান্টিকতায় রঞ্জিত ছিল। ইংরেজ রোমান্টিক কবি কীটস বালুকণাতেই দেখতে পেয়েছিলেন cloudy symbol of high romance.

অবশ্য রোমান্টিক কল্পলোক নয়, ঈশ্বরানুভূতি লাভই লেখকের অন্বিষ্ট। তার ফলে রচনায় দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। লেখকের মতে, য়োরোপীয়রা চর্মচক্ষে জগৎদর্শন করে। এই কারণে তারা পার্থিব বস্তুকে সুন্দর ও অসুন্দরে বিভক্ত করে দেখে। ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গী তা নয়। আমরা বস্তুর রূপ দেখি না, দেখি বস্তুর স্বরূপকে। এজন্য প্রয়োজন যে অন্তর্চক্ষুর, তা আমাদের আছে। পার্থিব বস্তু মাত্রই আমাদের চক্ষে ব্রহ্মে আবৃত। রচনার

শেষাংশে লেখক aesthetic বা 'চিত্তরঞ্জনকারী' বিদ্যার আলোচনা করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানে তিনি স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেননি, তাঁর চিন্তা জাতিবৈরিতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এর ফলে লেখক বিতর্কাধীন মন্তব্য করেছেন, 'ইউরোপে মানবমনের আধ্যাত্মিকতা কিছু নিকৃষ্ট বলিয়া তথায় aesthetic বিদ্যার এত প্রাধান্য; ভারতে মানবের আধ্যাত্মিকতা বড়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া তথায় aesthetic বিদ্যা পরমার্থবিদ্যায় একরকম লয় হইয়া গিয়াছে। aesthetic বিদ্যাকে পরমার্থ বিদ্যার সম্পূর্ণ অধীন না করিলে আমরা মানবপ্রকৃতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারিব না।'[১৪]

বক্তব্যে একদেশদর্শিতার পরিচয় আছে। কারণ, পাশ্চাত্যে সৌন্দর্যতত্ত্ব অত্যুত্তম বিষয়। সেখানে অধ্যাত্মবিদ্যা স্বতন্ত্র বিদ্যাপ্রণালী; তাই সৌন্দর্যতত্ত্ব পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা পেয়েছে। ভারতে সৌন্দর্যবেত্তা আলংকারিকেরা অধ্যাত্মবিদ্যার সঙ্গে অন্বিত করে শিল্পসৌন্দর্যকে দেখায় আগ্রহী। কাব্যের আস্বাদ তাই তাঁদের কাছে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'তুল্য। চন্দ্রনাথ ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুসরণে কাব্যের মধ্যে অনন্ত বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে চান।

'ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা' প্রবন্ধটিতে চন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তার প্রকাশ। ভারতীয় দর্শনমতে জড়ের মধ্যেও চৈতন্য বর্তমান। তবে তা মুক্ত বাতায়নের অভাবে স্তব্ধীভূত হয়ে থাকে মাত্র। জড় একটি পরিবর্তনের চক্রপথ বেয়ে ক্রমোন্নতি লাভ করছে এবং 'আত্মার উপযোগী জড়ত্ব'-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ডারউইনের প্রসিদ্ধ ক্রমোন্নতি তত্ত্ব (১৮৫৯) উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানচিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কেউ কেউ ভারতীয় পুরাণে ও সাহিত্যে বিবর্তনবাদের সমর্থনও দেখতে পেয়েছিলেন; শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮) পতঞ্জলিতে দেখেছিলেন ডারউইনের অনুরূপ তত্ত্ব। সুতরাং চন্দ্রনাথ যখন বলেন, সমস্ত জড়জগতের আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা আছে তখন তা অবৈজ্ঞানিক মনে হয় না।

পরবর্তী জীবনে সাকারবাদী হলেও এখানে চন্দ্রনাথ নিরাকারবাদের সপক্ষে বলেছেন। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত বৃক্ষ-লতায়, সমুদ্র-সরোবরে, পাহাড়ে-পর্বতে, ভগবানের সৌন্দর্য দর্শন করে চক্ষুকে তৃপ্ত করেন, পাখির কূজনে নির্ঝরিণীর ঝর ঝর শব্দে, স্রোতস্বিনীর কল কল কল্লোলে ভগবানের মধুর সম্ভাষণ শ্রবণ করে কর্ণের তৃপ্তি সাধন করেন এবং পুষ্পের সৌরভে ঈশ্বরের সৌরভ গ্রহণ করা নাসিকার প্রিয় কার্য মনে করেন। প্রকৃত ভক্তের কাছে

সাকার ও নিরাকার উপাসনায় কোন প্রভেদ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অন্যতম বিরোধ ছিল নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম ও সাকারবাদী হিন্দুর মধ্যে। চন্দ্রনাথ রক্ষণশীল হিন্দু হয়েও ধর্মীয় উদার চিন্তার জন্য এখানে নিরাকার উপাসনার সার্থকতাও দেখিয়েছেন। তাঁর এই ধর্মীয় ঔদার্য পরবর্তীকালে ছিল না।

ভারতীয় মতে দেহ অপেক্ষা আত্মা, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন বেশি মূল্যবান। চন্দ্রনাথ এই প্রচলিত ধারণার সংশোধন চেয়ে বলেছেন : দেহকে ধ্বংস করা পাপ। 'নিকৃষ্ট দেহকে উৎকৃষ্ট করিয়া আত্মায় মিশাইয়া ফেলাই প্রকৃত ধর্ম ও মুক্তি।'

'ত্রিধারা'র দ্বিতীয় ধারায় যে তিনটি রচনা স্থান পেয়েছে সেগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য-কমলাকান্তের ধারায় লিখিত সুখপাঠ্য রচনা। 'কেতাব কীট'-এ গ্রন্থকর্তা ও কেতাব কীটের মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন। আলোচনার ঢংয়ে কমলাকান্ত ও বিড়ালের সংলাপের প্রভাব আছে। রচনাটি লঘুচালে সুরু হয়ে ক্রমে মননে গভীর হয়েছে। কেতাব কীট বই কাটে; কিন্তু কিছু কিছু বই আছে যা কেটে নিঃশেষ করা যায় না। সেগুলি মানবসমাজের স্থায়ী সম্পদ। যেমন, হোমার বাল্মীকি উপনিষদ ও শেকস্‌পীয়র। লঘুচালের রচনাতেও জগতের ক্লাসিক সাহিত্যগুলির সমাজ-গঠনের শক্তি ও ভূমিকা লেখক বিস্মৃত হন নি।

'ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা' সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক সাহেব[১৫] ও ত্রিবেণীবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মধ্যে কথোপকথনের ঢংয়ে লিখিত। বিষয়, ইতিহাসের সংজ্ঞা নিরূপণ। বিদেশি সাহেবের মতে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ভারতীয় পুরাণগুলি 'উপন্যাস', ইতিহাস নয়। কারণ ইতিহাসে প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয়; পুরাণাদিতে থাকে অতি-কথা বা 'মীথ'। তর্কপঞ্চাননের মতে, ভারতীয় পুরাণে গৃহস্থাশ্রমের জীবনপ্রণালী, জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক, রাজার রাজকার্য ইত্যাদি মানবজীবনঘটিত ও সমাজ সম্বন্ধীয় বহুবিধ তথ্য 'কল্পিত ঘটনা'দির সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে এবং যেহেতু সেগুলির মূল মানবতথ্য সুতরাং এগুলিকে 'ইতিহাস' বলতে বাধা কোথায়? সাহেব তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি দেখিয়ে বললেন যে, পুরাণাদিতে সব জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকে না যা ইতিহাসে থাকে। চন্দ্রনাথ সাহেবের এই মতটিকে নিয়ে লঘু পরিহাসের অবকাশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন, রামায়ণকে

ইংরেজি মতানুযায়ী ইতিহাস হতে হলে সেখানে থাকবে রামের জন্মস্থানের ভৌগোলিক বর্ণনা, জন্মসময়ের দিন ক্ষণ ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড, সূতিকাগারের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা, প্রসবকারিণীর নাম-ধাম, পুত্র হওয়ার সংবাদে দশরথের আনন্দ ও কণ্ঠমালা উপহারদান, সেই কণ্ঠমালার প্রকৃত ওজন ও মূল্য ইত্যাদি। তথ্যের এখনও বাকী আছে। রাজা দশরথ যখন 'কৈকেয়ীর কক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন হঠাৎ একজন পরিচারিকা কৈকেয়ীর গৃহাভ্যন্তর হইতে এক কুলা ছাই গৃহের বাহিরে ফেলিয়া দিল। ছাই উড়িয়া রাজার চক্ষে পড়িল। 'আঁখ গিয়া, আঁখ গিয়া' বলিয়া রাজা বসিয়া পড়িলেন' (পৃ ৮১)। ইতিহাসের তথ্যসন্ধানে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করলে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় চন্দ্রনাথ 'লঘু কল্পনা' অবলম্বনে এখানে তা দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে হিন্দী শব্দের আকস্মিক প্রয়োগে পাঠকের হাস্যধ্বনি উতরোল হয়ে উঠেছে। চন্দ্রনাথের রচনাবলীর সর্বত্র একটা seriousness আছে কিন্তু তিনি যে লঘুরস সৃষ্টিতেও সক্ষম ছিলেন তার প্রমাণ 'ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা'। তিনি তাঁর লঘু-রস-সৃষ্টি-ক্ষমতা অবারিত করেছিলেন পরবর্তীকালে রচিত 'পশুপতি সম্বাদ'-এ (১২৯০)।

চন্দ্রনাথের 'ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা'র সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য'-এর অন্তর্গত 'রামায়ণের সমালোচনা' নামিত লেখাটির কথা মনে পড়ে। উক্ত লেখাটির শিরোনামের নিচে বঙ্কিমও জানিয়ে দিয়েছেন—'কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত'।

'জীবনের কথা' মননধর্মী প্রবন্ধ। এখানে জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য রীতির জীবনী সাহিত্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে একজন মানুষের সাধারণ বা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়। চন্দ্রনাথ এই প্রণালীতে লেখা জীবনচরিতের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তিকে নয়, ব্যক্তিস্বরূপকে চিত্রিত করাই জীবনীকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতীয় পুরাণে গুরুভক্তি, মাতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, দানধর্ম, আত্মসংযম, আশ্রিতের প্রতিপালন ইত্যাদি যে নীতিমূলক কাহিনীগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি একেবারে 'অলীক বা কাল্পনিক নয়, সে সকল গল্প কল্পনারঞ্জিত ইতিহাস বা জীবনচরিত'। এই গল্পগুলির অবশ্যই একটি বাস্তব ভিত্তি ছিল কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ আজ বিস্মৃত বা বিলুপ্ত। ব্যক্তিবিশেষের কীর্তিই পুরাণে ধর্মকাহিনীরূপে রক্ষিত। এইভাবে

'ব্যক্তিবিশেষের জীবনের কথা জাতীয় জীবনের কথা'য় রূপান্তরিত হয়। এই প্রণালীতে জীবনচরিত লিখিত হলে য়োরোপীয় জীবনীগ্রন্থগুলিতে যে অহংকার, আত্মগরিমা ও আত্মাভিমানের প্রশ্রয় থাকে তা বর্জন করা যায়। বস্তুত চন্দ্রনাথের মতে 'ইউরোপীয় প্রণালীতে জীবনচরিত লিখিত না হইয়া প্রকৃত হিন্দুপ্রণালীতে জীবনচরিত লিখিত হয়, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়'। চন্দ্রনাথের এই অবৈজ্ঞানিক ও নীতিমূলক দৃষ্টি একালে সুধী সমালোচকের কাছে নিন্দিত হয়েছে।[১৬] কিন্তু চন্দ্রনাথের বক্তব্য সহৃদয় বিচারের অপেক্ষা রাখে। লেখক প্রবন্ধ মধ্যে রামমোহনচরিত, ম্যাসনকৃত মিল্‌টনের জীবনী ও জন স্টুয়ার্ট মিলের স্বরচিত জীবনীর উল্লেখ করেছেন। ম্যাসন তন্ময়পন্থী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনে সাত খণ্ডে মিল্‌টনের জীবনী সম্পূর্ণ করেছিলেন। এটি একটি স্মরণীয় কীর্তি। এ গ্রন্থে মিল্‌টনের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও বাদ দেওয়া হয় নি। চন্দ্রনাথের মতে তথ্যপুঞ্জের মধ্য থেকে ব্যক্তিস্বরূপকে অনেক সময় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। এই কারণে তাঁর কাছে প্রশংসা পেয়েছে জন স্টুয়ার্ট মিলের সংক্ষিপ্ত স্বরচিত জীবনী।

জীবনচরিত সম্পর্কে চন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন মন্তব্যের আশ্চর্য মিল বর্তমান। রবীন্দ্রনাথও য়োরোপীয় ধারায় ফলিত রীতির জীবনীসাহিত্যের বিরোধী। তিনি বলেছেন, 'য়োরোপকে চরিত বায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনমতে একটি যে কোন প্রকারে বড়লোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র গল্পগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করিয়া গোটা দুই ভল্যুম জীবনচরিত লিখিবার জন্য লোকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে।'[১৭] তাই রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের চরিতগ্রন্থে কবিজীবনের 'সত্যটিকে' খুঁজেছিলেন, ব্যক্তিজীবনের তথ্যপুঞ্জকে নয় এবং সেই জন্যই একটা প্রশ্ন করেছিলেন 'কবিরে খুঁজিছ তাঁহার জীবনচরিতে?' একই কারণে গোর্কির টলস্টয়-স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করে নি।[১৮] অবশ্য রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের মত পুরাণকে জীবনীর মর্যাদা দেন নি। তা সম্ভবও ছিল না। চন্দ্রনাথ যে পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে মূল্য দিয়েছিলেন সে দৃষ্টিভঙ্গী তিনি স্ব-কাল থেকেই পেয়েছিলেন। কেশবপন্থী ব্রাহ্মসমাজ বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মগুরুকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন। ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২-১৯১০) একই প্রেরণায় 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন'-এ কয়েকটি পৌরাণিক চরিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করে 'Outlines of Hindu

Celebrities' নামে প্রবন্ধ লেখেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের পৌরাণিক চরিত্রগুলির পুনর্বিচার সুরু হয়; চন্দ্রনাথ সেই ভাবনার শরিক।

'ত্রিধারা' গ্রন্থের তৃতীয় ধারার প্রথম প্রবন্ধ 'সিদ্ধিদাতা গণেশ'। এখানে একটি পৌরাণিক দেবতার অভিনব ব্যাখ্যান আছে। পৌরাণিক গণেশের মূর্তিতে 'স্থৈর্য ধৈর্য গাম্ভীর্য সংযম সতর্কতা ও চিন্তাশীলতা' প্রতিফলিত। তাই গণেশের মূর্তি কার্যসিদ্ধির সহায়ক। য়োরোপের অনুকরণে নব্যবঙ্গে যে ধর্মসংস্কার সমাজসংস্কার প্রভৃতি নানারূপ সংস্কার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে তার পশ্চাতে চন্দ্রনাথ চিন্তাশীলতার অভাব ও হঠকারিতার প্রতিফলন লক্ষ করেছেন। এই ব্যগ্রতা ও ব্যস্ততা ভারতীয় জীবনের অনুকূল নয়। সুতরাং গণেশের শান্ত শ্রী ও জাতির অন্তরে তার মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা কাম্য। পৌরাণিক গণেশমূর্তির এই যুগোচিত মানবীয় ব্যাখ্যার জন্য ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত রচনাটির প্রশংসা করেছেন।[১৯]

'বাঙ্গালীর প্রকৃত কাজ'* অংশত রাজনৈতিক চিন্তাজাত প্রবন্ধ। চন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতই চেয়েছেন প্রথমে জাতিগঠন পরে রাজনৈতিক অধিকার লাভ। এর বিপরীত হলে যে হাস্যকরতা দেখা দেয় তা বোঝাতে গিয়ে নিরন্ন বস্ত্রহীন গ্রামবাসী জনৈক মুকুন্দ ঘোষের কলকাতায় আগমন এবং 'উন্নতি বিধায়িনী' সভায় বক্তৃতা দিবার উল্লেখ করেছেন। এই সময়-সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ডের 'হাউস অব কমন্স'-এর সদস্য পদ প্রার্থী হন। 'সোমপ্রকাশ' (১৭ই অগ্রহায়ণ, ১২৯১) এই ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছিল প্রধানত দুটি কারণে: কোন ভারতবাসী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হলে 'ভারত সমাজের গৌরব বৃদ্ধি হইবে' এবং 'ভারতে সুশাসন সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়সমূহ' সভার সম্মুখে উপস্থাপিত হতে পারবে। চন্দ্রনাথ এই জাতীয় আবেগাত্মক মনোভাবকে প্রশ্রয় দেন নি; বরং তুলনায় চন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বস্তুনিষ্ঠ ও গঠনমূলক। তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'আমরা এখনও মানুষ হই নাই, জাতি হই নাই, এখন যদি আমাদের কিছু শক্তি থাকে তবে সে শক্তিটুকু আপনাদিগকে মানুষ করিবার কাজে ব্যয় না করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বার হওয়া প্রভৃতি মিছে কাজে ব্যয় করা কি বিজ্ঞের কাজ না দেশহিতৈষীর কাজ?'

'বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র' প্রবন্ধটি চন্দ্রনাথের মানসপরিবর্তনের ক্ষেত্রে

---

* লেখাটির উপর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দাবী আছে বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদা বেথুন সোসাইটিতে তিনি High education in India নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন (২৫শে এপ্রিল ১৮৭৮)। উক্ত প্রবন্ধে ভারতের সনাতন জাতিভেদের নিন্দা ছিল। এক্ষেত্রে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মননের শরিক। পরে তিনি শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতায় প্রভাবিত হন এবং আমাদের শাস্ত্রীয় নির্দেশগুলি যে অভ্রান্ত এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস জন্মায়। তখন তিনি জাতিভেদ সম্পর্কে তাঁর পূর্বমত সংশোধন করে 'নবজীবন'-এ (মাঘ ১২৯২) উপর্যুক্ত প্রবন্ধটি লেখেন। প্রবন্ধটি বঙ্কিম-চন্দ্রের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল।[২০]

প্রবন্ধের সূচনায় ইংরেজ ও ভারতীয় সভ্যতার পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে। ইংরেজি সভ্যতা প্রধানত ধনচর্চায় ও ভারতীয় সভ্যতা ধর্মচর্যায় আত্মনিয়োগ করেছে। কারণ, লেখকের মতে ইংলণ্ডের জীবন ও সমাজপ্রণালী সম্পূর্ণ-ভাবে পার্থিবতামূলক। তাদের কর্মক্ষেত্র প্রশস্ত; ইচ্ছামত বৃত্তিগ্রহণের স্বাধীনতা থাকায় তাদের ধনাকাঙ্ক্ষা নিয়ত বর্ধমান। কিন্তু আমাদের জীবনে পার্থিবতার স্থান সংকীর্ণ। 'পার্থিবতার আয়তন নিতান্তই মাপা-জোঁকা'। বৃত্তিবিভাগও সুনির্দিষ্ট। 'সেখানে পাশমোড়া দিবারও স্থান নাই'। এদেশে পার্থিবতা ও ধনাকাঙ্ক্ষা নিয়মিত হওয়ায় ধর্মচর্যায় সমান হবার অধিকার সকলেই লাভ করেছে। বর্ণভেদ প্রথায় মানুষ শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। চন্দ্রনাথ এই বিভাগের সুফল দেখতে পেয়েছেন। এই ব্যবস্থায় নিকৃষ্ট বর্ণ শ্রেষ্ঠ বর্ণের আচার ব্যবহার ও জীবন-প্রণালী অনুসরণ করে; ফলে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর জীবনপ্রণালী নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবনে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং একটি ঐক্যের সূত্র উভয় শ্রেণীকে সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। ইংলণ্ডে বর্ণভেদ না থাকায় মানুষকে বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বি-তার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু ভারতের বর্ণবিভক্ত সমাজে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয় থাকে না। এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বর্ণের শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনানুসরণের চেষ্টা করে। তার জন্যও সামগ্রিকভাবে সমস্ত সমাজের মান উন্নত হয়। বর্ণভেদ জনিত শিথিলগঠন সমাজব্যবস্থার জন্যই এইভাবে পর্যায়-ক্রমে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে।

সুতরাং চন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত, ইংরেজের বর্ণভেদহীন একাকার সমাজের অনুসরণ করা আমাদের অকর্তব্য এবং বাইরে থেকে এর পরিবর্তন চেষ্টাও কাম্য নয়। কেননা, শুধু উপদেশ বা উচ্চভাবের উপর সমাজ দাঁড়াতে

পারে না। 'সমাজকে বাঁধিতে ও সদাচার সম্পন্ন করিতে হইলে মুখের উপদেশও চাই···আবার বর্ণভেদ, পারিবারিক শাসন প্রভৃতির ঠেকাঠোকাও চাই।' বর্ণভেদ প্রথা সংরক্ষণ করতে চেয়ে চন্দ্রনাথ একটি যুগপ্রাচীন প্রথাকেই সমর্থন করেছিলেন কিন্তু প্রাচীন যুক্তিকে গ্রহণ করেন নি; আধুনিক প্রণালীতে যুক্তি সাজিয়ে প্রাচীনকে সমর্থন করেছেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'নবজীবন' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩) পত্রিকায় লেখেন 'জন্তুধর্মী মানব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। তার প্রতিবাদে পরের মাসে চন্দ্রনাথ লেখেন 'দেবধর্মী মানব' ('নবজীবন', আষাঢ়, ১২৯৩)। অক্ষয়চন্দ্র মানুষকে পক্ষিধর্মী, পশুধর্মী ও সর্পধর্মী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনায় লেখকের একপ্রকার 'সিনিসিজম' প্রকাশিত। অন্যদিকে চন্দ্রনাথের মতে মানুষ প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—অন্নপূর্ণাধর্মী, দিক্‌পালধর্মী ও নারায়ণধর্মী। নিজের চেনাজানা মানুষের মধ্য থেকেই তিনি উদাহরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। ফলে প্রবন্ধ তত্ত্বপ্রতিপাদনে গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে নি, বরং তাতে নীতিগল্পের আমেজ এসেছে। তথাকথিত প্রগতির জন্য সমাজ থেকে এই জাতীয় মানুষগুলির ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য লেখক দুঃখ বোধ করেছেন।

'পাপ পুণ্য' মননসমৃদ্ধ প্রবন্ধের সুন্দর উদাহরণ। প্রচলিত পাপ ও পুণ্য চেতনা সম্পর্কে চন্দ্রনাথ যে আলোচনা করেছেন তা তাঁর স্বকীয় চিন্তায় ভাস্বর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইহমুখী চিন্তাধারায় পাপ পুণ্যের স্থান ছিল না। ইয়ং বেঙ্গল দল হিন্দুধর্ম বিরোধী আহার গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন এবং তাঁরা হিন্দুর আচারধর্ম জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেছিলেন। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন তাঁদের আচার আচরণ নিয়ে পুনর্বিচার সুরু হয়, তখন পাপ পুণ্য সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা দেখা দিল। চন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন অথচ 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠীর অন্যান্যরা এ ব্যাপারে নিস্পৃহতা দেখিয়েছিলেন।

পাপ পুণ্যের যুগোচিত নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন চন্দ্রনাথ। তাঁর মতে যে কাজ মানুষকে পরমাত্মার নিকটবর্তী হতে সাহায্য করে তা পুণ্য এবং যে কাজ মানুষকে ব্রহ্ম থেকে দূরবর্তী করে তা পাপ বলে অভিহিত হয়। অথচ মানুষ সংস্কারবশতঃ গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন, ব্রত উপবাসকে পুণ্যসঞ্চয়ের উপায় বলে মনে করে। চন্দ্রনাথ এখানে প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী।

গঙ্গাস্নানে ভারতসভ্যতার সঙ্গে সংযোগস্থাপন, তীর্থদর্শনে কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা বা ব্রতপালনে সংযম শিক্ষা হলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষের মন যখন ভাবসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই মানবমনে পুণ্যের স্ফুরণ হয়। সুতরাং প্রয়োজন চরিত্রোন্নয়ন ও চিত্তশুদ্ধি। এগুলি ছাড়াই খাদ্যাখাদ্য বিচার, প্রতিমা প্রণাম বা ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি নিরর্থক। হিন্দুর আচরিত সংস্কারগুলির সংশোধন চেয়েছেন চন্দ্রনাথ এবং ধর্মের একটি তাৎপর্য আবিষ্কারও তাঁর লক্ষ্য। ধর্মীয় অনুশাসন বা শাস্ত্রনির্দেশ নয়, শেষ পর্যন্ত পাপ পুণ্য বিচারে মানুষের মনের উপর নির্ভর করেছেন লেখক। শাস্ত্রের উপর মানুষের মনকে স্থান দেওয়ার মধ্যে চন্দ্রনাথের 'রেনেসাঁসী' মন ধরা পড়েছে।

'ফুল ও ফল' (১২৯২) চন্দ্রনাথের পরিণত মনন ও দার্শনিক ভাবনায় চিহ্নিত। এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। 'ফুল' পর্যায়ের লেখাগুলি মুখ্যত রসপ্রবন্ধ ও 'ফল' পর্যায়ের লেখাগুলি প্রধানত বস্তুপ্রবন্ধ। বস্তুত চন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের ফুল ও পরিণত দার্শনিক চিন্তার ফল একই সঙ্গে এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। রোমান্টিক স্বপ্নময়তা এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির সঞ্চারে ভাষা অনেকক্ষেত্রে কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে। চন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সাফল্যের পরিচয় 'ফুল ও ফল' গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলিতে অনেকাংশে পাওয়া সম্ভব।

প্রথম রচনা 'ফুলের বৃন্ত' (ধ্যান)। রচনাটি 'বঙ্গদর্শন'-এ (মাঘ ১২৯০) 'আমার দেবতা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক নিজের নামের পরিবর্তে 'হিন্দু' এই স্বাক্ষর করেছিলেন; রচনায় অতিপ্রাকৃত আবহ সৃষ্টিতে লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ঈষদ্ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে— 'সন্ধ্যাবন্দনাদি করণার্থ নদীতীরে যাইতেছি। যাইতে যাইতে দেখিলাম, যেমন গাছের পাতা নিঃশব্দে পড়িয়া যায়, একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের একটা প্রকাণ্ড শাখা তেমনি নিঃশব্দে খসিয়া পড়িল। নদীতীরে গিয়া দেখি কল্লোলিনীর কায়া কিছু শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিঞ্চিৎ বিষণ্ণভাবে সন্ধ্যা বন্দনাদি আরম্ভ করিলাম। অকস্মাৎ একটা অতি কাতর, ক্ষীণ এবং মর্মভেদী স্বর শুনিতে পাইলাম। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখি সূর্যের রশ্মি মলিন হইয়া উঠিয়াছে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ...একটা অন্ধকার

সদৃশ অনন্তকায় পক্ষীর অশুভ কর্কশ গম্ভীর ডাক এই ভয়ংকরতা বাড়াইয়া দিয়া গেল' (পৃ ৪)। ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে এই রচনাভঙ্গী নিঃসন্দেহে সার্থক। এই ভয়ংকরের যবনিকা ছিন্ন করে লেখকের ধ্যানলোকে আনন্দময় পুরুষের আবির্ভাব হল। তিনি ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন।

'ফুল' (কোকিল) রচনাটি 'বঙ্গদর্শন'-এ (ভাদ্র ১২৮৯) প্রকাশিত হয়েছিল। রচনায় কোকিল সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিবাদ ধ্বনিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বসন্তের কোকিল' প্রথমে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয় (চৈত্র, ১২৮০); পরে এই অপূর্ব ব্যক্তিগত রচনাটি 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ (১৮৭৫) স্থান পায়। বঙ্কিম কোকিলকে অবলম্বন করে মানব সমাজ সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পরান্নভোজী, চাটুবৃত্তিধারী ও সুসময়ের বন্ধু মানুষকে কোকিল জাতীয় মনে করেছিলেন। 'তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।' বারুণী পুষ্করিণী তীরে অসময়ে কোকিলের কুহু ডাক যে বালবিধবা রোহিণীর মনের শূন্যতা ও বিরহবোধকে বাড়িয়ে দিয়েছিল তার অনবদ্য বর্ণনা বঙ্কিম দিয়েছেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-উপন্যাসে (দ্রঃ ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। চন্দ্রনাথ কোকিল সম্পর্কে বঙ্কিমের দুটি মতই মানতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, 'পরান্নভোজী সম্পন্নসুখপ্রিয় চাটুকারকে লোকে 'বসন্তের কোকিল' বলিয়া গালি দেয়, সেটা কোকিলের দুরদৃষ্ট নয় তো কি?' এবং তিনি অবিশ্বাস করেছেন, 'কোকিলের স্বর শুনিলে কেবল বিরহকাতরতা বৃদ্ধি হয় অথবা আসঙ্গলিপ্সার উদ্রেক হয়, মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বের দিকে ধাবিত হয়' জাতীয় মনোভাবকে। চন্দ্রনাথ কোকিলের ডাকের মধ্যে গভীরতর দার্শনিকতা খুঁজে পান। কোকিলের কুহু স্বর নিন্দনীয় নয়; বরং গভীর অর্থব্যঞ্জনার দ্যোতক—'স্ফোটের সংগীতাত্মক প্রতিকৃতি—অপূর্ব বিকাশের বিজ্ঞাপনী।' বিশ্বের বিকাশধারা ও বিবর্তনের সঙ্গে কোকিলের কুহুতানের গভীর যোগ। নগর জীবনের কুশ্রী কদর্য কোলাহল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে যখন কোকিলের ডাক শুনি তখন এক অপূর্ব একতান সংগীত ভেসে ওঠে। বিশাল বিশ্বের নিত্য অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে কোকিলের কু-উ ডাকে এক মহান ঐক্য সংগীত অনুভব করা যায়। কোকিলের ডাক জগৎব্যাপী মহা-অনৈক্যের মধ্যে বিশ্বের অন্তর্লীন ঐক্যমন্ত্রের আভাস দেয়। চন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তাই 'কোকিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মরূপ সংগীত'।

'অদৃষ্ট' প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন'-এ (শ্রাবণ ১২৮৯) প্রকাশিত হবার ৪ বৎসর পূর্বে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন ('বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১২৮৫)। উক্ত প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অদৃষ্ট-চেতনার পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা ছিল। চন্দ্রনাথ অনুরূপ উদ্দেশ্যেই 'অদৃষ্ট' নামিত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। য়োরোপীয়দের মধ্যে গ্রীকরা অদৃষ্টবাদী। তাদের কাছে অদৃষ্ট কঠোর মূর্তিতে আবির্ভূত—'সে মূর্তির কাছে গ্রীক মন্ত্রাহতের ন্যায়···যেন ভীষণ অজগর বেষ্টনে আবদ্ধ'। ভারতীয়রা অদৃষ্টের কল্পনাময় মূর্তি দেখেন—'সে অদৃষ্টের আকার নাই, মূর্তি নাই কিন্তু ধ্যান আছে'। এই কারণে চন্দ্রনাথ ভারতীয় অদৃষ্টবাদের মূলে 'এক অতলস্পর্শ কবিত্ব' লক্ষ করেছেন। অথচ আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার ফলে এদেশের মানুষের অদৃষ্টের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে। ডারউইন প্রভৃতি কয়েকজনের কয়েকটি 'নৃশংস মতের প্রাদুর্ভাবে' মানুষ এখন ইহজীবনের অতীত কিছু দেখতে পায় না। সুতরাং 'ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দাম্ভিক কথা'য় ভুলে ভারতবাসী যদি অদৃষ্টবাদকে ত্যাগ করে তবে তার দুঃখ হবে অপরিসীম। বলা বাহুল্য, লেখকের মনন যুক্তিপন্থা ত্যাগ করে ভাবাবেগকে আশ্রয় করেছে। না হলে তিনি দেখতে পেতেন গ্রীকদের অদৃষ্টবাদ অজস্র সাহিত্যিক সৌন্দর্যে যে ভাবে বিকশিত হয়েছে ভারতে তা হয়নি। ভারতীয় সাহিত্যে তার সীমাবদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায় মাত্র।

'ফুলের ভাষা' পর্যায়ের তিনটি লেখা—মন্দাকিনী, সুরধুনী ও ভোগবতী চন্দ্রনাথের মন্ময়পন্থী রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রচনাগুলি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় (ভাদ্র, আশ্বিন ১২৮৮ এবং বৈশাখ ১২৮৯) প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত'-এর প্রভাব বর্তমান। লেখাগুলিতে প্রাবন্ধিকের যুক্তিনিষ্ঠা অপেক্ষা লেখকমনের ভাবানুলেপন প্রাধান্য পেয়েছে। চন্দ্রনাথের ফুল-পর্যায়ের লেখাগুলির সঙ্গে বঙ্কিমের 'ফুলের বিবাহ' রচনাটির কথা মনে পড়ে। কিন্তু বঙ্কিমের লেখায় লঘু-কল্পনা প্রধান। সেখানে ফুলের বিবাহকে কেন্দ্র করে দরিদ্র ঘরের মেয়ের বিবাহ, তার সমস্যা, বরপণ, হাসিঠাট্টা ইত্যাদি রূপকচ্ছলে বর্ণিত। চন্দ্রনাথের দৃষ্টি অনেক গভীর এবং দার্শনিকতায় মণ্ডিত। চন্দ্রনাথ রোমান্টিক মনোধর্ম দ্বারাও আংশিকভাবে প্রভাবিত। ফুল তাঁর কাছে বিশ্বজীবনের বিকাশরহস্যের প্রতীক। এই তত্ত্ব তিনি যে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলেন তা

নয়, তাঁর উপলব্ধিলোকেও তা সত্য হয়ে উঠেছিল। সেজন্য এখানে তিনি যে আবেগ প্রাণিত ভাষা ব্যবহার করেছেন তা সুধী সমালোচকের প্রশংসা লাভ করেছে, 'লেখকের ভাষাও তেমনি (ভাবের মত) স্বচ্ছ গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় কলনিক্বণে প্রবাহিতা।'[২১]

একই প্রাণধর্মের লীলা নিয়ে ধরণীপৃষ্ঠে ফুল হয়ে ফোটে, ঊর্ধ্বে আকাশে তারা হয়ে ফোটে। এইভাবে আকাশ ও পৃথিবী এক সঙ্গে বাধা পড়েছে। ইতিহাসশূন্য সভ্যতাবিহীন আদিম যুগে মানুষ একই সঙ্গে পৃথিবী ও আকাশকে পর্যবেক্ষণ করত। সেদিন থেকেই 'ফুলের ডোরে আকাশ নীচ বাঁধা'। লেখক বলেছেন, মানুষ যেদিন ফুলকে চিনল, সেদিনই সে আপন পশুসত্তার মধ্যে মানবসত্তার স্ফুরণ অনুভব করেছিল। অনেকে মনে করেন, মরুভূমিতে ফুল ফুটলে তা অপচয় হয় মাত্র। কিন্তু চন্দ্রনাথ রুক্ষদর্শন প্রকৃতির বুকে কোমলতাময়ী ফুলের আবির্ভাব দেখে হিন্দুর শ্যামামূর্তি কল্পনার সার্থকতা বুঝতে পারেন। তিনি লিখেছেন, 'ফুল তুমি মরুভূমিতে ফুটিও, নহিলে মরুভূমি প্রাণশূন্য হইবে এবং মহাশক্তি শক্তিহীন হইবে। বিশ্ববন্দিত পৌরাণিক কবি ইহা বুঝিতেন বলিয়া বিকটদশনা, ভীমনয়না, খড়্গ-ধারিণী, অসুরঘাতিনী, রক্তাক্তকলেবরা, রণরঙ্গিণীকে কোমলতম নীলোৎ-পলসদৃশ অপরাজিতায় সুশোভিতা করিয়াছেন।' লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য আছে।

সাধারণত বলা হয়, ফুল কোমলতাময় ; সামান্য আঘাতেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। চন্দ্রনাথ এ মতেরও প্রতিবাদ করেছেন। সমুদ্রবক্ষে প্রবল ঝড়ে যখন জাহাজ ভেঙে যায়, মাস্তুল ভেঙে পড়ে, পাল ছিঁড়ে যায় তখন একটি ফুল অক্ষত অবস্থায় ভাসতে থাকে, তার একটি পাপড়িও ছেঁড়ে না বা খসে না। সুতরাং ফুল যে কোমল এ ধারণা ভ্রমাত্মক। চন্দ্রনাথ ভারতবাসীকে ফুলের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন, 'অতএব ভারত সন্তানগণ! যদি তোমরাও মাথায় ফুল পরিতে চাও, তবে দেহ মন প্রাণ সংকল্প করিয়া যাহাতে হৃদয়ের কোমলতা-গুণে এবং জগতের কর্মক্ষেত্রে বীরত্বগুণে মনুষ্য সমাজে পুরস্কৃত হইবার যোগ্য হও, সে চেষ্টা কর।' ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের নায়করা ভবিষ্যতের গৌরবময় ভারতের এক কল্পচিত্র আঁকতেন। চন্দ্রনাথ এখানে সেই vision বা দিব্যদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ফুল তাই তার বস্তুসত্তা হারিয়ে

নির্বস্তুক ভাবসত্তায় রূপান্তরিত।

আলোচ্য 'ফুলের ভাষা' রচনায় চন্দ্রনাথ কয়েকটি আশ্চর্য-সুন্দর বাক্-প্রতিমা ব্যবহার করেছেন যা উৎকলন করা যেতে পারে—

'প্রশস্ত সরোবরে যখন বড় বড় পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে, আর সেই পদ্ম ফুলে অসংখ্য ভ্রমর বসিয়া মধুপান করে তখন দেখিলে মনে হয় না কি যে, সরোবরের স্বচ্ছ জলে কত আগ্রীবনিমজ্জিতা সুন্দরী কাল চুল এলাইয়া দিয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া নিঃশব্দে আপন আপন রূপের কথা কহিতেছে? ঐ দেখ, একটি লতা একটা সরল দ্রুম বেষ্টন করিয়া বৃক্ষটিকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিতেছে। মন্দ মন্দ সমীরণে লতারাশি অল্প অল্প দুলিতেছে। লতার গায়ে এক একটি গুচ্ছে কতকগুলি করিয়া ঈষৎ লাল ফুল ঝুলিতেছে এবং বাতাসে অল্প অল্প নড়িতেছে। ঠিক বোধ হইতেছে যেন লতান্তরালে কত অনুপম রূপসী লুকাইয়া ছোট ছোট রাঙা করপল্লবগুলি বাহির করিয়া কি জানি কাহাকে খেলা করিতে ডাকিতেছে।'

সমাসোক্তি অলংকারের সার্থক প্রয়োগ আছে এখানে। চন্দ্রনাথের যে সৌন্দর্য দর্শনের তৃতীয় নেত্র ছিল এবং উপলব্ধ সৌন্দর্যকে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করার মত ভাষাচেতনাও ছিল তা উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকেই প্রমাণ করা যায়। সে যুগে একই বিষয় নিয়ে এই জাতীয় রসপ্রবন্ধ আরও রচিত হয়েছিল। বঙ্কিমের 'ফুলের বিবাহ' রচনাটির কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১১) 'তারা ও ফুল' ('নিশীথ চিন্তা'য় সংকলিত) নামে একটি সমধর্মী রচনা লেখেন কিন্তু কেউই চন্দ্রনাথের তুল্য সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি।

রেনেসাঁসের দৃষ্টি ইহমুখী। বাস্তব জগৎ ও জীবনকে বিশ্লেষণ ও তার রহস্য আবিষ্কারে রেনেসাঁসের লেখক-শিল্পীরা আগ্রহ দেখিয়েছেন। স্বর্গলোক বা পরলোক তাঁদের ভাবিত করে না কিন্তু মৃত্যু রহস্যময় বলেই তা আকর্ষণ করে। মৃত্যুর দুরবগাহ রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে না পেরে কেউ সংশয়বাদী হয়েছেন, কেউ অধ্যাত্মবাদী হয়েছেন আবার কেউ বা অবলম্বন করছেন রহস্যবাদ। চন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসু মন ভারতীয় চিন্তাক্ষেত্রে এর সুসমাধান পেয়ে গেছেন—শেষ পর্যন্ত তাই তিনি হয়েছেন পরলোকবাদী।

'ফল' পর্যায়ের চারটি প্রস্তাব চন্দ্রনাথের পরলোক বিষয়ে তীব্র কৌতূহলের চিহ্নবহ। প্রস্তাব চারটির মধ্যে 'জীবন ও পরলোক', 'ইহলোক ও পরলোক' ও 'পরলোক কোথায়' 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় যথাক্রমে পৌষ, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন ১২৮৯ সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়। 'ভালবাসা' প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রচার'-এ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানাশ্রয়ী চিন্তাকে অবলম্বন করেছিলেন। সেইজন্য ঈশ্বর বা পরলোক সম্পর্কে তিনি হয়ে পড়েছিলেন উদাসীন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়ে পড়েন এবং ক্রমে ক্রমে আত্মা ও পরলোক সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস জন্মায় (দ্রঃ 'ধর্মতত্ত্ব')। তা সত্ত্বেও পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। এই যুগের আর একজন চিন্তা-নায়ক ভূদেব মুখোপাধ্যায় অবশ্য হিন্দুর পরলোকবাদে দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ১৭।৭।৯১ তারিখে ডায়েরিতে লিখেছেন—'সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষস্বরূপ এই হিন্দুধর্মের মূল শিকড়—পরলোকে বিশ্বাস। এ শিকড় নষ্ট হইবার নয়, তবে গাছের গুড়িতে কাঠঠোকরায় দুই একটা ফুটা করিয়াছে মাত্র।'[২২]

চন্দ্রনাথ প্রথমাবধি ঈশ্বরবিশ্বাসী। প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে কালধর্মে তাঁর ঈশ্বরে অবিশ্বাস জন্মেছিল কিন্তু সংশয়ের সে কালো মেঘ কেটে যেতে সময় লাগে নি।[২৩] ঈশ্বরবিশ্বাসী চন্দ্রনাথ যে পরলোকবাদী হবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু চন্দ্রনাথের এই পরলোকচিন্তার পিছনে সমকালের থিয়োসফি আন্দোলনের একটি সজীব ভূমিকা আছে বলে মনে করি। এই আন্দোলনের সঙ্গে চন্দ্রনাথ সম্ভবত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না কিন্তু সেকালের অনেকেই থিয়োসফি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্ণকুমারী দেবী বেঙ্গল থিয়োসফি সোসাইটির উৎসাহী সদস্য ছিলেন। চন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত করতেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত অ্যানি বেশান্তের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। শ্রীমতী বেশান্তের 'Death and After' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। থিয়োসফি আন্দোলনের একটি প্রধান বিষয় হল পরলোকচর্চা। এঁদের চিন্তাধারার বিপরীত মতবাদও তৎকালের কোন কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'আর্যদর্শন' (অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১২৮৩) পত্রিকায় পূর্ণচন্দ্র বসু (১৮৪৭—?) 'পরলোক ও সমাজ'

নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পূর্ণচন্দ্র সেখানে পরলোক বিশ্বাসকে অমূলক ও সমাজোন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বলে মন্তব্য করেছিলেন। পরলোক-চিন্তা মানুষকে ইহবিমুখ করে যা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর। তাই 'পরলোক ও সমাজ' প্রবন্ধের লেখক পরলোক বিশ্বাসকে বর্জন করতে বলেছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পরলোকবাদকে ভিত্তি করে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি পরলোকবাদের 'তিনটি হেতু' দেখিয়েছেন—'প্রথম, বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা, দ্বিতীয়, কর্মফলভোগ; তৃতীয়, আত্মার অমরতা'। মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রবল, মৃত্যুতে জীবনের সমাপ্তি একথা বিশ্বাস করতে মানুষ ভয় পায়। কর্মের ফলভোগ অপরিহার্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলছে, 'কর্ম ও শক্তি একই বস্তু, শক্তির বিনাশ নাই'। সুতরাং বৈজ্ঞানিক মতানুসারেও পরলোক কর্মফলবাদের অপরিহার্য ফল। আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে চন্দ্রনাথ নিঃসংশয়। তিনি বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস যে, দেহান্তে আত্মা জীবিত থাকে'। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানীদের সন্দেহমূলক মতবাদকে তিনি শ্রদ্ধাযোগ্য মনে করেন নি।

'জীবন'-এর সংজ্ঞা চন্দ্রনাথের কাছে ব্যাপক। সেখানে ইহলোক ও পরলোক, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ভেদ নেই—সব কিছু এক অনন্ত বিশাল জগতের অন্তর্ভুক্ত। এই বিশাল বিস্তৃত জীবনে পরলোকের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অবান্তর; কেননা, ইহলোকের সঙ্গে পরলোক যে আছে তা স্বতঃসিদ্ধ। ('জীবন ও পরলোক') লৌকিক হিন্দুধর্মে, খ্রীষ্টধর্মে ও ইসলাম-ধর্মে পরলোককে ইহলোক থেকে অধিক বা অল্প পরিমাণে পৃথক্ বিবেচনা করা হয়। তার ফলে পারলৌকিক সুখের আশায় ইহলোকের প্রতি আস্থাহীনতা দেখা দেয় যার জন্য ইহলোকের অনগ্রসরতা ঘোচে না। চন্দ্রনাথ পরলোকবাদী হলেও তাঁকে ইহলোককে ত্যাগ করতে হয়নি। চন্দ্রনাথের মতে, 'পরলোককে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্পূর্ণভাবে অস্বাভাবিক ক্রিয়া'। যেহেতু জগতে প্রত্যেক অবস্থা তার পূর্ববর্তী অবস্থার 'সম্পূর্ণ অনুযায়ী'। সুতরাং 'বিচ্ছেদশূন্যতা একটি প্রাকৃতিক অভ্রান্ত নিয়ম'।

তাহলে মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে কেন? চন্দ্রনাথের মতে তার কারণ খ্রীষ্টান

ধর্মযাজকরা মৃত্যুর একটি বিভীষিকাময় মূর্তি এঁকেছেন ; তাঁদের বর্ণিত নরক ভীতির উদ্রেক করে। অন্যদিকে ভারতীয় পুরাণসাহিত্যে আছে মৃত্যুর মোহনমূর্তি। একই ভালবাসার বস্তুগুলিকে পরলোকেও পাওয়া যাবে, এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে পরলোক আমাদের কাছে ভীতিজনক না হয়ে প্রীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। চন্দ্রনাথের এই তত্ত্ব অভিনব সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ধরনের যুক্তিবিস্তারে বক্তব্য গভীর ও গ্রহণযোগ্য হয় তার একান্ত অভাব লক্ষণীয়।

পরলোক কোথায় এ সম্পর্কে কিন্তু সকলেই নীরব। মানবজাতির পক্ষে পরলোক একটাই। 'হ্যামলেট' নাটকে শেকসপীয়র যার সম্পর্কে বলেছেন, 'Undiscovered country from whose bourne / No traveller returns.' সভ্যতাবিহীন আদিম মানব-জীবনে পরলোকের চিন্তা ছিল না। মানুষ যখন সভ্যতার স্তরে উঠেছে তখন থেকে ইহলোকের অতিরিক্ত একটি পরলোক কল্পনাও করেছে।[২৪] মানুষ একথাও বিশ্বাস করে যে, 'ইহলোকের পাপপুণ্যের ফলস্বরূপ সেই পরলোকে বাস করতে হয়'। খ্রীষ্টান ও ইসলামশাস্ত্র মতে স্বর্গ ও নরকের স্থান সুনির্দিষ্ট। মৃত্যুর পর আত্মা পূর্ব কর্মফল অনুযায়ী পরলোকের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠে। লৌকিক হিন্দুধর্ম মতেও পৃথিবীর উপরে স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ এবং পৃথিবীর নিম্নে নির্দিষ্ট নরক বর্তমান। 'সে বৈকুণ্ঠ ও নরকও পাপপুণ্যের ফল'।

হিন্দুশাস্ত্র মতানুসারে এর অতিরিক্ত আছে জন্মান্তরবাদ। এই জন্মের কর্মফলগুণে এই পৃথিবীতেই অপর জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়। চন্দ্রনাথ হিন্দুর এই 'কর্মমূলক পরলোকবাদ'-এর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু জন্মান্তর বলতে তাঁরা যে শুধুমাত্র পৃথিবীতে পুনর্জন্ম বুঝিয়েছেন সেটা সংগত মনে করেন নি। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পরকালবাদের ত্রুটি সংশোধনও তাঁর অভিপ্রায় ছিল। এই প্রেরণায় তিনি পরলোকতত্ত্বকে বিস্তৃতি দান করেছেন। চন্দ্রনাথের মতে, মৃত্যুর পর আত্মা শুধু পৃথিবীতে নয়, অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রেও জন্ম নিতে পারে। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রমতে, পৃথিবীতে থেকেও মানুষ মঙ্গলের বা বৃহস্পতির বা শনির দ্বারা যখন শাসিত হয়, তখন 'মরিয়া পৃথিবীতে না জন্মিয়া আমার মঙ্গলে (বা বৃহস্পতিতে বা শনিতে) জন্ম হওয়াই তো সম্ভব'। তিনি আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেছেন, 'মানুষ মরিয়া যে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে এমন

কোন কথা নাই। মানুষ মরিয়া কোন নক্ষত্রে, কোন সৌরজগতে যাইবে তাহার ঠিকানা নাই।' ('পরলোক কোথায়?')

একালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) লেখায় চন্দ্রনাথের উপলব্ধির অনুরূপ কথা দেখতে পাই। ইছামতীর তীরেব সে বৃহত্তর জীবনের স্বপ্ন দেখছে বিভূতিভূষণের নায়ক অপু। এর বর্ণনায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'দু হাজার বছর আগে হয়ত সে জন্মিয়াছিল প্রাচীন ঈজিপ্টে… আবার হয়ত জন্ম নিয়াছিল রাইন নদীর ধারে…হাজার বছর পর আবার হয়ত পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে…কিংবা কে জানে আর হয়ত এই পৃথিবীতে আসিবে না—ওই যে বটগাছের সারির মাথায় ক্ষীণ প্রথম তারাটি —ওদের জগতে অজানা জীবনধারার মধ্যে হয়ত এবার নবজন্ম'।[২৫] বস্তুত ভারতীয় জন্মান্তরবাদের মধ্যে সুদূর কল্পনা প্রসারের যে সুযোগ আছে তারই সরণি বেয়ে চলেছেন বলে চন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ—উভয়েই মহাবিশ্বের পটে কল্পনাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তার ফলে এই আকস্মিক অথচ তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্য।

পরলোকবাদী হয়েও চন্দ্রনাথ ইহজীবনকে ত্যাগ করেন নি। এক্ষেত্রে বঙ্কিমানুসরণ ঘটেছে অথবা বলা যেতে পারে এই ইহচেতনা উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতের একটি প্রধান ফসল। বঙ্কিম কোনদিনই পরলোক নিয়ে উৎসাহ দেখান নি। পরবর্তী জীবনে তিনি যে অনুশীলন বা 'কালচার'-তত্ত্বের কথা বলেছেন তা বঙ্কিমের নিজস্ব মননজাত। যার মূল কথা হল, 'প্রীতি সর্বব্যাপিনী, প্রীতিই ঈশ্বর। মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না' ('কে গায় ওই'?)। পরলোকবাদী হয়েও চন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর এই প্রীতিবাদ বা মানববাদকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, 'জগৎ ভাল কি মন্দ সে বিচার করিয়া জগৎকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিও না…সমস্ত জগৎ সেই সচ্চিদানন্দের, অতএব সমস্ত জগৎ ভালবাসার পাত্র, বাল্যকাল হইতে এই সংস্কার বদ্ধমূল করিও, হৃদয় সেই ভাবে ভরাইয়া তুলিও, তাহা হইলে ভালবাসায় বিঘ্ন দেখিবে না।' ('ভালবাসা') এই উদার চিন্তার মধ্যে চন্দ্রনাথ ইহলোক ও পরলোককে মেলাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

•

'কঃ পন্থাঃ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার (১৮৯৮) পূর্বে সাবিত্রী

লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। একদা অতীত ভারত ভূখণ্ডে বকরূপী ধর্ম 'ভরতকুল শিরোমণি' যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কঃ পন্থাঃ' অর্থাৎ কোন পথ অনুসরণীয়? যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করেছিলেন এই বলে যে, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'।[২৬] এই উত্তরে তিনি ভরত-বংশকে মহতী বিনষ্টি থেকে রক্ষা করেছিলেন। সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে আমাদের সামনে আবার সেই একই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, 'কঃ পন্থাঃ'? এবারকার প্রশ্নকর্তা বকরূপী ধর্ম নন, লেখক স্বয়ং এবং 'আমরা' সবাই। ভারত সভ্যতার সঙ্গে য়োরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে এই প্রশ্ন দিনে দিনে তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে যে, আমরা ভোগবাদী য়োরোপের অথবা ত্যাগব্রতী ভারতের কোন পথ অনুসরণ করব? প্রশ্ন কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু আজও যদি আমরা এর সুমীমাংসা করতে না পারি তাহলে জাতি হিসেবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই দেখা গেছে, গৌরবময় ঐতিহ্যে যার অতীত পূর্ণ অথচ সর্বব্যাপী অবক্ষয়ে যার বর্তমান লাঞ্ছিত এমন ভারতীয় জাতি হঠাৎ য়োরোপীয় ভিন্নধর্মী সভ্যতার মুখোমুখি এসে বিস্মিত বিমূঢ় ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে হীনপ্রভ ভারতীয়তা বিসর্জন দিয়ে অত্যুজ্জ্বল য়োরোপীয় সভ্যতা ও তার উপকরণগুলি সাদরে বরণ করে নেওয়া সুরু হল। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ইয়ং-বেঙ্গল গোষ্ঠী তো বটেই, এমন কি রামমোহন রায়ও (১৭৭৪-১৮৩৩) বেদান্তকে গ্রহণ করেও অশনে বসনে ভোগবাদী য়োরোপকেই অনুসরণ করেছিলেন। মধুসূদনের (১৮২৪-৭৩) কাছে পরাভূত শক্তিহীন জাতির মধ্যযুগসুলভ জীবনচর্যা বরণীয় মনে হল না। তিনি য়োরোপীয় জীবনধারায় অবগাহনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, যে জীবন লোভে ভোগে জয়ে সম্পদে প্রাচুর্যে শক্তিতে আদর্শস্থানীয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে একটি বক্তৃতায় ('The Anglo Saxon and the Hindu') তিনি দুই সভ্যতার বৈপরীত্যের কথা বলেছিলেন যদিও তাঁর অন্তরের সমর্থন ছিল নব্য ভোগবাদের প্রতি।[২৭] বঙ্কিমচন্দ্রও (১৮৩৮-৯৪) প্রথম জীবনে পাশ্চাত্যানুসরণের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাননি। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ('বঙ্গদর্শন', পৌষ ১২৮১) তিনি অনুকরণ বিশেষত ইংরেজের অনুকরণের পক্ষে তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন। এমন কথাও তাঁর মুখে শোনা গেছে যে,

'বাঙালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহা বাঙালীর ভরসা।' ('অনুকরণ') বঙ্কিমের এই মন্তব্য বাংলা সাহিত্যে য়োরোপীয় অনুকরণের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। কেননা তিনি নিজেও ইংরেজি রোমান্সের অনুকরণের জন্য নিন্দিত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যেন তিনি সপক্ষ সমর্থন করছেন। সাধারণভাবে বঙ্কিম কিন্তু য়োরোপীয় জীবনের ভোগবাদ ও অসংযত ধনাকাঙ্ক্ষাকে নিন্দিতই করেছেন যদিও 'কিঞ্চিৎ পরিমাণে ধনাকাঙ্ক্ষা সমাজের মঙ্গলকর'[২৮] বলে মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র শেষজীবনে ভারতীয় আদর্শানুযায়ী নিষ্কাম কর্মবাদকে য়োরোপীয় ভোগবাদ ও সম্পদবাদের উপর স্থান দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের তিনটি দশকে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের দিনে ভারতের ত্যাগ ও বৈরাগ্যময় জীবন অধিক মূল্য পেল, ধিক্কৃত হল ভোগমূলক ইহসর্বস্ব পাশ্চাত্য জীবন। বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) আদর্শবলিষ্ঠ ভারতীয়তার পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যানুকরণকে ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে বলেছিলেন, 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?' ('বর্তমান ভারত')।

চন্দ্রনাথের বক্তব্য এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে বিচার করা প্রয়োজন। অনেকে বলেন, পরলোকের দিকে পক্ষপাতিত্ব ও ইহলোকের প্রতি ঔদাসীন্যের জন্য হিন্দুজাতি পার্থিব সুখ সম্পদ শক্তি সাম্রাজ্য স্বাধীনতা হারিয়ে হৃতগৌরব হয়ে পড়েছে। চন্দ্রনাথ এই জাতীয় বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন, 'হিন্দুশাস্ত্রে রাজ্য পালন, রাজ্য রক্ষা, বাণিজ্যাদির দ্বারা ধনবৃদ্ধি, জীবিকা উপার্জন প্রভৃতি ঐহিক শৃঙ্খলাবৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উপদেশ ও ব্যবস্থাদি আছে।' আমরা যে আজ ইহজীবনের সুখ সৌভাগ্য ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত তার জন্য দায়ী হিন্দুশাস্ত্র নয়; শাস্ত্রীয় নির্দেশ অমান্য করার ফলভোগী আমরা। খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রেরও অন্তর্গূঢ় নির্দেশ ইহলোককে পরলোকের অনুবর্তী করা এবং জাগতিক ভোগস্পৃহাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। কিন্তু য়োরোপও ভারতের মত শাস্ত্রীয় নির্দেশ না মানায় অধঃপতিত। তাদের জীবনে ইহলোকচেতনা ক্রমশ বিশালকায় হয়ে মনুষ্যত্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। এর সপক্ষে লেখক কয়েকটি প্রমাণও উদ্ধার করেছেন

—এক, য়োরোপীয় জাতিবর্গের 'ভূমিতৃষ্ণা'। এশিয়া আফ্রিকার দুর্বল দেশগুলি তাদের ভূমিক্ষুধা মেটাবার উপকরণ। দুই, 'অর্থলালসা' এবং তা থেকে এসেছে বাণিজ্যমোহ। বাণিজ্যের নেশায় য়োরোপ আজ উন্মত্ত—'এই বস্তুপূর্ণ পৃথিবীটিকে যেন ভীমকায় অসুরের ন্যায় নিঙ্‌ড়াইয়া লইতেছে'। তিন, 'ভোগলালসা'—উত্তম খাদ্য পানীয় ও পরিধেয়ের সন্ধানে সে আজ সর্বগ্রাসী হয়ে উঠল। সাহিত্যও আজ তাদের ভোগস্পৃহা মেটাবার উপকরণ মাত্র।

য়োরোপ আজ তার মোহকর অত্যুজ্জ্বল বাহ্যসম্পদের উদাহরণ নিয়ে পার্থিব সম্পদে দরিদ্র, হৃতগৌরব ভারতবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। দুই পরস্পর বিরোধী জীবনপ্রণালীর মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রতি পদে। তাই সুপ্রাচীন কালের পুরাতন প্রশ্ন আবার উচ্চকিত হয়ে উঠেছে 'কঃ পন্থাঃ'। অর্থাৎ কোন পথ আমাদের অনুসরণীয় ?

একথা সত্য যে, য়োরোপ তার বিজিত দেশে শিক্ষার প্রসার, সুশাসনের প্রবর্তন বা সুখশান্তির বিধান প্রভৃতির ন্যায় কিছু ভাল কাজ করে কিন্তু বাণিজ্যের বৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি বা নিজের 'অন্নের ভাণ্ডার প্রশস্ত' করার জন্য যে সব নীতি গ্রহণ করে তা সর্বত্র সুনীতি অনুমোদিত নয়। 'বিজেতার হিতার্থ মহাপুণ্য সঞ্চয় করিলেও তাহার প্রতিকার হয় না'।

য়োরোপে বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে। যন্ত্রে প্রস্তুত বিলাস সামগ্রীর চটকে মুগ্ধ হয়ে মানুষ তা ক্রয় করে। দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে তার ফল হচ্ছে মারাত্মক। অপ্রয়োজনীয় বিলাস সামগ্রী ক্রয়ে ও ব্যবহারে তারা ক্রমে অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র, বিলাসী ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়ছে। সুতরাং য়োরোপে যন্ত্রসভ্যতার ক্রমবিকাশ আমাদের পক্ষে উপকারী না হয়ে অপকার করছে বেশি। কেননা, 'বিলাসের ন্যায় মনোহর শত্রু আর নাই।' 'ক্রেতা আহ্বানের অভিপ্রায়ে' য়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা নানাধরণের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ব্যবহার করে যা মিথ্যাচারে পূর্ণ। ক্রেতাকে প্রতারিত করে অর্থাপহরণের প্রচেষ্টাকে উন্নতির লক্ষণ বলা যায় না। ব্যবসার স্বার্থে এই মিথ্যাচারিতা জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডকে দুর্বল করে। মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার মূলে মিথ্যা বিজ্ঞাপনের ভূমিকা নগণ্য নয়। সেজন্য চন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতবাসীর নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী য়োরোপীয় কলকারখানায় প্রস্তুত অসার বিলাস দ্রব্য ও তার

বিজ্ঞাপন-প্রণালী।

লেখক স্বীকার করেন যে পৃথিবীতে বাস করতে হলে কিছু পরিমাণে পার্থিব অগ্রগতির প্রয়োজন আছে। খাদ্য পরিচ্ছদ বাসগৃহ নির্মাণ বা পালতোলা জাহাজের পরিবর্তে যন্ত্রচালিত জাহাজ তৈরি আবশ্যক। কারণ, তাতে গমনাগমন স্বল্প সময়ে ঘটতে পারে। এই উদ্বৃত্ত সময়টুকু মানুষ যদি ধর্মচিন্তা বা অন্যান্য সৎকর্মে ব্যয় করে তবে তা মঙ্গলপ্রদ। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ সেই সময়টুকু ব্যয় করছে ঘোড়দৌড়ে, ক্রিকেটে বা পানাগারে। বস্তুত পার্থিবতাকে একবার প্রশ্রয় দিলে আর ঠেকানো যায় না। একটির পর একটি পার্থিব বস্তু এসে চেপে বসে এবং তার চাপে মানুষের অবস্থা হয় সিন্ধবাদের বুড়ো নাবিকের মত। পার্থিব বস্তু সঞ্চয়ের নেশায় য়োরোপ আজ 'দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে' কেবল ছুটছে। কিন্তু কাম্য সুখ শান্তি স্বস্তি সন্তোষ তার নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। কেবল ইংরেজ নয়, ফরাসী-জার্মান-রুশ প্রভৃতি য়োরোপীয় জাতিগুলি পার্থিব লালসায় ও রাজ্য বিস্তারের নেশায় অন্তরে অন্তরে বুভুক্ষু ও অতৃপ্ত। পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়মূল হচ্ছে এবং শীঘ্রই একদিন সারা য়োরোপ জুড়ে সমরানল জ্বলে উঠবে। চন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ বাণী, 'অর্থলালসা সেই মহানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে।' ইতিহাসের খ্যাতিমান ছাত্র চন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ অভ্রান্ত। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সূচনা কালের (১৯১৪) ১৫-১৬ বৎসর পূর্বে লেখা 'কঃ পন্থাঃ' প্রবন্ধে তিনি যেন ভাবীকালের য়োরোপের সর্বনাশের রূপটি দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

য়োরোপীয় জাতিবর্গের মানসতা বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। চন্দ্রনাথের 'কঃ পন্থাঃ' লিখিত হবার ২৭-২৮ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তার সঙ্গে চন্দ্রনাথের বক্তব্যের সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'অনতি প্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করে তোলা যখন দেশশুদ্ধ সকল লোকেরই নিত্য সাধনা হয় তখন বিশ্বব্যাপী দস্যুবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।···বস্তুগত আয়োজনের অসংগত বাহুল্যকেই যে সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলে মানা হয় সে সভ্যতা অগত্যাই নরভুক্‌। নররক্ত শোষণের বিশ্বব্যাপী চর্চা একদিন আত্মহত্যায় ঠেকবেই, এতে আর সন্দেহ করা চলে না।'[২৯]

চন্দ্রনাথ লিখেছেন, পার্থিব ও বাহ্যবস্তুর চাপে য়োরোপ ক্রমে স্থূলদেহ

হয়ে উঠছে। বাইরে তারা স্বাধীন বটে কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারাও পরাধীন। 'যে পৃথিবীর মোহে মুগ্ধ, পার্থিব বাসনায় বিহ্বল তাহার আপনার উপর আধিপত্য নাই, সে নিজে নিজের রাজা নয়।...পৃথিবীতে তাহার মত ক্রীতদাস আর নাই।' জ্ঞানচালিত না হয়ে বাসনাচালিত হওয়ায় য়োরোপের জীবনে এই দুর্দৈব ঘটেছে। বাসনার বীজ উন্মূল করতে হবে, নাহলে ভয়ংকর বিনাশের হাত থেকে উদ্ধারের আশা নেই। য়োরোপের ললাটলিপি পাঠে চন্দ্রনাথ যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা ঐতিহাসিকের, সমাজবিজ্ঞানীর। জাতিবিদ্বেষের পরিবর্তে য়োরোপীয় সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের উদার চিন্তাও এখানে প্রকাশিত। শেষ পর্যন্ত য়োরোপীয় পথ 'অপ্রশস্ত, অনিষ্টকর ও অনবলম্বনীয়' বলে তা প্রত্যাখ্যান করতে বলেছেন লেখক।

একদিক থেকে ভারতীয়রা ভাগ্যবান; কেননা, বহিঃশত্রু দ্বারা বার বার অধিকৃত হলেও অন্তরে তারা মুক্ত। প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে তারাই। বাসনার বন্ধন তাদের নেই। 'ইহলোককে পরলোকের অধীন করা, পার্থিবতা পরিহার পূর্বক ঈশ্বরপরায়ণতা প্রবল করার' শিক্ষা হিন্দুর মজ্জাগত বলে সে বহির্জীবনে ব্যস্ততা বা ছুটে চলার নেশা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছে এবং অন্তর্জীবনে কাম্য সুখ, শান্তি ও সন্তোষ লাভ করেছে।

বর্তমান কালের সমস্যাটি অন্যরূপ। অনেকে বলেন, লোকসংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধির জন্য মানুষের অভাব বৃদ্ধি হয়। সুতরাং য়োরোপীয় পথে না গেলে আমাদের অভাব মিটবে না। এখান থেকে প্রশ্ন আসে, য়োরোপের পথে আমরা কতদূর যেতে সক্ষম? চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রকৃত অভাবের বৃদ্ধিবশতঃ পার্থিব বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হওয়াকে ইউরোপের পথে যাওয়া বলে না। অর্থলালসা ও ভোগলালসায় পার্থিব বিষয়ে মুগ্ধ হওয়াকেই ইউরোপের পথে যাওয়া বলে।' প্রকৃত অভাব মোচনের জন্য পার্থিব বিষয়ে মনোযোগী হওয়াতে ধর্মহানি হয় না, বরং অন্যথা হলেই অধর্ম, পাপ। বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই পার্থিব বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। কেবল পার্থিবতাকে অত্যধিক প্রশ্রয় দিলে আমাদের স্বধর্মচ্যুতি ঘটবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, য়োরোপ বাহ্য-সম্পদ আহরণে বাহ্যজ্ঞানশূন্য; প্রয়োজনের নির্দিষ্ট সীমারেখাটি পর্যন্ত তাদের

কাছে নিশ্চিহ্ন। কিন্তু পরলোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় ভারত হয়ত আবশ্যকমত থামতে সক্ষম হবে। কারণ 'পরলোকের পথ ধরিলে পার্থিব পথের সীমা বা দৈর্ঘ্য আপনা আপনিই নির্দিষ্ট হইয়া পড়ে।'

সুতরাং বহু পুরাতন প্রশ্ন 'কঃ পন্থাঃ?'-র উত্তরে আজও বলা যায় 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। ভারতই পৃথিবীর জাতিমণ্ডলীর মধ্যে নিজেকে মহাজন প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং চন্দ্রনাথের নির্দ্বিধ সিদ্ধান্ত, ভারতের অবলম্বিত পথই অনুসরণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য আর একটু এগিয়ে বলেছেন, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'। 'পৃথিবীর মহামোহে মুহ্যমান বাসনানলে দগ্ধপ্রাণ' য়োরোপ তাদের দুর্দিনে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। তাই মনে হয়, য়োরোপ এতদিন পরে তার বাঁচার প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর কঠিনতম প্রশ্নের উত্তরে আজও বলা যায়, 'মহাজনো যেন গত স পন্থাঃ'। 'শুধু আমাদের নয়, বিধাতা সমস্ত মানবকুলের অদৃষ্টে এই উত্তর লিখিয়া রাখিয়াছেন'।

বক্তব্যে কোথাও কোথাও হিন্দুয়ানির প্রভাব থাকলেও চন্দ্রনাথ অন্য জাতির প্রতি বিদ্বিষ্ট নন। তাই হিন্দুজাতির উন্নতি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির আত্মিক উন্নয়নের কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। এখানে তাঁর দৃষ্টি সংকীর্ণতামুক্ত ও উদার।

'শকুন্তলাতত্ত্ব'-এর লেখক 'সাবিত্রীতত্ত্ব' লিখেও সমকালে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 'সাবিত্রীতত্ত্ব'-এর প্রকাশকাল ১৩০৭ বঙ্গাব্দ। বস্তুত চন্দ্রনাথ বসুর যে কয়খানি গ্রন্থের কথা একালের মানুষের মনে আছে সেগুলির অন্যতম 'সাবিত্রীতত্ত্ব'। গ্রন্থরচনায় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী রচিত 'সাবিত্রীচরিত্র'-এর প্রেরণা' ছিল।[৩০] এখানে চন্দ্রনাথ 'শকুন্তলাতত্ত্ব'-এর ধারায় প্রধানত সাহিত্য বিচারের পথে যান নি; তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। সেজন্য সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই আলোচনায় তিনি পৌরাণিক সাবিত্রী-চরিত্রের আলোচনাসূত্রে হিন্দু বিবাহ, আহারতত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ, কর্মফলবাদ ইত্যাদি বহুবিধ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন এবং যে অনুসন্ধিৎসা দেখিয়েছেন তা সর্বক্ষেত্রে সাহিত্যজিজ্ঞাসুর নয়, সমাজবিজ্ঞানীর।

প্রথম অধ্যায়ে সাবিত্রীর জন্ম বর্ণনা সূত্রে লেখক প্রধানত সন্তানোৎপাদন সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। প্রাচীন

ভারতবর্ষে সন্তানলাভ ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত। রাজা অশ্বপতি দীর্ঘদিন কঠোর নিয়মাদি পালন, তপশ্চর্যা, ব্রতপালন ইত্যাদির দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তার ফলে দেবী সাবিত্রীর আশীর্বাদপূত যে সন্তান লাভ করেন তিনিই সাবিত্রী। জনক-জননী যে সন্তান কামনা করেন সে সন্তান হবে 'সুস্থকায়, বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী'। কারণ সন্তানই বংশধারাকে রক্ষা করে এবং বংশ উজ্জ্বল করে। সে কার্য 'রুগ্ন দুর্বল স্বল্পজীবী' সন্তান দিয়ে সম্ভব নয়। সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তান লাভের জন্য মিতাচার ও আহার-বিহারে যে সংযম প্রয়োজন সেকথা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে। চন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-৯৪) 'পারিবারিক প্রবন্ধ'-এর (১২৮৮) অন্তর্গত 'সন্তান পালন' নামিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'যদি একটি সন্তান জন্মিবার ৪/৫ বৎসরের মধ্যে পুনর্বার গর্ভধারণ না হয় তবে প্রসূতির শরীর ক্ষয় হয় না এবং সূতিকাগৃহেও এত অধিক সন্তানের অকালমৃত্যু সংঘটন হয় না।' ভূদেব ও চন্দ্রনাথকে আমরা প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল বলে জানি; কিন্তু সেটা তাঁদের আংশিক পরিচয়। সন্তানোৎপাদন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বেশ আধুনিক ও বিজ্ঞাননির্ভর। সুস্থ ও বীর্যশালী ভারতসন্তান জন্মগ্রহণ করে ভবিষ্যতে এক গৌরবময় ভারত সৃষ্টি করবে, এই 'দিব্যদর্শন'-এর অংশভাগী তাঁরাও।

বাঙালীর বর্তমান দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য কেউ কেউ দায়ী করেছেন প্রচলিত বাল্যবিবাহকে; এঁরা পাশ্চাত্যের অনুসরণে বয়স্কবিবাহ বা যৌবনবিবাহের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। চন্দ্রনাথ এই মতবাদের বিরোধী। কারণ আমরা শুধুমাত্র শারীরিকভাবে বলশালী ('ষণ্ডাগুণ্ডা') সন্তান আকাঙ্ক্ষা করি না, ধর্মশীল সন্তানই চাই। দেবভক্তি পূজার্চনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং ব্রত উপবাসাদি দ্বারা দেহশুদ্ধি দ্বারা ধর্মভাবে যদি আমরা সন্তানাকাঙ্ক্ষী হই, তবে সন্তানের সংখ্যাও স্বল্পতর হবে। অন্যথায় 'ধর্মজ্ঞানহীন অসংযমী আচারভ্রষ্ট স্বেচ্ছাপরায়ণ হইয়া ঘরে ঘরে হাঁসের পাল সৃষ্টি' হবে এবং আমাদের দুঃখদারিদ্র্য ও শক্তিহীনতা অব্যাহত থাকবে। য়োরোপ জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির চাপে জর্জরিত হয়ে কৃত্রিম জন্মশাসনের পথ গ্রহণ করেছে। চন্দ্রনাথ এই অধর্মীয় উপায়কে অগ্রাহ্য করে ভারতের 'ধর্মমূলক মানবোচিত প্রণালীতে লোকসৃষ্টি' করতে অনুরোধ

করেছেন। তিনি সগর্বে বলেছেন, ''কঃ পন্থাঃ'য় বলিয়াছিলাম, একদিন সমস্ত মানবকে ভারতের বাসনাবিজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে। 'সাবিত্রীতত্ত্ব'-এ বলিতেছি—একদিন সমস্ত মানবকে ভারতের লোকসৃষ্টি-বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে।' কারণ, শুধুমাত্র জৈবিক প্রয়োজনে সন্তানোৎপাদন নয়, ভারতীয় দৃষ্টিতে সন্তানসৃষ্টি ধর্মসাধনারই সহায়ক।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাবিত্রীর বিবাহ প্রসঙ্গে হিন্দু বিবাহ-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। পৌরাণিক ভারতে কন্যার পক্ষে বাল্যবিবাহ ছিল শাস্ত্র ও লোকাচার-সম্মত। অথচ প্রাক্-বিবাহ কালে সাবিত্রীর দেহ বর্ণনায় বলা হচ্ছে 'তাং সুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমা কাঞ্চনীমিব'। 'পৃথুশ্রোণীং' নারীর যৌবনচিহ্নের প্রকাশক। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যৌবনপ্রাপ্তির পরও তিনি অবিবাহিতা ছিলেন এবং নিজেই পিতার নিকট গিয়ে বিবাহেচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীনকালে 'যৌবনবিবাহ'-এর সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু চন্দ্রনাথের মতে মূল তাৎপর্য এর বিরোধী। য়োরোপীয় সমাজে নারীর যৌবনে পদার্পণমাত্র বিবাহের জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ পায় না। অথচ এখানে যথাসময়ে কন্যার বিবাহ দিতে না পারায় অশ্বপতির 'ব্যস্ততা, অস্থিরতা, চিন্তাকুলতা' প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একটি নিন্দনীয় ও গর্হিত কার্য করেছেন বলে মনে করেছেন। বস্তুত ভারতীয় সমাজে নারীর বাল্যবিবাহ বিধেয় বলে উল্লিখিত হয়েছে। এমন কি বেদনির্দিষ্ট বিবাহপ্রণালীও যে বয়স্ক বিবাহের পরিপোষণ করে না, একথা প্রমাণ করতে চন্দ্রনাথ ভুবনেশ্বর মিত্র রচিত গ্রন্থের* প্রমাণ ও যুক্তিধারার সহায়তা নিয়েছেন।

ঋগ্বেদ সংহিতায় (১০ম. ৭ অ. ৮৫ সূ.) ২১ ও ২২ ঋকে বিশ্বাবসুকে অবিবাহিতা বিবাহলক্ষণযুক্তা ও 'নিতম্ববতী' নারীর কাছে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বৈদিক যুগে যৌবনোদ্গমের পূর্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য ছিল না। কিন্তু এ বিচার যথার্থ নয়। 'ঋক্ দুটি অভিনিবেশ সহকারে পড়িলে (বোঝা যায়) যে, অশ্বপতির

---

* গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরূপ—
'হিন্দুকন্যার বিবাহ সংস্কার | কোনসময়ে হওয়া শাস্ত্রসম্মত | অর্থাৎ | ঋতুলাভের পূর্বে না পরে?' শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কর্তৃক | সংকলিত | কলিকাতা | ৩নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন প্রেসে | ইউ. সি. বসু দ্বারা মুদ্রিত | সন ১৩০৫ সাল | মূল্য চারি আনা।

কথার ন্যায়, উহাতেও স্ত্রীলোকের বিবাহের অবশ্যকর্তব্যতা জ্ঞান এবং যৌবনোদ্গমে তাহাদের বিবাহের জন্য ব্যস্ততা পরিব্যক্ত হইয়াছে।' কারণ শাস্ত্রবিদ্‌রা জানতেন যৌবনোদ্গমের পর নারী যদি অবিবাহিত থাকে, তাহলে তার দেহ যদি কলুষিত না-ও হয়, মন কলুষিত হবার সম্ভাবনা প্রচুর। সাবিত্রী মনে মনে সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন; সুতরাং বৎসরান্তে তার মৃত্যু ঘটবে একথা শুনে তিনি যদি অন্যপতি বরণ করতেন তাহলে তিনি কলুষিতমনা স্ত্রী হতেন। সাবিত্রীর বর অন্বেষণে গমনের মধ্যে শাস্ত্রানুমোদন ছিল। তিনি বিলাতি রীতির 'কোর্টশিপ' করতে যান নি, 'ধার্মিক, গুণবাণ, সুবংশজাত, রাজ জামাতা'র খোঁজেই গিয়েছিলেন। যাত্রাকালে অশ্বপতির কথাতেও জানা যায়, সাবিত্রীর নির্বাচনই শেষ কথা নয়, বিবাহে গুরুজন বা বয়স্কজনের অনুমোদনও প্রয়োজন। শাস্ত্রকারেরা পতিনির্বাচনে যুবতীর স্বাভাবিক আবেগপ্রবণতাকে কখনই উচ্চমূল্য দিতে স্বীকৃত ছিলেন না। সাবিত্রীবিবাহ প্রসঙ্গ অবলম্বন করে লেখক ভারতীয় বিবাহ-রীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে আগ্রহী; কিন্তু এ সম্পর্কে যে যুক্তিজাল তিনি বিস্তৃত করেছেন তা সর্বত্র স্বচ্ছ নয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাবিত্রীর বধূত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ মুখ্যত হিন্দুর গৃহবধূর আদর্শরূপ ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। বিবাহের পর রাজকন্যা সাবিত্রী পিতৃদত্ত মহামূল্যবান বস্ত্রালংকারাদি খুলে রেখে দরিদ্র শ্বশুরকুলের উপযোগী বল্কল ও কাষায় বস্ত্রাদি পরিধান করেন। পিতৃধনের গর্ব পরিত্যাগ করে শ্বশুর গৃহের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে একাত্ম হবার সাধনা হিন্দুর গৃহবধূর অন্যতম কর্তব্য। এ বিষয়ে সক্ষম হলে গৃহের সৌন্দর্য শত গুণে ফুটে ওঠে; অন্যথায় 'অসুখ অশান্তি কলহাদি'তে গৃহ পরিপূর্ণ হয়। আদর্শ হিন্দুবধূ সাবিত্রীর আর একটি কার্যেরও উল্লেখ করা যায়। যমের সঙ্গে কথোপকথনকালে তিনি প্রথম বরে চক্ষুহীন শ্বশুরের চক্ষু ও দ্বিতীয় বরে রাজ্যহারা শ্বশুরের রাজ্যপ্রাপ্তি ভিক্ষা করেন; তৃতীয় বরে তিনি ভিক্ষা করলেন পুত্রহীন পিতার জন্য পুত্র। পিতার সঙ্গে স্বাভাবিক ও জন্মগত সম্পর্কের উপরেও শ্বশুরের সঙ্গে বিবাহজনিত সম্পর্ককেও স্থান দেওয়া বাঙালী বধূধর্মের অন্যতম কর্তব্য। সাবিত্রী এ বিষয়ে বাঙালী বধূর আদর্শস্থানীয়া। আমাদের দেশের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই বাঙালীর চিরন্তন বধূধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিবার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেছেন বলে তিনি ঘোষণা

করেছিলেন। কারণ চন্দ্রনাথ মনে করেন আজকার পারিবারিক জীবনের বিশৃঙ্খলার কারণ 'বধূধর্মের বিস্মৃতি'। যৌথ পরিবার-জীবনের বর্তমান অবক্ষয়ের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণই মুখ্য। কিন্তু সে সম্পর্কে লেখক নীরব। বধূর পিতৃধনের গর্ব, অসূয়া ও স্বার্থপরতাকে তিনি পরিবার-জীবন ভেঙে যাবার পশ্চাৎবর্তী কারণ বলে মনে করেন। সমগ্র আলোচনায় সেজন্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ নেই। সামগ্রিক দৃষ্টিরও অভাব। তিনি প্রাচীন পারিবারিক জীবনের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নদর্শী।

চতুর্থ অধ্যায়ে সাবিত্রীর পাতিব্রত্য আলোচিত হয়েছে। সাহিত্যিক বিশ্লেষণের চেষ্টাও লক্ষিত হয়। পতিব্রতা স্ত্রী হিসাবে আমাদের সমাজে ও ধর্মজীবনে সাবিত্রী চরিত্রের একটি চিরস্থায়ী আসন আছে। পাতিব্রত্যের যে কঠোর পরীক্ষা তাঁকে দিতে হয়েছিল তা ভারতীয় জীবন ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। তিনি অমানুষিক প্রচেষ্টায়, কঠিন মনোবল ও বুদ্ধিকৌশলে মৃত্যুরাজ যমের হাত থেকে যেভাবে স্বামীকে উদ্ধার করেছিলেন সে কাহিনী সর্বজনবিদিত। এর পরেই তাঁর অনশনক্লিষ্ট দেহে ক্লান্তি এল, প্রতিজ্ঞাজনিত নির্ভীকতা দূর হল, দিগন্তপ্রসারী মহারণ্যের ভীষণতা দেখে তিনি ভীতা হলেন, চলার শক্তিটুকুও হারালেন। এদিকে সত্যবান প্রাণ ফিরে পেয়ে সত্বর পিতামাতার কাছে ফিরতে চান। তিনি ঈষদ্ রূঢ় ভাষায় বলেন—

যদি ধর্মে চ তে বুদ্ধির্মাঞ্চ জীবন্তমিচ্ছসি।
মম প্রিয়ং বা কর্তব্যম্ গচ্ছাবাশ্রমমন্তিবাৎ ॥

'পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যের দুইয়েরই প্রতি এই কটাক্ষে' সাবিত্রী দেহের জড়তা ও ক্লান্তি ভুলে উঠে দাঁড়ালেন এবং স্বামীর দেহ নিজের দেহে কোনক্রমে বহন করে অন্ধকারময় শ্বাপদসংকুল মহারণ্যের মধ্য দিয়ে কুটিরাভিমুখে যাত্রা করলেন।[৩১] চন্দ্রনাথের ভাষায়, 'জগতে পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যের অপূর্ব চিত্র রহিয়া গেল'। পাতিব্রত্য প্রমাণের ঝোঁকটুকু না থাকলে তিনিও দেখতে পেতেন, পতিব্রতা নারী তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমে আঘাত পেলে কিভাবে অভিমানে জ্বলে ওঠেন এবং দুঃসহ দুঃখ বরণ করে নীরবে তার প্রতিবাদ করেন। সাবিত্রী চরিত্রের সাহিত্যিক বিশ্লেষণের এই সুযোগটুকু চন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে গ্রহণ করলেন না।

সাবিত্রীর মন প্রতিজ্ঞায় অটল—মৃত স্বামীকে তিনি ফিরিয়ে আনবেনই। ব্রতপালনে উপবাসে দেবার্চনায় শরীর কাষ্ঠপুত্তলিকায় পরিণত হওয়া সত্ত্বেও

সত্যবানের মৃত্যুর জন্ম নির্দিষ্ট দিনটিতে তিনি স্বামীর সঙ্গে কাষ্ঠাহরণে চলেছেন। যাত্রাপথে সত্যবান পথিপার্শ্বস্থ প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চলেছেন; সাবিত্রী সে সব দেখছেন, স্বামীর সঙ্গে কথোপকথনও করছেন অথচ তাঁর মন 'সেই ভীষণ মুহূর্ত'-এর ভাবনায় অস্থির। আপন 'হৃদয়কে দুই ভাগে বিভক্ত' করে সাবিত্রীর পথচলার বর্ণনায় মধ্যে সাহিত্যিক বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চন্দ্রনাথ সাহিত্য বিশ্লেষণের দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন। মহাভারত কাব্যের সাবিত্রী চরিত্র তাঁর চোখে 'সাবিত্রী মা'। ভক্তির প্রাবল্য সাহিত্য বিশ্লেষণের পথ রুদ্ধ করেছে। লেখক নিজেই বলেছেন, 'সে কথার মাহাত্ম্য বিশালতা অপূর্বত্ব অলৌকিকতার ধারণা করিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই। ...তবে মায়ের কথা যেমন করিয়াই কহা যাউক, অপরাধ হয় না।' ভক্তিবাদীর কাছে সাহিত্য-বিশ্লেষণ আশা করা যায় না।

পঞ্চম অধ্যায়ে যম চরিত বিশ্লেষণে অভিনবত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। ভারতীয় পুরাণে ও লোক-কল্পনায় মৃত্যুদেবতা যমের একটি ভীতিজনক মূর্তি আছে। জীবনে আমরা তাঁকে দূরে রাখতে চাই; সাহিত্যেও তিনি উপেক্ষিত। চন্দ্রনাথ যমের বহিঃরূপ ও অন্তঃরূপের যে পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণযোগ্য কৃতিত্বের দাবী রাখে। মানুষ যখন যমের অধিকারে গিয়ে পড়ে তখন রোগভোগজনিত যন্ত্রণার পর তার শরীর বিকৃত হয়; 'সোনার বর্ণ কালি হইয়া যায়, বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু তখন কোঠরগত; কোকিলকণ্ঠ তখন ছিন্ন ছন্দহীন ভীতিজনক। ...অনুপম লাবণ্য শোভা সৌন্দর্য কান্তি কমনীয়তা সমন্বিত দেহ তখন কংকালমাত্র'। মৃত্যুর যখন এই মূর্তি তখন মৃত্যুদেবতার মূর্তিও যে বিকৃত সৌন্দর্যহীন ভীষণ ও বিরাটাকার হবে তা স্বাভাবিক। চন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ সাহিত্যজিজ্ঞাসুর।

যমের বাহ্যমূর্তির অন্তরালে একটি কমনীয় 'আভ্যন্তরিক মূর্তি' চন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন। ভারতীয় সাহিত্যে যমের একটি দ্বিতীয় রূপ বরাবরই ছিল। উপনিষদে যম-যমীর কাহিনীতে যম দেহলালসা মুক্ত উন্নত পুরুষ। কঠোপনিষদে বর্ণিত যম-নচিকেতা উপাখ্যানে ব্রহ্মজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার তিনি। সাবিত্রী উপাখ্যানে যমের উভয় মূর্তিই প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বহিঃরূপ ভীষণতায় মণ্ডিত—রক্তাম্বরপরিহিত, বদ্ধমুকুট, বিশালকায়, তেজস্বী, লোহিত-লোচন ও পাশঅস্ত্রধৃত। অন্যদিকে অন্তঃরূপে তিনি 'ধর্মোন্মাদ'; কৃপা

করুণা দয়া সৌজন্য শিষ্টতার প্রতীক। যমের ভীষণদর্শন মূর্তি দেখে সাবিত্রী র নারী হৃদয় কেঁপে ওঠে। আবার পরিশ্রান্তা সাবিত্রীকে দেখে তিনি যে স্নেহপূর্ণ মধুর ভাষায় কথা বলেছেন তা তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির কোমলতার ইংগিত দেয়। প্রথমবার, 'যতদূর আসা সম্ভব তুমি এসেছ', দ্বিতীয়বার, 'তুমি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছ' এই উক্তিগুলিতে তাঁর সৌজন্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে। চন্দ্রনাথ ভাষায় লঘুতা সঞ্চার করে বলেছেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাষায় যমকে perfect gentleman বলিতে হয়'।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাবিত্রীকথার অলৌকিকতার বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা লক্ষণীয়। 'হিন্দু পুরাণ অলৌকিকত্বের মহাগ্রন্থ'। এখানে আপাত অসম্ভব ঘটনাগুলি কোথাও তপস্যাবলে বা ব্রতপালনজনিত পুণ্যবলে, কোথাও বা যোগবলে বা ধর্মবলে সম্ভব হয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা যে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় 'পুরাণকারদের সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল'। সাবিত্রী পূর্বজন্মের কর্মফলে অকালবৈধব্যের নিয়তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আপন অর্জিত ধর্মবলে তিনি নিয়তিকে অতিক্রম করলেন। জড়জগতে যা অসম্ভব ধর্মবলের ক্রিয়ায় আধ্যাত্মিক জগতে তা সম্ভব হয়ে যায়।

সপ্তম অধ্যায়ে সাবিত্রী চরিত্রের বিশ্লেষণ। সাবিত্রী চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে নির্দেশ করাই এখানে চন্দ্রনাথের লক্ষ্য।

সাবিত্রী অশরীরী। 'তাঁহার শরীরে শারীর ধর্ম ছিল না বলিলেই হয়'। তাং সুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমাং কাঞ্চনীমিব। নিজের সমৃদ্ধ যৌবন সম্পর্কে তিনি উদাসীনা। তাঁর নিকট মনই প্রধান। বৈধব্যের ভয়ে তিনি সেই মনের বিপর্যয় ঘটাতে পারেন না। তিনি অপূর্ব শরীরিণী হলেও তাঁর মনে শরীরী ভাবনা নেই। কিন্তু আমরা জানি সাহিত্যে শরীরী মানুষই অভিষ্ট। চন্দ্রনাথ সাবিত্রীর সেই রূপটিকে অস্বীকার করেছেন।

সাবিত্রী মনোময়ী, সাবিত্রী চিন্ময়ী। তাঁর মনের শক্তি, গাম্ভীর্য ও অটলতা অসাধারণ। বিবাহের পর এক বৎসর ধরে তিনি যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন তা 'হাবভাবে'ও প্রকাশ করেন নি। বিধিনির্দিষ্ট ভয়ংকর মুহূর্তের পূর্বেও তিনি হাসতে হাসতে চলেছেন—'হসন্তীব'। সত্যবান বনের শোভায় মুগ্ধ হয়ে সাবিত্রীকে 'পুণ্যজননী নদী ও পুষ্পিত শৈলোত্তম সমস্ত' দেখবার জন্য বললেন। 'তিনি আপন হৃদয়কে যেন দুই ভাগে বিভক্ত

করিয়া একভাগে সেই ভীষণ মুহূর্তের ভাবনা লুকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন অপর ভাগে আনন্দের সৃষ্টি করিয়া পতির সহিত অরণ্যের রমণীয়তার কথা কহিতে লাগিলেন'। দ্বিবিধ হৃদয়ং কৃত্বা তস্থৌ কালমবেক্ষতী। সাবিত্রী মনকে বিভাজিত করে এগিয়ে চলেছেন; মনের একটি ভাগের যে চিন্তা ও ভাবনা তা অন্য ভাগ জানতে পারছে না। এই বিশ্লেষণে চন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আছে যদিও সর্বত্র এই বিশ্লেষণ তাঁর কাম্য নয়।

সাবিত্রী তেজোময়ী। সত্যবানের ভবিতব্য জানার পর পিতা অশ্বপতি যখন তাঁকে অন্য বর অন্বেষণ করতে বলেন তখন তিনি প্রজ্বলিত হলেন। মৃত্যুরাজ যমের সঙ্গে কথোপকথনে একই তেজস্বিতার প্রকাশ দেখি। কিন্তু তাঁর তেজস্বিতার সঙ্গে অপূর্ব নম্রতা ও শিষ্টতা মিশ্রিত ছিল।

চন্দ্রনাথের শেষ সিদ্ধান্ত, সাবিত্রী মানবজগতের উচ্চতম স্তরবাসিনী। তিনি উচ্চতম স্তরে থেকেও মানবজগতের সংসাররূপ নিম্নস্তরে আপনাকে সর্বান্তকরণে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। মানবজগতের এই উচ্চস্তরের জন্যই নিম্নস্তর বাসযোগ্যতা অর্জন করে। মানবজগতের উচ্চতম স্তর এবং নিম্নতম স্তরের সংযোগ আবশ্যক। সাবিত্রী এই উভয়স্তরের সংযোগবিন্দু। একদিকে তাঁর অলোকসামান্য গুণ; অন্যদিকে তিনি স্বামী-শ্বশুর-শ্বশ্রূ পরিবৃত সংসারের মধ্যমণি। তাই তাঁর দুটি রূপই সত্য যে, 'সাবিত্রী ব্রহ্মার পূর্ণ সৃষ্টি' এবং 'সাবিত্রী সংসাররূপিনী'।

'সাবিত্রীতত্ত্ব' চন্দ্রনাথের খ্যাতির সহায়ক। পৌরাণিক সাবিত্রীচরিত্রের তিনি যে নব ব্যাখ্যা দানে অগ্রসর হয়েছিলেন তা সমকালে প্রশংসিত হয়েছিল। রমেশ চন্দ্র দত্ত 'সাবিত্রীতত্ত্ব'-এর প্রশংসা করে লিখেছিলেন, **'Sabitri Tattwa will be considered as classics in our language by generation of our country.'**[৩২]

'বেতালে বহু রহস্য' একটি অভিনব রচনা। রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। তার আগে সাহিত্য সভায় ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ২৯-এ চৈত্রের অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। হিন্দীভাষায় রচিত 'বৈতাল পচীসী' গ্রন্থ অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) লিখেছিলেন 'বেতাল পঞ্চ-বিংশতি' (১৮৪৭)। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে চন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তক

হিসাবে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' পড়েছিলেন।[৩৩] দীর্ঘদিন তা নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশও পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনূদিত গ্রন্থের কাহিনীগুলি গালগল্প পর্যায়ের, বিশ্বাসযোগ্যতা বিশেষ নেই। গ্রন্থোক্ত গল্পগুলির মধ্য থেকে সুপরিচিত ভোজনবিলাসী ও শয্যাবিলাসীর গল্পদুটি চন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের অলৌকিক ক্ষমতার একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। এদের ঐন্দ্রিয়িক শক্তির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে লেখক হিন্দুর অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করেছেন এবং মানবজীবনের দুরবগাহ রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। চন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ হয়ত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়; কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যানের অভিনবতা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ভোজনবিলাসী সুপক্ক অন্নব্যঞ্জনের মধ্যে শ্মশানের গন্ধ পান। শয্যাবিলাসী রমণীয় শয্যায় শুয়ে শত থানা গদীর নীচেকার কেশের জন্য ক্লেশ বোধ করেন। এগুলি যথাক্রমে তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ত্বগেন্দ্রিয়ের সুতীক্ষ্ণ অনুভবশক্তির পরিচায়ক। অসভ্যাবস্থায় মানুষের কোন কোন ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ছিল অসাধারণ; অসভ্য তাতার দস্যুদের দৃষ্টি ছিল চিলের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং কেউ কেউ দূর থেকে জলের গন্ধ শুঁকতে পেত। কিন্তু উপযুক্ত ভোজনবিলাসী আদিমযুগের অসভ্য মানুষ নন, তারা সভ্যসমাজেরই মানুষ। সুতরাং তাদের ঐন্দ্রিয়িক শক্তির তীক্ষ্ণতা তাদের সামাজিক অবস্থায় অসম্ভব। সম্ভবত এখানে অতিরঞ্জন আছে এবং তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এর একটি বাস্তবভিত্তি অবশ্যই ছিল। কারণ 'অলীক বা অসত্যের কল্পনা একেবারেই ভিত্তিশূন্য হয় না'।

'বৈতাল পচীসী' বা তার পূর্বেকার পুরাণ কাহিনীগুলি যে সামাজিক পরিবেশে লিখিত হয়েছিল সে সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ছিল অনেক বেশি; বর্তমানে শরীর ও স্বাস্থ্য হারানোয় আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি অনেক পরিমাণে ক্ষয় পেয়েছে। সুতরাং পূর্বপুরুষদের ঐন্দ্রিয়িক শক্তির তীক্ষ্ণতার কথা আজ বিশ্বাস্য মনে হয় না। চন্দ্রনাথ এর জন্য দায়ী করেছেন আমাদের বর্তমান অধঃপতনকে। ইন্দ্রিয় শক্তি হ্রাসের পিছনে থাকে পুষ্টিহীনতা যা একটা দেশের অর্থনৈতিক অবনয়নের উপর নির্ভরশীল। লেখক এ দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় আলোচনায় গভীরতার অভাব সূচিত হয়েছে। চন্দ্রনাথ এজন্য দায়ী করেছেন বর্তমানকালে যন্ত্রের উপর অতিনির্ভরতাকে।

যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মেই ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে স্থূল ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে।

চন্দ্রনাথ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-৯৪) 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১২৯৯) থেকে একটি মত সশ্রদ্ধচিত্তে উৎকলন করেছেন। ভূদেব বলেছিলেন, বর্তমানকালে স্বল্প আহারের জন্য আমাদের স্নায়ু পেশী অস্থি শোণিত প্রভৃতি শরীরের সমস্ত উপকরণের বিকৃতি ও অপকর্ষ ঘটছে অর্থাৎ ক্রমে আমাদের জীবনীশক্তিই কমে যাচ্ছে। ভারতবাসীর জাতীয় স্বাস্থ্যের এই অবক্ষয় ভূদেবের মত চন্দ্রনাথও বেদনার্ত। ভূদেব বা চন্দ্রনাথ তাঁদের কল্পিত ভারতবর্ষকে খুঁজে পান না বলেই কখনও তারা বিক্ষুব্ধ, কখনও তাঁরা পাশ্চাত্যানুসরণকে দায়ী করেন। কিন্তু ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য গতি চোখে পড়ে না। চন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের জীবনীশক্তির বিলোপ হইতেছে, আমরা নির্জীব নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেহযন্ত্র বড় নীচু সুরে বাজিতেছে, ঘুণে আমাদের দেহের কাঠাম জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে সঙ্গে সঙ্গে মনের সুরও নামিয়া পড়িয়াছে…আমাদের পূর্বের সাহস, স্মৃতি, সামাজিকতা প্রভৃতি আর নাই।' প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্য গৌরববোধ এবং বর্তমানের বিবর্ণতায় দুঃখবোধ বঙ্কিম-ভূদেব সাহিত্যের একটি প্রধান সুর। একই ধারায় লিখিত এই গ্রন্থে চন্দ্রনাথের বেদনার্ত কণ্ঠস্বর আমাদের অন্তর স্পর্শ করে যায়।

জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ না করে, সভাসমিতি স্থাপন, কন্‌গ্রেসের অধিবেশন, চৈত্রমেলায় শিল্পপ্রদর্শনী ইত্যাদি করলে কোনও স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে না, এই ধারণা ব্যক্ত করেছেন চন্দ্রনাথ। স্বাস্থ্যহীন দেহে ইংরেজবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন বা ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্বাচিত হবার চেষ্টা নিরর্থক হবে। সুতরাং এখনই রাজনৈতিক অধিকার লাভে সচেষ্ট না হয়ে সুস্থ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জাতীয় জীবন গঠনে আমাদের প্রয়াসী হওয়া কর্তব্য। এ সম্পর্কে চন্দ্রনাথের বক্তব্য উৎকলন করা যেতে পারে—'আমরা যাহাতে পূর্ণজীবনীশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হই এবং পূর্ণজীবনীশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমনুষ্যত্ব লাভ করিবার উপযোগী হই, সকলে মিলিয়া এক মনে ধীর স্থির ভাবে সেই চেষ্টা করাই আমাদের এখনকার একমাত্র সর্বপ্রধান কাজ।' এখানে চন্দ্রনাথের যে দেশভাবনা ও জাতীয় চরিত্রোন্নয়ন সম্পর্কিত চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের

অনুরূপ ভাবনার সঙ্গে অনায়াসে যুক্ত করা যায়।

চন্দ্রনাথ শুধু ভাবাবেগদ্বারা চালিত হন নি, জাতীয়োন্নয়নের পথনির্দেশও করেছেন। তাঁর মতে আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্যহানির কারণ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, পরিশুদ্ধ জল ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। পাশ্চাত্য প্রভাবে বিলাস-দ্রব্যের অভ্যাস, চা-চুরুট প্রভৃতি 'দেহনাশক মাদক দ্রব্য'-এর ব্যবহার, সন্তানোৎপাদনে শাস্ত্রীয় নির্দেশ লঙ্ঘন ও স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। এজন্য বিদেশী শাসকের উপর নির্ভরতা ত্যাগ করে অত্যন্ত ধীরভাবে এবং ধৈর্য সহকারে এর প্রতিবিধান করতে হবে আমাদেরকেই। এর সুষ্ঠু সমাধান নির্ণয়ের উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। সুতরাং এ কাজে শিথিলযত্ন হলে চলবে না। চন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত নৈরাশ্যের বালুচরে নিক্ষিপ্ত হন নি; জাতি সম্পর্কে সজীব আশাবাদ ধ্বনিত করেছেন। আমরা এই দায়িত্ব পালনে সফল হবই, তিনি বলেছেন। কারণ, 'আমরা অতি উচ্চ, অতি পবিত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বহু কালের সংরক্ষিণী শক্তি আমাদের কুলভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। আমাদের এই কঠিন সমস্যার সুসমাধানে বিধাতা বোধ হয় আমাদের সহায় হবেন'। এ পর্যন্ত আলোচনার একটি ভাগ, প্রথম ভাগ।

আলোচনার দ্বিতীয় ভাগে ভোজনবিলাসী ও শয্যাবিলাসীর ঐন্দ্রিয়িক শক্তির সূক্ষ্মতার রহস্য ভেদ করতে গিয়ে চন্দ্রনাথ বংশধারা সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় উপস্থাপিত করেছেন। এই জাতীয় আলোচনার অন্য মূল্য থাক বা না থাক লেখকের বহু অধীতী মনের ছাপ আছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত ইংরেজ কবি টেনিসনের (১৮০৯-৯২) 'De Profundis' শীর্ষক কবিতার দুটি স্তবক উদ্‌ধৃত করেছেন এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকৃত তার বাংলা কাব্যানুবাদ উৎকলন করেছেন। চন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ অনুগ্রহ করে তাঁকে টেনিসনের কবিতার দুটি স্তবক অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। এ তাঁদের অক্ষুণ্ণ প্রীতিবন্ধনের স্মরণ-চিহ্ন। (টেনিসনের উক্ত কবিতাটি সম্পর্কে কবির অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছিল পূর্বে লেখা [আশ্বিন, ১২৮৮] একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি পরে 'সমালোচনা' ও 'আধুনিক সাহিত্য'-এ কিছু বর্জনসহ সংকলিত হয়েছে।)

শেষ পর্যন্ত চন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত: আর্কিমিডিস-নিউটন-ডারউইন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমদের জ্ঞান সংকীর্ণ; 'পৃথিবীর

উপর দু চারিটি স্থূলকথা জানিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু পৃথিবীর সাতখানা পর্দার নীচে কি আছে তাহা জানিও না'। তিনি বলেছেন, বিশ্বের কারণরহস্য ভেদ করতে হলে বিশ্বনাথের উপর নির্ভরতা ভিন্ন উপায় নেই। সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্যায় হবে না, ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা চাই। আজ আমরা অধঃপতিত, পূর্বগৌরব বিস্মৃত। অথচ একদিন পুণ্যে ও পবিত্রতায় ভারতবাসী পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় ছিল। আমাদের ঘরে ধন নেই কিন্তু যুগার্জিত সাধন আছে। সে জন্যে বিশ্বের রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব আমাদের উপরেই বর্তেছে। 'তাই বড় আশা যে, বিশ্বনাথের নিকট ভক্তিভরে অবনতশিরে সর্বান্তকরণে সেই অধিকার প্রার্থনা করিলে, কৃপা করিয়া তিনি আমাদিগের সেই পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত পুরী রক্ষা করিবেন।' বক্তব্যের ভক্তি ও ধর্মের রংটুকু বাদ দিলে চন্দ্রনাথের বক্তব্য কোন কোন স্থানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় অধ্যাত্মপ্রণালীর শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন; তারজন্য অবশ্য তিনি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানবিদ্যাকে লঘু করেন নি। (দ্র. 'শিক্ষার মিলন', "কালান্তর")

চন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনামূলক রচনার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ যেমন 'শকুন্তলাতত্ত্ব', সমাজতত্ত্ব আলোচনামূলক প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তেমনি 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২, দ্বি-স, ১৩১০ বঙ্গাব্দ)। বঙ্কিমচন্দ্র একদা আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না'।[৩৪] চন্দ্রনাথ এর প্রত্যুত্তরে বললেন, 'ইউরোপ যাহাকে ইতিহাস বলে আমাদের তাহা নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ আমাদের পূর্ণমাত্রায় আছে' (ভূমিকা, 'হিন্দুত্ব')। জাতির প্রাচীন ইতিহাস অন্বেষণে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও আলোচনায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর বরেণ্য মানুষেরা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। চন্দ্রনাথ এর বিরোধী। তাঁর মতে, 'প্রত্নতত্ত্বে প্রাচীনদের প্রাণ পাওয়া যায় না, দুই একখানা ভাঙা হাত পাওয়া যায় মাত্র'। আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস খুঁজতে হবে আমাদের 'সাহিত্য ও আচারানুষ্ঠানাদিতে'। অর্থাৎ য়োরোপীয় প্রণালী অনুসরণে পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার নয়, জাতির 'মানসিক প্রকৃতি'র মধ্যেই জাতির ইতিহাস সন্ধান করতে হবে। চন্দ্রনাথ জাতির প্রকৃত ইতিহাস সন্ধানের প্রেরণায় 'হিন্দুত্ব' লিখেছিলেন। তাই গ্রন্থের নামপত্রে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে

তিনি 'হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস' কথা কয়টি বসিয়েছেন। লেখক হিন্দুর 'ধর্মশাস্ত্র দেবতত্ত্ব দর্শন বিজ্ঞান সমাজপ্রণালী' ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় একত্রিত করে 'হিন্দুত্ব'কে একটি কোষগ্রন্থের আকার দিতে চেয়েছিলেন। এখানে সংকলিত প্রবন্ধগুলির সঙ্গে যে মূল সুর জড়িত হয়ে আছে তা হল হিন্দুর প্রাচীন গৌরবে গর্ববোধ। শুধু তাই নয়, চন্দ্রনাথ এটাও বেশ ভালভাবেই জানেন যে 'প্রাচীন বৈভবের গর্ব করা মনুষ্যত্ব নয়; প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই মনুষ্যত্ব।' সমস্ত গ্রন্থখানি লেখকের এই মনোভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ।

প্রথম প্রবন্ধ 'সোঽহং' দার্শনিক মননজাত সৃষ্টি। খ্রীষ্টধর্মকে এখানে কাল্পনিক প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড় করিয়েছেন লেখক এবং বলেছেন, খ্রীষ্টধর্মীয়দের মতে ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড থেকে, সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি থেকে পৃথক; অপরপক্ষে হিন্দুমতে এরা অপৃথক্—একই পদার্থে নির্মিত। নৈয়ায়িক পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি দেখিয়েছেন, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে পৃথক্ বলা সুষ্ঠু বিচারবোধের পরিচায়ক নয়। যেমন 'হ্যামলেট' নাটক শেকস্পীয়রের অন্যতম মহৎ সৃষ্টি কিন্তু 'হ্যামলেট' ও শেকস্পীয়র পৃথক তা বলা যায় না। কারণ 'হ্যামলেট'-এর মধ্যে যা প্রকাশিত হয়েছে তা 'শেকস্পীয়রের নিজত্ব বা শেকস্পীয়রত্ব'। এই গুণেই সাহিত্যসৃষ্টি 'হ্যামলেট' ও সৃষ্টিকর্তা শেকস্পীয়রের একত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই সাহিত্যিক সিদ্ধান্ত থেকেই মূল সিদ্ধান্তটিও পাওয়া যায় যে, মানব ও মানবস্রষ্টা একই—সোঽহং বা আমিই সে।

সোঽহং-বাদের বিরোধীরা বলেন, মানুষ যদি নিজেকে ব্রহ্ম বলে মনে করে তাহলে তার অহংকার সীমাহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। চন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'মানুষ আপনাকে ব্রহ্ম মনে করলেই তাহার অহংকার নাশ হইবে'। কারণ, শুধু ব্রহ্ম নয়, জগতের সকল পদার্থের সঙ্গেই যখন মানুষ একাত্মতা অনুভব করে তখন অহংকার বা আত্মাভিমান প্রকাশের অবকাশ থাকে না। একসময় য়োরোপে অনেক ধর্মপ্রাণ-ব্যক্তি ধর্মযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ধর্মের জন্যই আত্মবিসর্জন দেন নি, আত্মস্বাধীনতার ভাবও প্রবল ছিল। তাঁদের অসাধারণ বীরত্ব ও মহত্ত্বের মূলে ছিল অহংবোধ বা আত্মভাব। চন্দ্রনাথ ভারতীয় পুরাণে বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ ও বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর দ্বন্দ্বে য়োরোপীয় ধর্মযুদ্ধের অনুরূপ যুদ্ধের উদাহরণ দেখতে পেয়েছেন। প্রহ্লাদ য়োরোপীয় মহাপুরুষের মত আত্মস্বাধীনতার নামে নয়, বিষ্ণুর নামে সব যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। তাঁর কথায় ও ব্যবহারে

অহংবোধের লেশমাত্র ছিল না। ভারতীয় চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, অহংবিনাশী সোঽহংবাদ তাঁদেরই আবিষ্কার এবং তাঁদেরই আশ্রয়। অন্য ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে এই অতুলনীয় অত্যুচ্চ ভাবসম্পদের মর্মগ্রহণ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'লয়'। 'সাহিত্য'-এ (বৈশাখ, ১২৯৯) চন্দ্রনাথের 'লয়' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় (আষাঢ়, ১২৯৯) তার প্রতিবাদ করেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য চন্দ্রনাথ তার প্রত্যুত্তরে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ('সাহিত্য', শ্রাবণ ১২৯৯) তা-ও এখানে সংকলিত হয়েছে। 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থভুক্ত 'লয়' প্রকৃতপক্ষে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের মিলিতরূপ। 'সোঽহং' প্রবন্ধের বিষয়কে বিস্তারিত করে লেখক 'লয়' প্রবন্ধে লিখেছেন, পরব্রহ্মের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হওয়া মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য। পথ অত্যন্ত কঠিন, সাধনও দুঃসাধ্য। তা সত্ত্বেও মানুষ জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে সেই 'আশ্চর্য পরিণতি'র দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এজন্য মানুষকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। গুরুবাদকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন চন্দ্রনাথ। লয়-তত্ত্বে তিনি বলেছেন মানুষকে কঠোরকঠিন সাধনার পথে অগ্রসর হতে হবে। ঈশ্বর সাধনার এই কঠোরতা হিন্দুর সমাজ ও জীবন-প্রণালীতেও সঞ্চারিত হয়েছে। তাই তাঁর সমাজপ্রণালী অনেকক্ষেত্রেই (ব্রত, উপবাস, বৈধব্য পালন ইত্যাদি) নিষ্ঠুরতার নামান্তর। অথবা যা একই কথা যে, 'হিন্দুর কঠোরতা কঠিনতা নিষ্ঠুরতা সেই সচ্চিদানন্দের কঠোরতা কঠিনতা ও নিষ্ঠুরতার অনুরূপ'। ব্রহ্মের প্রকৃতিগত কঠোরতা দ্বারা হিন্দুসমাজ গঠিত। য়োরোপীয়রা পার্থিব সম্পদ আহরণের জন্য অসীম কষ্ট সহ্য করে, হিন্দুই একমাত্র ধর্মসঞ্চয়ের জন্য হাসিমুখে কষ্ট সহ্য করে থাকে। এই কঠিনতা কঠোরতা আমাদের রক্ষা করা কর্তব্য।

সগুণ অবস্থা থেকে নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া লয়-তত্ত্বের আর একটি অর্থ। কিন্তু তা হলে পৃথিবীর মোহ বা প্রকৃতির সৌন্দর্যোপভোগ পরিত্যাগ করতে হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসনে বসতে হয়। এই কারণে য়োরোপীয়দের কাছে হিন্দুর লয়-তত্ত্ব নিন্দিত হয়ে থাকে। চন্দ্রনাথের মতে এ অভিযোগের প্রকৃত ভিত্তি নেই। কারণ, আমাদের শাস্ত্রাদিতে জীবপ্রকৃতি উপেক্ষণীয় নয়; তাতে শিক্ষা ও শাসন দ্বারা জীবপ্রকৃতিকে

নিয়ন্ত্রিত করে ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলার নির্দেশ আছে।

দ্বিতীয় উপায়, 'আত্মসম্প্রসারণ সংশোধনার্থ পরার্থপরতার অনুশীলন'। আত্মপরতা মানুষকে সংকীর্ণ করে; পরার্থপরতার মধ্যে মানুষের আত্ম-সম্প্রসারণ ঘটে। পরার্থপরতার অনুশীলনের জন্য সমাজ অপরিহার্য। বিশ্বব্যাপী মৈত্রী শিক্ষার নিম্নতম সোপান আমাদের গৃহ ও সমাজ জীবন। চন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'গৃহ ও সমাজের মধ্য দিয়া না গেলে লয়ের পথে প্রবেশ করা একরকম অসম্ভব'। যেহেতু লয়-তত্ত্ব দীর্ঘ সাধনা সাপেক্ষ এই কারণে দীর্ঘজীবন লাভের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষাও হিন্দুশাস্ত্রের অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। আবার যেহেতু সমাজের ভিতর দিয়াই লয়ের পথে অগ্রসর হতে হয়, এজন্য সমাজজীবনকে দীর্ঘ করা আবশ্যক। এজন্য প্রয়োজন জাগতিক বিষয়ে উন্নয়নের সযত্ন প্রয়াস। এই সঙ্গে জাগতিক উন্নয়নের সীমা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি দেওয়াও প্রয়োজন। কারণ জাগতিক উন্নয়ন প্রয়াস সীমাতিক্রমী হলে জীবন জড়ত্বে জড়িয়ে যাবে। চন্দ্রনাথ তাই কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধে নন কিন্তু তার প্রয়োগ চেয়েছেন সীমিত ক্ষেত্রে।

চন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, লয়ের পথে যেতে হলে জীবনবিচ্ছিন্ন ত্যাগধর্ম গ্রহণ করা অপ্রয়োজনীয়। এর জন্য বিশ্বের সৌন্দর্য, কোমলতা, রমণীয়তা বা মাধুর্য ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রাচীন ও প্রধান কবি ও ঋষিরা তা জানতেন বলেই রামায়ণে ভাগবতে পুরাণে প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। আর সংসারত্যাগী মুক্তিকামী ঋষিদের 'তপোবনেই না বেশী ফুল কোটে, বেশী মৃগমৃগী খেলাইয়া বেড়ায়, বেশী কল্লোলিনীর কলকণ্ঠ শোনা যায়'।

রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'-র (আষাঢ়, ১২৯৯) 'চন্দ্রনাথ বাবুর স্বরচিত লয়-তত্ত্ব' নামে প্রবন্ধ লিখে চন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি এ সম্পর্কে যে অভিযোগগুলি উপস্থিত করেছিলেন তা চন্দ্রনাথ বসুর মুখেই শোনা যাক্:

'এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় গুটিকতক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ১. প্রথম আপত্তি এই যে প্রকৃত লয়-তত্ত্ববাদী লয় বলিতে আত্মসম্প্রসারণ বুঝেন না, লয়ই বুঝেন। অতএব লয়ে আত্মসম্প্রসারণ বুঝায় এই ধারণায় আমি

যে গৃহ ও সমাজের আবশ্যকতা নিরূপণ করিয়াছি তাহা ভুল হইয়াছে। ২. আর একটি আপত্তি এই যে, সগুণ ও নির্গুণ অবস্থার মধ্যে কোন রকম যোগ বা সাদৃশ্য নাই। অতএব সগুণ অবস্থা হইতে নির্গুণ অবস্থায় যাবার কোনও উপায়ও নাই এবং সেইজন্য সমাজে থাকিয়া পরার্থপরতার অনুশীলন নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্তির পক্ষে কিছুমাত্র ফলোপধায়ক হইতে পারে না। অতএব সগুণ হইতে নির্গুণ অবস্থার দিকে যাইবার একটি ক্রম প্রদর্শন করিয়া আমি সগুণ ও নির্গুণের একটা বিশ্রী খিঁচুড়ি প্রস্তুত করিয়াছি। ৩. আরও একটি আপত্তি এই যে, প্রকৃত লয়-তত্ত্বে বিশ্ব অসৎ এবং বিশ্বনাথের লীলা নয়। অতএব লয়-তত্ত্ব মানিতে হইলে পৃথিবীটা মরুভূমি হইয়া যায়।'৩৫

'সাহিত্য'-এ (শ্রাবণ, ১২৯৯) "আমার 'স্বরচিত' লয়-তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে চন্দ্রনাথ তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তিনটি খণ্ডন করতে চেয়েছেন। বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদের কাহিনীর সহায়তায় তিনি দেখিয়েছেন, ব্রহ্মের অন্যতম গুণ তার 'অপরিমেয় ব্যাপ্তি'—মানুষ যখন ব্রহ্মে লীন হয় তখন সে ব্রহ্মের ব্যাপ্তি লাভ করে। ব্যাপ্ত হওয়া, বিস্তৃত হওয়া এবং প্রসারিত হওয়া যেহেতু সমার্থক আত্মব্যাপ্তি না বলে আত্মসম্প্রসারণ বলে তাই তিনি ভুল করেন নি। মানুষকে যদি ব্রহ্মরূপে সম্প্রসারিত হতে হয় তবে তাকে গৃহ ও সমাজের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। গৃহজীবনে স্ত্রীপুত্র পিতামাতা পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করলে মানুষের স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা অনেক পরিমাণে কমে যায়। সমাজের মধ্যে একেই সঞ্চারিত করতে পারলে আত্মব্যাপ্তি বা আত্মসম্প্রসারণ আরও বেড়ে যায়। বস্তুত গৃহ ও সমাজের মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমে 'হ্রস্বমোহ' ও মোহমুক্ত হয়ে ব্রহ্মত্বে পৌঁছয়।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেছেন, ব্রহ্ম নির্গুণ বলার অর্থ, তিনি গুণহীন নন আবার সত্ত্ব রজ তমের অধীনও নন, অতীত। 'গৃহ ও সমাজে থাকিয়া পরার্থপরতার অনুশীলন দ্বারা রজ ও তম নাশ বা খর্ব করিয়া সত্ত্ব সংবর্ধিত করা ব্রহ্মত্বের দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে একটি অপরিহার্য কার্য।' সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যানুসারে তিনি যে সগুণ ও নির্গুণের 'খিঁচুড়ি' প্রস্তুত করেছেন তা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় অভিযোগ 'লীলা' কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? প্রত্যুত্তরে চন্দ্রনাথ বলেছেন,

যেহেতু জগতের মধ্য দিয়া ব্রহ্মের বিকাশ হচ্ছে সুতরাং তাকে ব্রহ্মের 'লীলা' বললে অসংগত হয় না। হিন্দু শাস্ত্রকার ও দার্শনিকরা যে জগৎকে মায়া বলেন, চন্দ্রনাথের মতে, তা কেবল ব্রহ্মের তুলনায়। অতএব গৃহ সমাজ মানুষ সবই যখন মানা হচ্ছে, তখন পৃথিবীটা মরুভূমি হল কোথায়? লেখক আরও বলেছেন, 'আর যদি নাই হয়, তাহা হইলেও তো ধর্মের জন্য সত্যের জন্য অনন্তকালের অনুরোধে মরুভূমিটাকেই নন্দনকানন করিয়া লইতে হইবে'। লয়বাদী হয়েও চন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত জীবনবাদী। ঊনবিংশ শতাব্দীর মননধারায় অভিষিক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে লয়বাদী হওয়া ছিল অসম্ভব। অপর একজন হিন্দুত্বের স্বপ্নদর্শীর কণ্ঠেও অনুরূপ মন্তব্য শোনা গেছে, 'হিন্দু বাঙালী লয় বা মোক্ষের কাঙাল নয়, জীবনপ্রার্থী; সে জীবন দিব্য ভাগবত জীবন। এই দেবজন্মই খাঁটি হিন্দুত্ব'।[৩৬]

'নিষ্কাম ধর্ম' প্রবন্ধটি বঙ্কিমের ভাবনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ, যদিও চন্দ্রনাথের স্বকীয় চিন্তা বর্জিত নয়। চন্দ্রনাথের মতে, মানুষ যখন হৃদয় দ্বারা চালিত হয়ে প্রার্থীকে দান করে, তখন তা দিয়ে তার কোন কামনা সিদ্ধ হয় না; এমন কি দরিদ্রকে ধন দানের মধ্যে যে আত্মতৃপ্তিবোধ থাকে এক্ষেত্রে তা-ও থাকে না; কারণ হৃদয়ের ভাব প্রবল হলে জ্ঞান বা বুদ্ধির ক্রিয়া লুপ্ত হয়। একেই বলা যায় নিষ্কাম ধর্ম। ভগবানে ভক্তি ও সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজমান এই বিশ্বাস দৃঢ় হলেই নিষ্কাম কর্ম সহজ হয়ে আসে। সুতরাং চন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত: 'নিষ্কাম ধর্মবাদ হিন্দুধর্মের লয়বাদের অপরিহার্য ও ন্যায়ানুগত সিদ্ধান্ত'। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মতত্ত্বকে এইভাবে তিনি নিজস্ব লয়তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন।

'ধ্রুব' শীর্ষক প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ ভারতীয় অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে য়োরোপীয়দের আনিত অভিযোগগুলি খণ্ডন করেছেন। পাশ্চাত্য মতানুসারে প্রাচ্য অদৃষ্টবাদ অলঙ্ঘনীয় ও বিধিনির্দিষ্ট—এখানে মানুষ নিষ্ক্রিয় থেকে পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফল ভোগ করে। চন্দ্রনাথ এই জাতীয় মনোভাবের প্রতিবাদে পৌরাণিক ধ্রুব চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন। ধ্রুব পূর্বজন্মের কর্মফল নিয়ে দরিদ্রা মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেও দৃপ্ত পুরুষকার অবলম্বন করে ও দীর্ঘ তপস্যাবলে এই জন্মেই কর্মফলকে অতিক্রম করেছিলেন। অবিচল 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা'র বলে তিনি এই পৃথিবীতেই ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বর্তমানকালে আমাদের জাতীয় জীবনে পুরুষকারের অভাব দেখে লেখক বেদনার্ত। তিনি ধ্রুবের চরিত্রাদর্শ আলোচনা করেছেন দেশবাসীকে 'ধ্রুবের সেই বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা, সেই অমানুষী পুরুষকার ও সেই সুরাসুরদুর্লভ সাহস ও বিক্রম'-এর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবেন বলে।

ভারতবাসী শ্রমকুণ্ঠ ও আরামপ্রিয়, পাশ্চাত্যবাসীদের এই অভিযোগের উত্তর চন্দ্রনাথ দিয়েছেন 'তুষানল' প্রবন্ধে। যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব, তাই প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাণ থেকে তিনি প্রমাণ উদ্ধার করেছেন।

আমাদের ধর্মশাস্ত্র বিশেষত পুরাণ সাহিত্য 'দুঃখের কাহিনীতে, কষ্টের কথায় ও ত্যাগস্বীকারের বিবরণে' পরিপূর্ণ। সীতার দুঃখপূর্ণ জীবনেতিহাস, হরিশচন্দ্রের যুগব্যাপী যন্ত্রণাভোগ বা আশ্রিত-বৎসল রাজা উশীনরের জীবন-দানের সংকল্প তার সাক্ষ্য। বস্তুত য়োরোপ বাহ্যসম্পদ আহরণের জন্য কষ্ট স্বীকার করে; হিন্দু ধর্মের জন্য, কর্তব্য পালনের জন্য কষ্ট স্বীকার করে। সম্পদ অন্বেষণ ও আহরণ প্রচেষ্টায় য়োরোপ আজ যেমন শ্রমশীল, কর্মনিষ্ঠ ও অসমসাহসিক কার্যে অগ্রসর, ভারতও একদা অনুরূপ কর্মনিষ্ঠ ছিল ও সাহসিকতাপূর্ণ কার্যে অগ্রসর হয়েছিল। তার প্রমাণ, ভগীরথের গঙ্গাকে আনয়নের জন্য দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে অভিযান। কিন্তু এ অভিযান পার্থিব সম্পদ আহরণের জন্য নয়, তা ধর্মাভিযান। কষ্টসহিষ্ণুতায় একদিন আমাদের পূর্বপুরুষেরা জগতে বরণীয় ছিলেন; সুতরাং কষ্টসহিষ্ণুতার উত্তরাধিকার আমাদের আছে। এক স্থানে স্থির থেকে বিদ্যাচর্চা দ্বারাও কষ্ট স্বীকার করা যায়, আবার ইতস্তত ছোটাছুটি করলেও কষ্ট স্বীকার করা হয়। প্রথম পথটি আমাদের; আজ যুগ প্রয়োজনে আমাদের দ্বিতীয় প্রণালীর কষ্ট ভোগও শিক্ষা করতে হবে কিন্তু তার জন্য আমাদের নিজস্ব প্রণালীটি ত্যাগ করলে চলবে না। কারণ ভারতীয় প্রণালীই শ্রেষ্ঠতর। চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'চেষ্টা করিও যেন বিজ্ঞানের রন্ধনশালায় প্রধান রাঁধুনির পদ তোমারই হয়—যেন অপর সমস্ত জাতি দিগদিগন্ত হইতে তোমার রন্ধনার্থ দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিয়া আনিয়া দেয়।'

'কড়াক্রান্তি' সমাজতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ। মুদ্রা গণনায় ইংরেজ পেনি-ফার্দিং পর্যন্ত নামে; হিন্দু আনা-পাইয়ের পর কড়াক্রান্তি প্রভৃতি সূক্ষ্মতম ভাগ পর্যন্ত গণনা করে। কড়াক্রান্তি গণনার এই কড়াকড়ি আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক

নিত্য কর্মানুষ্ঠানেও গৃহীত হয়েছে। শাস্ত্রনিয়মের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশকেও আমরা বাদ দিতে পারি না। যেমন, হিন্দুশাস্ত্রে রজস্বলা কন্যা বিবাহের নিষেধ আছে এবং রজস্বলা কন্যার বিবাহের ফল অতি মারাত্মক বলে বর্ণিত হয়েছে। রজোদর্শনের পূর্বে এখানে কন্যাবিবাহ বিধেয়, কারণ রজোদর্শনে কন্যার শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হয় এবং মনে পুরুষসঙ্গলিপ্সা জাগে। অতএব বাহ্যত তার দেহ কলুষিত না হলেও মন কলুষিত ও ব্যভিচারী হয়। হিন্দুশাস্ত্র মতে দেহের ব্যভিচারের মত মনের ব্যভিচারও পাপ। তাই 'সতীধর্মের কড়াক্রান্তিটুকু পর্যন্ত সঞ্চয় করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে অনার্তবার বিবাহের ব্যবস্থা'। মনের ব্যভিচারের কথা খ্রীষ্টধর্মেও অজানিত নয় (মেথিউ ৫, ২৮)। কিন্তু ইংরেজের ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ সমাজজীবনে অবশ্যমান্য নয়; অপরপক্ষে সুদূরগামিতা হিন্দুধর্মের ও হিন্দুত্বের লক্ষণ।

কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতার আর একটি প্রমাণ হিন্দুবিধবাদের আচরণ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নির্দেশের কঠোরতা। মনু সংহিতায় (৫, ১৫৭) বলা হয়েছে বিধবারা পবিত্র 'পুষ্পমূলফলঃ' দ্বারা অল্পাহারে দেহ ক্ষীণ করবে এবং ব্যভিচার-বুদ্ধিতে পরপুরুষের নামও উচ্চারণ করবে না। এই জাতীয় কড়াকড়ির কারণ 'হিন্দুব্যবস্থাপক' মনু জানতেন নাম করতে করতে নামধারীও চিত্তলোকে উপস্থিত হন। কুন্দনন্দিনী 'সারি গাঁথা নগেন্দ্র-নগেন্দ্র-নগেন্দ্র নাম জপ' করতে করতেই নগেন্দ্রনাথকে ভালবেসেছিল। এমনকি 'ভগবান' মনু পুরুষের পক্ষে মাতা, শাশুড়ী বা দুহিতার অঙ্গস্পর্শ নিষেধ করে গেছেন (২, ২১৫)। হিন্দুশাস্ত্রকারদের দৃষ্টিভঙ্গীর এই সুদূরগামিতা এবং সামাজিক সম্পর্ক বিশুদ্ধ রাখার প্রয়াস সত্যই শ্রদ্ধাযোগ্য। চন্দ্রনাথ চেয়েছেন, হিন্দুর প্রকৃতিগত কড়াকড়ি বা 'কড়াক্রান্তি' বর্তমান জীবনেও অনুসৃত হোক।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের পূর্বে বাঙালী চিন্তাবিদ্‌দের উপর জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাব ছিল গভীর, কিন্তু হিন্দুধর্মের নবব্যাখ্যাতাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল মনুর শাস্ত্রনির্দেশ। বঙ্কিমচন্দ্রও উত্তরজীবনে তাঁর উপর মিলের প্রভাব অস্বীকার করেছিলেন। চন্দ্রনাথের মনুপ্রশস্তিতে ও মননে যুগচিন্তার প্রভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।[৩৭]

'পুত্র' প্রবন্ধে হিন্দুর পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে কয়েকটি সুগভীর অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা আছে। হিন্দুর পুত্রলাভের প্রথম অর্থ, পিতৃঋণ পরিশোধ—পূর্বপুরুষদের ঋণশোধের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য হিন্দু পুত্র কামনা করে। হিন্দুর পুত্রপ্রয়াসের দ্বিতীয় অর্থ, বংশের গৌরববৃদ্ধি—পুত্রের প্রকৃত অর্থ, 'গুণবান পুত্র, কৃতী পুত্র, বংশোজ্জলকারী পুত্র'। এই জাতীয় পুত্রই বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে এবং পিতৃপুরুষের কীর্তি সুরক্ষার সহায়ক হয়। হিন্দুর পুত্রপ্রয়াসের তৃতীয় অর্থ, বংশরক্ষা—বংশের নাম ও গৌরব চিরস্থায়ী করার আকাঙ্ক্ষা। এ ছাড়া আর একটি নিগূঢ় কারণ আছে। হিন্দুসমাজ 'নিত্যত্বপ্রয়াসী'—যা জাগতিক অর্থে অনিত্য তাকেও সে নিত্যের অনুরূপ করতে যত্নশীল। এই নিত্য স্থিতি বা নিত্যত্বপ্রিয়তা থেকে হিন্দুর পুত্রলাভেচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। সুতরাং হিন্দুর পুত্রাকাঙ্ক্ষা জৈব প্রয়োজনজাত নয়; সুগভীর উদ্দেশ্যমূলক বা ধর্মমূলক।

'আহার' 'হিন্দুত্ব'গ্রন্থের প্রতিনিধি স্থানীয় মননশীল রচনা। এখানে তৎকালীন একটি সামাজিক সমস্যা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে দুটি সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলিত হয়েছিল তা হল, আহার ও কন্যাবিবাহ। শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় আহার বিষয়ে হিন্দুর চিরাচরিত ধারণার মূলে সদর্পে আঘাত করেছিলেন। শাস্ত্রনির্দেশ অমান্য করে হিন্দুর অস্পৃশ্য আহার গ্রহণের মধ্যে তাঁরা একধরণের জিগীষু মনের চরিতার্থতা খুঁজে পেতেন।[৩৮] এঁদের আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুর আহার নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তা সত্ত্বেও শতাব্দীর শেষ পাদে হিন্দুর আহারচিন্তার অন্য কারণও ছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ-খাল খোলা হলে য়োরোপে যাত্রা সুগম হয়। ধনীদের মধ্যে বিলাতযাত্রীর সংখ্যা বাড়ে। তাঁরা সেখানে ম্লেচ্ছাহার গ্রহণ করতেন বলে দেশে ফিরে তাঁদের প্রায়শই প্রায়শ্চিত্তের সম্মুখীন হতে হত। বিলাত থেকে প্রত্যাগমনের পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ভাবে শোধনের চেষ্টা হয়েছিল। বিলাত প্রত্যাগত যুবকেরা আহার গ্রহণে বিপ্লবের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার সুরু হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪) 'এডুকেশন গেজেট'-এ (২৯ শ্রাবণ, ১২৯৯) হিন্দুর আহার নিয়ে

আলোচনা করেন। প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন ছিল ভূদেবের লক্ষ্য। চন্দ্রনাথ বসু ভূদেবের পূর্বেই হিন্দুর আহার সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন (দ্র. 'সাহিত্য', অগ্রহায়ণ ১২৯৮) এবং তা শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে 'সাধনা' (পৌষ ১২৯৮) পত্রিকায় লেখেন 'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত' শীর্ষক প্রবন্ধ। তিনি প্রধানত চন্দ্রনাথের বলার উপাদেশাত্মক ভঙ্গিকেই নিন্দিত করেছিলেন। আমিষ নিরামিষ আহারের দ্বন্দ্বে তিনিও শেষ সিদ্ধান্ত জানান নি।[৩৯]

শরীর ধারণের জন্য আহারের প্রয়োজন, একথা সর্বজাতিসম্মত কিন্তু চন্দ্রনাথের মতে হিন্দুশাস্ত্রে এর অতিরিক্ত কিছু কাছে তা হল আহারে বিচার। নির্বিচারে আহার গ্রহণ হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। য়োরোপীয়রা শারীরিক ইষ্টানিষ্টের বিচারে খাদ্য গ্রহণ করে, মুসলমানরা মানসিক ইষ্টানিষ্টের বিচারও করে থাকে কিন্তু হিন্দুর আহারে বিচার প্রয়োজন হয় আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতির নিরিখে। হিন্দুর আহার হিন্দুর ধর্মচর্চার অঙ্গীভূত হওয়ায় এখানে আহার সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ কিছু কঠোর হওয়া স্বাভাবিক। লেখক কোমৎের 'ক্যাটেলিজম্ অব পজিটিভ রিলিজিয়ন' গ্রন্থে হিন্দুর শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাত্ত্বিক আহারের সমর্থন পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন।

আমিষ ও নিরামিষ আহার গ্রহণে খাদকের প্রকৃতি যে ভিন্ন হয় তা মানবজগৎ ছেড়ে প্রাণিজগতের দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখা যায়। জন্তুদের মধ্যে মাংসাশী ব্যাঘ্র-সিংহ ও তৃণভোজী গোরু-মহিষের প্রকৃতি পৃথক। পক্ষিজগতে মাংসাশী শকুনি-কাক প্রভৃতির কণ্ঠস্বর কটু ও কর্কশ। অন্যদিকে শালিখ-চড়ুই-টিয়া-দোয়েল প্রভৃতি নিরামিষাশী পক্ষীর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ও সুরময়। চন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে য়োরোপীয়রা মাংসাশী হওয়ায় তাদের মধ্যে 'হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি' অব্যাহত এবং সমাজনির্ভরতার পরিবর্তে আত্মনির্ভরতা সেখানে বেশি। অপরপক্ষে নিরামিষভোজী হিন্দু 'শান্ত, সুশীল ও সুবোধ' প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং এখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা আত্মনির্ভরতা অপেক্ষা সমাজ মুখাপেক্ষিতা বেশি। উভয় দেশের আহারের পার্থক্য উভয় জাতির এই মানসগত পার্থক্যের জন্য দায়ী। হিন্দুমতে আহার তিনপ্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এদের মধ্যে সাত্ত্বিক আহারই শ্রেষ্ঠ। যে আহার গ্রহণ করলে শরীর সুস্থ ও ব্যাধিমুক্ত থাকে, মন প্রফুল্ল ও রিপুসকল সংযত হয় এবং চিন্তাশক্তি মুক্ত ও হৃদয় বিক্ষেপশূন্য হয়, সেই

আহারই সাত্ত্বিক আহার। যেহেতু সাত্ত্বিকতা লাভ হিন্দুর জাতিগত উদ্দেশ্য সেই কারণে আহারে বিচার তার অবশ্য কর্তব্য। চন্দ্রনাথ হিন্দুর অভক্ষ্য আহার গ্রহণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও জাতিচ্যুতির সমর্থক। কেননা শাস্ত্রকারেরা হিন্দুজাতিকে সুরক্ষার প্রেরণায় আহারে বাধানিষেধ আরোপ করেছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গির এই অনুদার একদেশদর্শিতা অংশত শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাবজাত। সমসাময়িক কালে শশধর সাত্ত্বিক আহার গ্রহণের পক্ষে জোরালো আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন।[৪০]

আহারতত্ত্ব আলোচনায় চন্দ্রনাথ কখনও কখনও একদেশদর্শিতার পরিবর্তে মধ্যবর্তী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন এবং সেই অংশগুলি প্রশংসার দাবি রাখে। চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আহারের প্রথম উদ্দেশ্য দেহের পুষ্টিসাধন; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আত্মার শক্তিবর্ধন'। এর যে কোন একটি উদ্দেশ্যে খাদ্যগ্রহণ করলে তা দোষযুক্ত হবে। যিনি আত্মার শক্তি বর্ধনার্থ স্বল্লাহারে বা অনাহারে দেহকে অপটু করবেন তাঁর পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতি যেমন অসম্ভব, তেমনি শুধুমাত্র দেহের পুষ্টিনিমিত্ত অতি-আহারও ভাল নয়। বস্তুত লুব্ধ হয়ে যে আহার তা-ই অপকৃষ্ট আহার। লোভজনিত আহার পশুর নির্বিচার আহারের সঙ্গে তুলনীয়। বর্তমানে ইংরেজি শিক্ষিত উন্মার্গগামী যুবকরা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আহারে আসক্ত হয়েছে তার পিছনে পাশ্চাত্যানুসরণে দেহের পুষ্টি সাধনের প্রেরণা নেই, তারা সম্পূর্ণ রসনাচালিত বলেই নিন্দনীয়। হিন্দুশাস্ত্রে কর্মভেদে আহারের পার্থক্যও স্বীকৃত। দেহকে নির্দিষ্ট প্রণালীর কর্মে পটু রাখার জন্য যদি মাংস ভক্ষণ প্রয়োজন হয়, তবে তা গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত। বরং এক্ষেত্রে নিরামিষ আহারই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। চন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশুদ্ধ চিত্তে ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে সামান্য ডাল রুটি ভাত খেলেও স্বাস্থ্য রক্ষিত হবে। স্পৃহাযুক্ত যে কোন সামান্য আহারই বলবর্ধক ও স্বাস্থ্যকর, লুব্ধতাই হানিকর। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানীরাও এই কথা বলে থাকেন। এক্ষেত্রে চন্দ্রনাথ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট উক্তি আছে, 'আমি মাংসাহারকে নিষেধ করি না। ...আহারে বিচার আবশ্যক, আহারে সাত্ত্বিকতা প্রয়োজন, ইহাই আমার প্রধান কথা।'

'ব্রহ্মচর্য' প্রবন্ধটি 'হিন্দুত্বে' গ্রন্থভুক্ত হবার আগে 'বঙ্গদর্শন'-এ (কার্তিক ১২৯০) প্রকাশিত হয়েছিল।[৪১] এখানে লেখক বাল্যে বা কৈশোরে নয়,

সমস্ত জীবন ধরেই ব্রহ্মচর্য পালনের আবশ্যকতা বুঝিয়েছেন। আমাদের দেশে প্রাচীন বিদ্যাশ্রমে চতুর্বিধ শিক্ষা দেওয়া হত—দেহের শিক্ষা, মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা ও আত্মার শিক্ষা। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীতে কেবলমাত্র মনের শিক্ষা হতে পারে। অন্য প্রকারের শিক্ষা হওয়া কঠিন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার নিয়ম ছিল চারটি—কষ্টসহিষ্ণুতা, বিলাসবিদ্বেষ, চিত্তসংযম ও নিষ্ঠা। নিয়ম কটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে শিক্ষা ছিল কঠোর তপস্যার বিষয়। বালক বা কিশোরকে জীবনারম্ভের কালে কঠোর নিয়মে বেঁধে জীবনব্যাপী অবিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের উপযোগী করে তোলাই ছিল সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য। 'ব্রহ্মচর্য'-এর অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ অন্য ভাষায় নেই, এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ হিন্দুত্বেরই লক্ষণ।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় 'কঠোরতাই ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত প্রাণ'। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, 'আকাশে মেঘের যে বিচিত্র খেলা হয়, মানুষ কি তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিবে না? স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীতে সান্ধ্যসমীরণে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণপ্রভ বীচি উৎক্ষিপ্ত হয়, মানুষ কি তাহা দেখিবে না? বসন্তে বসুন্ধরা যে অপূর্ব পুষ্পাবরণে আবৃতা হয়, তাহা কি মানুষ দেখিবে না?' এতগুলি প্রশ্নসূচক বাক্যের একটিই উত্তর, হাঁ, দেখবে। বাক্য তিনটিতে চন্দ্রনাথ যথাক্রমে আকাশ, সমুদ্র ও অরণ্যের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন এবং এ থেকেই প্রমাণ করা যায় তাঁর সৌন্দর্যদর্শনের চক্ষু ছিল।

ব্রহ্মচর্য শুধু কঠোরতার সাধনা নয়, কোমলতার ধ্যানও। সংসার-অনাসক্ত ব্রহ্মচারীর পক্ষে 'মোহ পরিশূন্য' সৌন্দর্যদর্শন অধিক সম্ভব; সুতরাং ব্রহ্মচর্য পালন শুধু সেকালের নয়, একালের এবং সর্বকালের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

'বিবাহ' 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। হিন্দুর পরিণয় প্রথা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের তিনটি দশকে শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজজীবন সংক্ষুব্ধ হয়েছিল। বিবাহ সমাজজীবনের একটি মৌলগ্রন্থি। সুতরাং সেই প্রথায় আঘাত লাগলে সমস্ত সমাজবন্ধনই শিথিল হয়ে পড়ে। কাজেই যাঁরা সমাজে রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী তাঁরা নিরতিশয় যত্নে যুক্তির পাষাণ দুর্গে আমাদের বিবাহ প্রথাকে সুরক্ষিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার

এবং চন্দ্রনাথ বসু সর্বাগ্রগণ্য। চন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এ (চৈত্র ১২৮৯) 'বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য' নামিত একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি 'সাবিত্রীতত্ত্ব' গ্রন্থে পরোক্ষে বাল্যবিবাহের পক্ষে নিজ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং শোভাবাজার রাজবাটিতে আয়োজিত একটি 'সেমিনার'-এ একই বিষয়ে বক্তৃতা করেন (৬ আগস্ট, ১৮৮৭)। এখানে একটি প্রবন্ধের আকারে তিনি নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধটি পরে 'হিন্দুবিবাহ' নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ছাপিয়েও প্রচার করেছিলেন। প্রবন্ধগুলির মূল বক্তব্য অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদে 'হিন্দুবিবাহ' শিরোনামে 'ভারতী'তে (আশ্বিন ১২৯৪) একটি প্রবন্ধ লেখেন। চন্দ্রনাথ তার প্রত্যুত্তরে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটি 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থের 'ক্রোড়পত্র'-এ সংকলিত করেছেন কিন্তু নিজ মত সংশোধন বা পরিবর্তন করেন নি। তিনি বেশ জোরের সঙ্গে হিন্দুর পরিণয় প্রথাকে সমর্থন করেছেন এবং একটি দার্শনিকতাও আরোপ করেছেন যা তাঁর নিজস্ব। প্রাচীন মননে এই জাতীয় দার্শনিকতা ছিল বলে মনে হয় না।

বিবাহ হিন্দুর নির্দিষ্ট চতুরাশ্রমের শ্রেষ্ঠ গৃহাশ্রমের সিংহদ্বার। সুতরাং বিবাহ হিন্দুর অবশ্য পালনীয় ধর্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত। তাই বিবাহের প্রতিটি স্তর শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

প্রথম স্তর, কন্যা নির্বাচন। য়োরোপীয় প্রণালীর স্বেচ্ছা নির্বাচন ('কোর্টশিপ') আমাদের বিবাহ প্রণালীতে নেই। বিবাহার্থী যুবক ইন্দ্রিয়-চালিত হওয়াই সম্ভব; সেক্ষেত্রে তার নির্বাচন ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা। সুতরাং যোগ্যা কন্যা নির্বাচনের ভার দিতে হবে হিতাকাঙ্ক্ষী অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠদের।

দ্বিতীয় স্তর, বিবাহানুষ্ঠান। য়োরোপ প্রভৃতি দেশে চুক্তিবদ্ধ বিবাহ প্রচলিত। আমাদের বিবাহে ধর্মীয় আচারপালন মুখ্য। 'মনু সংহিতা'র বিবাহ বিধি অনুসারে সম্প্রদানরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারী পতির সম্পত্তিতে পরিণত হয় (৫ অ. ১৫২)। নারীকে পুরুষের সম্পত্তি রূপে নির্দেশের বিপক্ষে উনবিংশ শতাব্দী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চন্দ্রনাথ এর একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি রঘুনন্দনের 'উদ্বাহতত্ত্ব' থেকে শ্লোক উৎকলন করে দেখিয়েছেন যে, 'দানগ্রহণের গুণে যে নারী পথের ধূলার ন্যায় সামান্য বস্তু…সপ্তপদী গমন প্রভৃতি অলৌকিক সংস্কারের গুণে সেই নারী অলৌকিক

সংস্কার-প্রাপ্ত অগ্নি এবং পশুবন্ধন কাষ্ঠের ন্যায় পবিত্র দেবতুল্য' হয়ে ওঠেন। অতএব হিন্দুপত্নী পুরুষের সম্পত্তি রূপে গণ্য হলেও চন্দ্রনাথের মতে 'হিন্দুভার্যা দেবাসনে উপবিষ্টা, দেবীপদে প্রতিষ্ঠিতা, দেবী মাহাত্ম্যে মণ্ডিতা'। 'মনুসংহিতা'র শ্লোক 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' (৩ অ. ৫৬) এই মনোভাবেরই পরিপূরক। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের চেতনায় নারীর অঙ্গ থেকে পুরাতন দেবীত্বের নির্মোক খুলে নিয়ে মানবীরূপে দেখার প্রেরণা ছিল অধিক। নব্য হিন্দু আন্দোলনের নায়করা নারীকে পুনরায় দেবীর আসনে বসাতে চেয়েছিলেন। অগস্ত কোম্‌তের 'মানবী পূজা'র আদর্শ তাঁদের মননে প্রভাব বিস্তার করেছিল মনে হয়।

তৃতীয় স্তর, বিবাহের বয়স। 'ভগবান' মনু ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষ মধুরদর্শনা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে এবং ২৪ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ৮ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করবে এমন বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন (৯ অ. ৯৪ শ্লো.)। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে অঋতুপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। এই পদ্ধতি নারীর বাল্যবিবাহের নামান্তর। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ সাধারণ ভাবে বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করতেন বাঙালীর দুর্বলতার মূলে আছে প্রজাবৃদ্ধি এবং প্রজা-বৃদ্ধির মূল নিহিত আছে তার বাল্যবিবাহ প্রথায়।[৪২] এখানে উল্লেখ করা যায়, এল. পি. ওয়াইন প্রমুখ অনেকে বেথুন সোসাইটিতে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, বাঙালীর স্বাস্থ্য স্বশাসনের উপযুক্ত নয়।[৪৩] এর প্রত্যুত্তরে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ (ফাল্গুন ১২৮৫) 'বঙ্গোন্নয়ন' নামে প্রবন্ধ লিখে বাল্যবিবাহ যে বাঙালীর শারীরিক দুর্বলতার কারণ এই মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন। চন্দ্রনাথ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে নারীর বাল্যবিবাহ সমর্থন করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের পরিবারের বহুজনের সঙ্গে বহুবিধ সম্বন্ধ। এজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হবার আগেই স্ত্রীলোকের বিবাহ হওয়া তার পক্ষে ও পরিবারের পক্ষে মঙ্গলজনক। লেখক নিজ বক্তব্যের সমর্থনে বৈদিক বিবাহমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু বিবাহ যে অনেকাংশে সমাজের তাৎক্ষণিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক জীবনের প্রসার ও সংকোচনের উপর নির্ভরশীল তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তিনি একটি প্রাচীন প্রথার যুগোচিত সংস্কার চান নি, অনুবর্তনকেই হিতকর মনে করেছেন।

আমাদের বিবাহের উদ্দেশ্য স্ত্রীপুরুষের 'একত্বসাধন'। চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিয়া পূর্ণ পুরুষ হইবেন' একদা স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর নিজ দেহকে দ্বিখণ্ডিত করে স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন, হিন্দুর বিবাহ সংস্কারের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রী আবার মিলিত হয়ে স্বয়ম্ভূ হন। হিন্দুর পতি-পত্নী সম্পর্কে লেখক সুগভীর দার্শনিকতা খুঁজে পেয়েছেন এবং বলেছেন, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিবাহ করতে গেলে পতি-পত্নীকে এক মন এক প্রাণ হতে হয়। 'স্ত্রী ঋক্, পুরুষ সাম; স্ত্রী পৃথিবী, পুরুষ স্বর্গ·· পৃথিবী ও স্বর্গ একত্র হইলে তবে একটি পূর্ণ জগৎ হয়'। তাই স্ত্রী ও পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ মনুষ্যত্বসাধক। এই নিগূঢ় কারণেই হিন্দুবিবাহ দুটি হৃদয়রূপ পৃথক নদীকে একটি ধারায় মিলিয়ে দিবার ব্যবস্থা করে। কারণ 'যুক্তহস্তে পুষ্পাঞ্জলি না দিলে দেবার্চনা করিয়া কি আশ্ মেটে?' এজন্য একান্ত প্রয়োজন 'পতিকর্তৃক পত্নী সৃষ্টি হওয়া'। পত্নীকে মনের মত করে সৃষ্টি করতে হলে একদিকে পতিকে যেমন জ্ঞানবান্ বিদ্বান ও পরিণত-বয়স্ক হওয়া দরকার, অন্যদিকে পত্নীকে তেমনি অল্পবয়স্কা বালিকা হওয়া চাই। পত্নীর বয়স বেশি হলে পতির শিক্ষা ফলপ্রসূ না হওয়ার আশঙ্কা অধিক। বিবাহের এই সুগভীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের শাস্ত্রকাররা পরিণত ও বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে বালিকার বিবাহ নির্দিষ্ট করে গেছেন।

যাঁরা বাল্যবিবাহের বিরোধী (স্বয়ং বঙ্কিম তাঁদের অন্যতম) তাঁদের যুক্তি-গুলিরও সম্মুখীন হয়েছেন লেখক। এঁরা বলেন, বাল্যবিবাহ জননী ও সন্তান উভয়েরই স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে বালিকাপত্নী তাহার জন্য নহে।' এবং বাঙালীর স্বাস্থ্যহীনতার কারণ বাল্যবিবাহ নয়, বিবাহের 'আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য'-এর বিস্মৃতি।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে চন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এখানে সূত্রাকারে নির্দেশ করা যায় ১. হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য ধর্মচর্চা নয়, সংসার যাত্রা—প্রমাণ, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' শাস্ত্রনির্দেশ। ২. বিবাহ প্রক্রিয়ার ফল পতি-পত্নীর একীকরণ নয়। ৩. পতির সম্বন্ধে পত্নীর পদ নিকৃষ্ট—প্রমাণ, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পণ রেখেছিলেন। ৪. বাঙালীর শারীরিক দুর্বলতার কারণ বাল্যবিবাহ, বঙ্গের জলবায়ুর দোষ নয়। 'জলবায়ুর দোষ হইলে সুন্দর বনের বাঘের কথা কেহ শুনিতে পাইত না'।

'নবজীবন'-এ একটি প্রবন্ধ লিখে চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের উত্থাপিত অভিযোগগুলির উত্তর দিয়েছেন। অভিযোগ এক-এর উত্তরে বলেছেন, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ। এই একতম উদ্দেশ্যের পথে সংসার বাধা সৃষ্টি করে না। বরং সংযতচিত্তে সংসারাশ্রমের নির্দিষ্ট নিত্যকর্মাদি প্রতিপালন করলেই মানুষের চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং সে মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলির যোগসূত্র, মনুসংহিতা, গোভিলের গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্র থেকে প্রচুর 'বচন' উদ্ধৃত করে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, 'হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক, সাংসারিক বা বাস্তব নয়।' রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর চতুরাশ্রমের মধ্যে একমাত্র বানপ্রস্থকে আধ্যাত্মিক বলে উল্লেখ করেছিলেন। চন্দ্রনাথের মতে চারটি আশ্রমই পরস্পর সংলগ্ন —'মুক্তিপথের চারটি অগ্রপশ্চাৎ সোপানমাত্র'। গার্হস্থ্যাশ্রমেও সস্ত্রীক না হলে হিন্দুর ধর্মচর্চা হয় না। রামচন্দ্রকেও সীতার স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' শ্লোকের ভগ্নাংশ উদ্ধৃত করে প্রজাবৃদ্ধি যে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য একথা বলা অসংগত। উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় ছত্রে আছে 'পুত্র পিণ্ড প্রয়োজন.' অর্থাৎ পারলৌকিক মঙ্গলার্থ পুত্রোৎপাদনের জন্য পত্নী আবশ্যক। এই কারণে হিন্দুশাস্ত্রে প্রথম পুত্রকেই পুত্র বলে, অন্যান্য পুত্র কামজ বলে নিন্দিত।

অভিযোগ দুই-এর উত্তরে তিনি দেখিয়েছেন, হিন্দুর বিবাহমন্ত্রে দেখা যায়, দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে একত্রিত করে দেওয়াই বিবাহের উদ্দেশ্য। একেই চন্দ্রনাথ বলেছেন, স্ত্রীপুরুষের একীকরণ। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, একীকরণ যদি হিন্দুর বিবাহ প্রক্রিয়ার অর্থ ও উদ্দেশ্য হয় তবে এ সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত হল কি করে? প্রত্যুত্তরে লেখক জানিয়েছেন, বহু বিবাহ লোকাচার; শাস্ত্রনির্দিষ্ট নয়। অভিযোগ তিন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, হিন্দুর দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর স্থান নিকৃষ্ট নয়। 'হিন্দুপত্নী অলৌকিক সংস্কারসম্পন্ন অতি পবিত্র ও পূজনীয়···হিন্দুপত্নী দেবতা'। আমাদের ভাষায় স্ত্রী শ্রী ও লক্ষ্মী সমার্থক। সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীনিন্দামূলক কিছু কিছু উক্তি আছে সত্য কিন্তু তা সংসারত্যাগী যোগীদের স্ত্রীলোক সম্পর্কে বিরাগ সৃষ্টি করার জন্য লিখিত হয়েছিল।[৪৪] আর, 'একজন যুধিষ্ঠির' 'একজন দ্রৌপদী'কে দ্যূতক্রীড়ায় পণ রাখলেও তাতে প্রাচীন ভারতে

স্ত্রীজাতির গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না। তাছাড়া যুধিষ্ঠির তখন ধর্মপুত্র নন, 'উচ্ছন্ন-মতি, নিয়তিকবলিত, আত্মকর্তৃত্বহীন'।

অভিযোগ চার-এর উত্তরে চন্দ্রনাথ বলেছেন, বাঙালীর স্বাস্থ্যহীনতার জন্য বাল্যবিবাহ দায়ী নয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে কিন্তু সেখানকার লোক বেশ বলিষ্ঠ, 'বাহুবলে ইউরোপের সমকক্ষ'। রবীন্দ্রনাথ বাংলার বাঘের সুস্বাস্থ্যের পক্ষে যা বলেছেন তার প্রত্যুত্তরে চন্দ্রনাথের বক্তব্য, বাংলার জলবায়ু বনের বাঘের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হতে পারে কিন্তু মানুষের বা গৃহপালিত গো-মহিষাদির পক্ষে নয়। ম্যালেরিয়া, আঁতুর প্রণালী, সন্তান পালনে অনভিজ্ঞতা, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব প্রভৃতি কারণ বাঙালী মা ও সন্তানের স্বাস্থ্যহানির জন্য দায়ী। বাল্যবিবাহকে এজন্য দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিপ্রণালীর দুর্বলতাও তিনি দেখিয়েছেন। পরিণয় প্রথা নিয়ে বিতর্ক তাঁর কাছে প্রায় ধর্মযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল।

হিন্দুর বহু দেব-কল্পনার সমর্থনে লেখা হয়েছিল 'তেত্রিশ কোটি দেবতা।' উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম তার বহুদেববাদের জন্য নিন্দিত হয়েছিল। খ্রীস্টধর্ম ও মুসলমান ধর্ম মতে ঈশ্বর এক ও অবিভাজ্য। হিন্দুরা এক ব্রহ্মকে বহুতে বিভক্ত করে দেখেন। চন্দ্রনাথের মতে হিন্দুর অবলম্বিত পথই শ্রেষ্ঠ। রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) যে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন তার অন্বিষ্ট ঔপনিষদিক একেশ্বরবাদ। পরবর্তী কালে 'ব্রাহ্মহিন্দু' রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রতিপন্ন করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন কিন্তু তিনিও হিন্দুর বহুদেববাদকে সমর্থন করতে পারেন নি। চন্দ্রনাথ প্রমুখ নব্যহিন্দুপন্থীরা হিন্দুধর্মের সমর্থনে অগ্রসর হয়ে তার 'কড়া-ক্রান্তি'টুকুও বাদ দিতে চান নি। এই মনোভাব থেকে হিন্দুর পরিকল্পিত তেত্রিশ কোটি দেবতা সমর্থিত হয়েছে।

রচনায় শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর নির্ভরতা নেই, অনেকাংশে মন্মথপন্থা অনুসরণ করেছেন লেখক। তিনি বলেছেন, জগদীশ্বর যদিও এক এবং অদ্বিতীয় কিন্তু তিনি জগতের মধ্যে অসংখ্য রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। 'জগতের কি একটি রূপ ?' 'একটি প্রজাপতি রাতে একরকম, মধ্যাহ্নে একরকম, অপরাহ্নে একরকম, অন্ধকারে একরকম, আবার ক্ষুধার্ত পক্ষী কর্তৃক ধৃত

হইয়া যখন তাহার ঠোঁটের ভিতর থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে তখন আর একরকম'। বাক্যের শেষাংশে চন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সৌন্দর্যোপভোগ ক্ষমতায় পরিচয় পাই। দিনের প্রহরে প্রহরে একই প্রজাপতি নানা রূপে ও নানা রঙে নিজেকে প্রকাশ করে। এই নৈসর্গিক ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, জগতে জগদীশ্বর অগণ্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা সেই সুউচ্চ কবি কল্পনার সৃষ্টি। আবার জগদীশ্বরের ভয়ংকর ও শুভংকর দুটি রূপই গ্রহণযোগ্য। কেননা, একই ভাবের প্রকাশ কথনও স্নেহে ক্ষমায় প্রীতিতে, কখনও ভীষণতায় ভয়ংকরতায় হয়ে থাকে। আজ মানুষ প্রকৃতিকে বশীভূত করে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত, তাই ঈশ্বরের স্নেহময় প্রেমময় মূর্তি তার কাম্য; কিন্তু একদিন ইতিহাসশূন্য আদিম মানুষ প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় এবং ভয়ংকরতায় ভয় পেত। মানবমনের আদি ভয় এখনও দূর হয় নি। হিন্দুর দেবতা তাই বহুরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। হিন্দুর বহুদেববাদে হিন্দুধর্মের সর্বত্র ব্রহ্মদর্শিতার অভিপ্রায় প্রতিফলিত।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথমে খ্রীস্টধর্মীরা, পরে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা হিন্দুর সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন পৌত্তলিকতার বিরোধী। রাজনারায়ণ বসু 'ব্রাহ্মহিন্দু' বলে অভিহিত হলেও হিন্দুর মূর্তিপূজা সমর্থন করেননি। দয়ানন্দ সরস্বতী যিনি বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন তিনিও মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেছিলেন। এই যুগেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের গ্রাম্য প্রায়-অশিক্ষিত পুরোহিত গদাধর ভবতারিণীর মূর্তির মধ্যেই নিরাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন এবং হিন্দুর সাকার উপাসনার তাৎপর্য পুনরুদ্ধার করেন। চন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রতিমা বা মূর্তিপূজা' প্রবন্ধে সাকার উপাসনার সার্থকতা ও দার্শনিকতা প্রতিপন্ন করেছেন। প্রবন্ধটিতে লেখক গতানুগতিক শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধার করেন নি, সাহিত্যতত্ত্ব শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় অবতারণা করে হিন্দুর মূর্তিপূজার দার্শনিকতা আবিষ্কারে অগ্রসর হয়েছেন। লেখকের এই চিন্তায় গভীরতার স্পর্শ আছে।

'ঐশীশক্তিকে জড়মূর্তিতে অর্চনা করিবার নাম প্রতিমা বা মূর্তিপূজা'। মূর্তিপূজক তাঁর মানসিক শক্তির দ্বারা প্রতিমাতে ঐশী শক্তির রূপ উপলব্ধি

করেন। প্রতিমার এই রূপোপলব্ধির নাম artistic idealism বা 'শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন'। ভাবাভিনয়নের গুণেই কাব্য চিত্র সংগীত মহিমাময় ও শিল্পোপযোগী হয়; সুতরাং একই গুণে প্রতিমাপূজাই বা মহিমাময় ও শিল্পোপযোগী হবে না কেন? কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এ ১০ম সর্গ) উল্লিখিত আছে যে, আত্মাপ্রধান যোগিগণ মোক্ষকামনায় 'মনসা হৃদয়াশ্রম' জ্যোতির্ময়ী দেবী ভাবনা করে থাকেন কিন্তু সাধারণ সংসারী মানুষের পক্ষে জড় মৃত্তিকায় নির্মিত ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিমাই বেশি উপযোগী। চন্দ্রনাথ অবশ্য স্বীকার করেন, 'ঈশ্বরের মূর্তি নির্মাণ করিয়া সেই মূর্তিটিকে পূজা করা উচিত নয়, সেই মূর্তিতে যে ঐশীগুণ ব্যক্ত থাকে তাহাই পূজা করা কর্তব্য'। উদাহরণ—বর্ষার পূর্ণ নদী, শরতের নির্মল আকাশ, বসন্তের পুষ্পাভরণা বসুন্ধরা ও গৃহস্থের গৃহসৌন্দর্য বর্ণনায় কাব্যে সাহিত্যে 'সৌভাগ্য'কে সংকেতিত করা যায় কিন্তু 'মৎস্যপুরাণ'-এ বর্ণিত লক্ষ্মীমূর্তি সৌভাগ্যচিহ্ন হিসাবে সাধারণ মানুষের কাছে বেশি কার্যকর। 'হিন্দুকবির এই অপূর্ব প্রতিমা বড়ই সুন্দর বড়ই ভাবাভিনয়নমূলক (ideal)'। 'পদ্মপুরাণ'-এ উক্ত হয়েছে, 'স্থাপনঞ্চ স্বয়ং ব্যক্তং দ্বিবিধং তং প্রকীর্তিতং।' অর্থাৎ জগদীশ্বরের প্রতিমা দুই প্রকার—স্থাপিত প্রতিমা ও স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা। শাস্ত্রোল্লিখিত নিয়মানুসারে কাষ্ঠ মৃত্তিকা প্রস্তর দিয়ে যে প্রতিমা নির্মিত হয় তা স্থাপিত প্রতিমা এবং বৃক্ষ পর্বত সমুদ্র প্রভৃতিতে জগদীশ্বরকে দর্শন অর্থাৎ প্রতীককে অবলম্বন করে যে পূজা তা স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা উপাসনা। প্রশস্ত সহৃদয়তার গুণে হিন্দু স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমার অনুকরণে জগৎব্যাপী প্রতিমা নির্মাণ করে গেছেন। চন্দ্রনাথ হিন্দুর এই প্রতিমা পূজার দার্শনিকতাকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে আবেগকম্প্র কণ্ঠে বলেছেন—'সে প্রতিমা ভাঙিও না। প্রতিমা ভাঙিলে জানিবে যে হিন্দু সমাজও ভাঙিল।'

হিন্দুশাস্ত্রে উচ্চাধিকারীর জন্য নিরাকার উপাসনা নির্দিষ্ট কিন্তু নিম্নাধিকারীর পক্ষে সেই অন্তর্মুখী অত্যুন্নত ভাব স্পর্শযোগ্য হবে না বলে শাস্ত্রকারেরা তাদের জন্য বহির্মুখ প্রণালীতে ঈশ্বরের স্থূল প্রতিমা গড়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রকারদের যে মনোভাব ও জাগ্রত বুদ্ধি ধরা পড়েছে তাকে চন্দ্রনাথ বলেছেন 'ধর্মে রাজনৈতিকতা' (statesmanship)। ধর্মে অধিকারভেদ হিন্দু শাস্ত্রকারদেরই সৃষ্টি। সাকার উপাসনার সোপান অতিক্রম করেই নিরাকার উপাসনার সুউচ্চ শীর্ষে সাধক পৌঁছে যায়।

বহু-ঈশ্বরবাদ তখন একেশ্বরবাদে লুপ্ত হয়ে যায়। এই বিষয়টি পূর্ণচন্দ্র বসু (১৮৪৪—?) অধিকতর সুন্দরভাবে প্রমাণ করেছেন যদিও মনোভাব একই —নবহিন্দুত্বের আবেগে উজ্জীবিত।[৪৫]

'মৈত্রী' প্রবন্ধটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটিতে চন্দ্রনাথের বিচিত্র মনন স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমের প্রীতিতত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে চন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পৃথিবীতে প্রীতি বা সদ্ভাবের ন্যায় পদার্থ আর নাই'। খ্রীস্ট ধর্মশাস্ত্রেও প্রীতিবাদ আছে। বাইবেল বলে, যেহেতু ঈশ্বর আমাদের প্রেমের পাত্র অতএব ঈশ্বরসৃষ্ট সকলকেই ভালবাসা কর্তব্য। এখানেই খ্রীস্টীয় প্রীতিবাদের সীমা। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র আরও অগ্রসর হয়ে বলেছে, 'সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে সর্বভূতে তোমার প্রেম বিস্তৃত হোক্'। এই সমদর্শিতা বা সমত্ববাদ অন্যত্র দুর্লভ। অন্য দিক থেকেও লেখক হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। মানুষ ঈশ্বর সৃষ্ট বলে খ্রীস্টীয় প্রীতি মানুষ পর্যন্ত প্রসারিত কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে 'দেবাঃ মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষ সরীসৃপাঃ' এমন কি 'সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গম্' ('বিষ্ণুপুরাণ' ১ অংশ ১৯ অ) পর্যন্ত প্রীতি বিস্তার লাভ করেছে। মানুষ পশু পক্ষী বৃক্ষ স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থে ব্রহ্মোপলব্ধি থেকে হিন্দুশাস্ত্রে এই ব্যাপক প্রীতিবাদ উপদিষ্ট হয়েছে। এই মহৎ উপদেশেরই অপর নাম মৈত্রীবাদ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) গ্রন্থে অনুরূপ মনোভাব থেকেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করেছেন।[৪৬] চন্দ্রনাথের মৈত্রী ব্যাখ্যা অংশত ভূদেব প্রভাবিত।

ভারতীয় সমত্ববাদ এবং মৈত্রীবাদ শুধুমাত্র শাস্ত্রসীমায় আবদ্ধ ছিল না। সমাজজীবনেও তার কার্যকারিতা পরীক্ষিত হয়েছিল। যাঁরা হিন্দু সমাজের সাম্যহীনতার প্রমাণ হিসাবে প্রাচীন হিন্দুর বর্ণভেদের উল্লেখ করেন লেখক তাঁদের মতের প্রতিবাদ করেছেন। চন্দ্রনাথের মতে এই জাতীয় বৈষম্য অনিবার্য। চন্দ্রনাথের সাম্যচিন্তা অভিনব। তাঁর মতে ভারতের বর্ণভেদ প্রণালীই প্রকৃত সাম্যমূলক। সমাজকে সুরক্ষা করার জন্য বিভিন্নমুখী কর্মের প্রয়োজন। শক্তির তারতম্য অনুসারে প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের কর্ম বিভাগ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে সমাজের অগ্রগতি ছিল সর্বতোসামঞ্জস্যপূর্ণ। চন্দ্রনাথ একই অপরাধে বর্ণভেদে দণ্ডভেদের পক্ষপাতী। একজন শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি চুরি করলে তার যদি ছ মাস

কারাবাস হয়, তবে একজন মূর্খ ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক চুরি করলে ছ বৎসর কারাদণ্ড বা নির্বাসন হওয়া উচিত। কারণ শিক্ষা ও পদমর্যাদা অনুযায়ী লজ্জা ও অপমানবোধ বিভিন্ন হয়ে থাকে। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা বর্ণভেদে দণ্ডভেদের যে বিধান দিয়েছেন তা চন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সকলের জন্য একই আইনের শাসন প্রবর্তনের জন্য ইংরেজের প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'নতুন শাসনে যে আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক বা হত্যা করুক, অপরাধের পংক্তি একই, তার শাসনও সমান।'[৪৭]

ভারতের বর্ণভেদ কৌলিক। পুরুষানুক্রমে কোন ব্যবসা কুলগত হয়ে পড়লে তাতে যে স্বাভাবিক দক্ষতা ও আসক্তি জন্মায় বৃত্তি পরিবর্তনে তা সম্ভব নয়। বৃহৎ ধর্মশাস্ত্র গড়ে উঠার আগেই ভারতে বৃত্তিগ্রহণ জন্মগত ও কুলগত হয়ে পড়েছিল। শাস্ত্রকারেরা যখন সামাজিক বিধি নির্দিষ্ট করতে উদ্যোগী হলেন তখন তাঁদের মনে হল 'মানুষ স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট…এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষ আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইতে বাধ্য'। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো মানুষকে স্বর্ণ রৌপ্য পিত্তল ও লৌহ প্রকৃতির বলে চারটি স্বাভাবিক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। হিন্দুর চতুর্বর্ণের সমর্থন চন্দ্রনাথ দেখেছিলেন প্লেটোর উপর্যুক্ত বিভাজনে। মানুষে মানুষে এই প্রভেদের কারণ কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ। মানুষ মূলত এক—'এক ব্রহ্ম পদার্থ'। কেবল কর্মফলের জন্য মানুষ জন্মান্তরে বিচিত্র অবস্থা ও কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়।[৪৮] ভগবদগীতায় এর সমর্থন রয়েছে, 'কর্মাণি প্রভিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈগুর্ণৈঃ' (১৮ অ, ৪১)। মানুষ ইহজন্মে আপন বর্ণধর্ম পালন করে এবং ধর্মপথে অগ্রসর হয়ে উন্নত স্বভাব লাভ করলে পরজন্মে উচ্চতর বর্ণ ও বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ য়োরোপে পার্থিব উন্নতি শুধু ইহজন্মেই হয়ে থাকে, ভারতের পার্থিব উন্নতি জন্মান্তরেও হয়। কেননা ভারতে ইহজীবন অনন্তজীবনের অংশ মাত্র। হিন্দুর বর্ণভেদের আর একটি গভীর লক্ষণ আছে। য়োরোপীয় সমাজ প্রকৃতপক্ষে সাম্যের অনুকূলতা করে না। পার্থিবতাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় এরা মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বিনষ্ট করে বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। অথচ পার্থিবতা পরিহার ও অধ্যাত্মমোহ হিন্দুসমাজকে এক অলৌকিক সাম্যতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

মার্কিন পণ্ডিত জনসনের Oriental religion গ্রন্থে হিন্দুর বর্ণভেদ প্রণালীর সমর্থন দেখে চন্দ্রনাথ উল্লসিত হয়েছিলেন। লেখকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা হয়ত সর্বক্ষেত্রে এক মত হতে পারি না কিন্তু তাঁর যুক্তি প্রণালী অস্বীকার করতেও পারি না। জাতিভেদের মত একটি দুর্মর সংস্কার ত্যাগ করা আজও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, আবার আধুনিক মন তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতেও পারে না। চন্দ্রনাথ প্রাচীন জাতিভেদের মধ্যে একটি আধুনিক লক্ষণ ('সাম্যবাদ') আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের আঘাতে আমাদের প্রাচীন ও গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা যতই বিপর্যস্ত হতে থাকে কর্মের সঙ্গে বর্ণের যোগ ততই ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে।[৪৯] তখন থেকেই প্রাচীন জাতিবিন্যাসের গুণাগুণ দিয়ে বিচার শুরু হয়। রামমোহন রায় জাতিভেদ প্রথাকে ঐহিক সুখের পরিপন্থী ও জাতীয় ঐক্যের বিরোধী মনে করেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়াচার্য রচিত জাতিভেদ প্রথা বিরোধী 'বজ্রসূচী উপনিষদ'-এর অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন (১৮২৭)। ডিরোজিও শিষ্যরা হিন্দুর অনাচরণীয় কার্য ও নিষিদ্ধ আহার গ্রহণ করে হিন্দুর জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর এবং (প্রথম জীবনে) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যশস্বী বাঙালীরা জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ৭ই আষাঢ় ১৭৮৩ শকাব্দে (=১৮৬১ খ্রী) রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে আইনের সহায়তায় সমাজে অসবর্ণ বিবাহ চালু করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কেশবচন্দ্র সেনের আন্দোলনে হিন্দুর জাতিভেদ প্রণালী সব থেকে বেশি আঘাত পায়। 'ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে ব্রাহ্মণ আচার্যের অপসারণ, উপবীত ত্যাগ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন এই তিনটি বিষয়ে কেশবানুচর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নবীন ব্রাহ্ম-নেতারা সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের অর্থ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য চাকুরির সুযোগ বিস্তার, দেশি গুড়ের পরিবর্তে মেশিনে পালিশ করা চিনির ব্যবহার, সমুদ্রযাত্রা (১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খুলে দেওয়ায় ব্যাপক হয়েছিল), কলকাতায় ট্রাম প্রবর্তন ও পরিস্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ কারণে হিন্দুর প্রাচীন জাতিভেদ প্রথা সেদিন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। এই সময়

জাতিভেদ সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষণাও শুরু হয়। লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধনির্ণয়' তার সাক্ষ্য। অন্য দেশের জাতিভেদের সঙ্গে এদেশের জাতিভেদের তুলনা, সেই সূত্রে বিদেশি 'অ্যাপ্রেনটিস্‌শিপ'-এর সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে বৃত্তিগ্রহণের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করে 'বঙ্গদর্শন'-এ (শ্রাবণ ৮০, কার্তিক ৮১) শ্রীধঃ স্বাক্ষরিত 'জাতিভেদ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ দুটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। শশধর তর্কচূড়ামণি, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি হিন্দুধর্মের নবব্যাখ্যাতারা জাতিভেদের জীর্ণ ও ভগ্ন দুর্গ সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। শশধরের মতে জাতিভেদ ঈশ্বরআদিষ্ট। ভূদেব প্রাচীন জাতিভেদের সমর্থক কিন্তু আন্তঃপ্রাদেশিক সবর্ণ বিবাহের পক্ষে রায় দিয়ে কিছুটা উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। চন্দ্রনাথ জাতিভেদের দুর্গকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন আধুনিক যুক্তির অস্ত্র সাজিয়ে। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় বলেছেন, 'জাতিভেদের প্রাণবায়ু চলিয়া গিয়াছে এখন আছে জাতিভেদের মৃতদেহ।...আমাদের দেশে ভূদেববাবু চন্দ্রনাথবাবু প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মাগণ জাতিভেদের মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া মহাদেবের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন।'[৫০] নিরপেক্ষ বিচারে এই মন্তব্য হয়ত সত্য কিন্তু ঐতিহ্যপন্থীরা যথার্থই মনে করতেন, জ্ঞানেন্দ্রলালেরই ভাষায় 'তখন চতুর্দিকে যেরূপ ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের গোলাগুলি ছুটিতেছে তাহাতে জাতিভেদ স্বরূপ দুর্গ হিন্দুসমাজের একমাত্র আশ্রয়, তাহার জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়'। হিন্দুর জাতিভেদের মধ্যেও চন্দ্রনাথ সমত্ববাদ ও মৈত্রীচেতনার প্রতিফলন লক্ষ করেছিলেন।

হিন্দুর মৈত্রী শুধু মনুষ্যসমাজের মধ্যে নয়, সমস্ত প্রাণিজগৎ ও বৃক্ষজগৎ পর্যন্ত প্রসারিত। হিন্দু বিশ্বাস করে বৃক্ষলতা মানুষেরই মত চৈতন্যবিশিষ্ট। পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুন্তলার সঙ্গে তপোবন প্রকৃতির বিচ্ছেদের কথা মনে করলে আমরা এই দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের সারবত্তা বুঝতে পারব। য়োরোপীয়রাও বৃক্ষলতার অনুরাগী কিন্তু তা কেবল গৃহের শোভাবর্ধক বলে; বৃক্ষ পুষ্পহীন হলে শোভার হানি হবে এই জ্ঞানে তাঁরা বৃক্ষমূলে জলসিঞ্চনও করেন। অন্যদিকে ভারতীয়রা তাদের তৃষ্ণানিবারণার্থ বৃক্ষলতার মূলে জলদান করেন। চন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণে সর্বত্র সমদর্শিতা নেই; তা সত্ত্বেও তাঁর চেতনায় যে মৌলিকতা ছিল বৃক্ষপ্রীতিতে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় মনোভাবের তুলনা থেকে তা বোঝা যায়।

হিন্দুধর্মের সর্বব্যাপী প্রীতিচিন্তার আবিষ্কারক বঙ্কিমচন্দ্র। চন্দ্রনাথে তা মৈত্রীচিন্তায় রূপান্তরিত।

বঙ্কিমচন্দ্র একদা লিখেছিলেন 'হনুমদ্বাবুসংবাদ' ('বঙ্গদর্শন', মাঘ ১২৮৩)। একই ব্যঙ্গ প্রবণতা থেকে চন্দ্রনাথ লেখেন 'পশুপতি সম্বাদ' ('বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৯০)। গ্রন্থটি পরে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন (চৈত্র ১২৯০ ; দ্বি-সং ১২৯২)।* গ্রন্থ প্রকাশকালে নামপত্রে লেখকের নাম ছিল না ; প্রকাশক হিসাবে লেখকপুত্র পরেশনাথ বসুর নাম ছিল। এই তথ্যটি আমাদের জানা আছে যে, 'পশুপতি সম্বাদ'-এর মাত্রাতিরিক্ত ব্যঙ্গ প্রবণতায় অসন্তুষ্ট হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

চন্দ্রনাথ স্বপ্নদর্শী ; ভূদেবের মত তিনিও স্বপ্ন দেখতেন যে এদেশে একজন জাতীয় কর্ণধার জন্মাবেন যিনি দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবেন কিন্তু তা পাশ্চাত্যানুকরণে হবে না, হিন্দুর প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস হবে তার ভিত্তি-ভূমি। চন্দ্রনাথ 'পশুপতি সম্বাদ'-এর আখ্যাপত্রে হিতোপদেশ থেকে যে দুটি চরণ[৫১] উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে লেখকের এই মনোভাব বোঝা যায়। সমকালে প্রকৃত দেশ প্রেমিকের অভাব এবং শৌখীন সমাজসেবী ও ভণ্ড দেশ প্রেমিকদের আবির্ভাব দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। তাই 'পশুপতি সম্বাদ'-এ তিনি একটি তির্যক বাকভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক মননজাত তত্ত্বয়পন্থী প্রবন্ধ রচনায় তিনি একভাবে পরিচিত ছিলেন, 'পশুপতি সম্বাদ'-এ তিনি অন্যভাবে ধরা দিলেন।

চন্দ্রনাথ 'পশুপতি সম্বাদ'কে বলেছেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। বইটির 'বিজ্ঞাপন'-এ তিনি জানিয়েছেন, 'উপন্যাসের আকারে ইতিহাস লিখিত হইল'। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি উপন্যাসের শিল্পমাধ্যমটি গ্রহণ করেছিলেন যদিও চেতনায় ঔপন্যাসিকের উপযোগী গভীর জীবনবোধের অভাব ছিল। ভাবীকালের ইতিহাস লেখককে গত শতাব্দীর একটি বিশেষ সময়ের ঐতিহাসিক উপকরণ

* সম্প্রতি অশোক রায় সম্পাদিত 'পশুপতি সম্বাদ'-এর একটি সংস্করণ (আষাঢ়, ১৩৯০) প্রকাশিত হয়েছে।

যোগান দেবার অভিপ্রায়ে তিনি এই গ্রন্থ লিখেছেন বলে 'উৎসর্গ'পত্রে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেন নি বা ইতিহাসের 'সত্য'কে প্রকাশ করতে পারেন নি ইতিহাসের সুখ্যাত ছাত্র চন্দ্রনাথ। এখানে উল্লেখ করা যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) তাঁর 'ভারত উদ্ধার' (১২৮৪) কাব্যের আখ্যাপত্রে 'ভবিষ্যৎ ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' শব্দ কটি বন্ধনীর মধ্যে বসিয়েছিলেন। বস্তুত চন্দ্রনাথের 'পশুপতি সম্বাদ' ইন্দ্রনাথের 'ভারত উদ্ধার' কাব্যের ধারায় লিখিত ব্যঙ্গধর্মী সামাজিক নকশা মাত্র।

ইন্দ্রনাথ-চন্দ্রনাথ-যোগেন্দ্রচন্দ্রের কাল প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের (১৮৩৮-৮৪) কর্মযুগ। ঐতিহাসিক বলেছেন, 'কেশবচন্দ্র সেনের নূতন ধর্মোন্মাদ ও সর্বধর্মসমন্বয় প্রয়াস ও নারী স্বাধীনতার কিঞ্চিৎ অপব্যবহার গোঁড়া হিন্দুদের মনে ভীষণ আতঙ্ক সঞ্চার করে ও তাহাদের প্রতিরোধ শক্তিকে নানা রূপে উত্তেজিত করে।'[৫২] ব্রাহ্মদের একই সঙ্গে পরিবার জীবনে দায়িত্বহীনতা ও সমাজসেবার আ্যন্তিক আগ্রহ, মৌখিক প্রগতিবাদ ও তার প্রয়োগে ভণ্ডামি, নারীর স্বাধীনতা ও নারীশিক্ষা প্রচারের নামে চরিত্র শৈথিল্যের প্রশ্রয় প্রভৃতি আচরণকে ইন্দ্রনাথ-যোগেন্দ্রচন্দ্রের মত চন্দ্রনাথও ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। এর সূচনা হয়েছিল অনেক আগেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) উপন্যাসে ব্রাহ্ম তারাচরণের প্রতি ব্যঙ্গের শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন। উত্তরজীবনে বঙ্কিম 'কালচার'-তত্ত্ব প্রচার ও দার্শনিক মননে নিবিষ্টচিত্ত হন এবং হিন্দুধর্মের প্রতি ব্রাহ্মধর্মীদের গ্লানি প্রচারকে উপেক্ষা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র নীরব ছিলেন বলেই তাঁর সাহিত্যানুচররা ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং বঙ্কিমের পরিত্যক্ত ব্যঙ্গাস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষকে প্রচণ্ড আঘাত দিতে এগিয়ে আসেন। এই আক্রমণ অনেকক্ষেত্রে শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। এঁদের ব্যঙ্গালোচনা অনেক সময়েই অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট। চন্দ্রনাথের অঙ্কিত পশুপতি দীক্ষিত ব্রাহ্ম নয়, 'নব্যপন্থী' ; কিন্তু তার তথাকথিত প্রগতিমূলক কার্যধারা ও জীবনপ্রণালী লেখকের তিক্ত ব্যঙ্গের লক্ষ্য।

'পশুপতি সম্বাদ'-এর কাহিনীর ধারাটি এখন অনুসরণ করা যেতে পারে— গোধনপুরের গোয়ালারা নাগরিক অসাধুতার প্রভাবে দুধে জল মিশিয়ে রাতারাতি বিত্তশালী হয়ে ওঠে। তার ফলে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ

পশুপতি-সম্বাদ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

(সংশোধিত হইয়া বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত)

যদি ন স্যাৎ নরপতিঃ সম্যক্ নেতা ততঃ প্রজা।
অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব॥

(যদি এই নরসমাজের সম্যক নেতা অধিপতি না থাকে তবে ইহা সমুদ্রে কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় নিমগ্ন হয়)—হিতোপদেশ।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানি কর্তৃক ৩৩ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট
বসু প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭ নং ঘোষের লেনে
শ্রীপরেশনাথ বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১২৯০।

চিত্র ৩ : 'পশুপতি সম্বাদ'-এর নামপত্র

সম্প্রদায়ের মানুষেরা হঠাৎ বড়লোক হবার নেশায় 'কলিকাতারূপ মহাতীর্থাভিমুখে' যাত্রা করল। স্থাণু গ্রামীণ জীবনের এই ভাঙন ও শহর-মুখিনতা সে যুগে ছিল একান্ত বাস্তব। এক্ষেত্রে চন্দ্রনাথ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সমকালের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনৈতিক জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তা প্রশংসাযোগ্য। এই গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ উমাপতি ভট্টাচার্যের ঘরে জন্মেছিলেন পশুপতি। বিদ্যার্থী পশুপতির পাঠশালায় গমন, পাঠে অমনোযোগ, বিবিধ প্রক্রিয়ায় গুরু নির্যাতন, মাত্রাতিরিক্ত মাতৃস্নেহ ও পিতার অসহায়তা ইত্যাদি বর্ণনা বৈশিষ্ট্যবর্জিত। বঙ্কিমের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ('বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১২৮৭)[৫৩] বা প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর (১৮৫৭) অনুরূপ বর্ণনার অতিরিক্ত কিছু এতে নেই। অবশেষে কালধর্ম অনুযায়ী ইংরেজি বিদ্যা আয়ত্ত করে পিতৃবংশ উজ্জ্বল করার জন্য পশুপতিকে কলকাতায় পাঠানো হল। ব্রাহ্মণ কুলতিলক উমাপতি কলকাতায় এসে 'এক অতি অপকৃষ্ট ও অপযশ-দূষিত পল্লীতে' প্রবেশ করলেন। চন্দ্রনাথ যেন বলতে চেয়েছেন নগরজীবনের ভোগোপকরণের মধ্যে চরিত্র রক্ষা করা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। পুত্র পশুপতির চরিত্রহীনতার পূর্বভূমিকা হিসাবে পিতা উমাপতির এই চরিত্র-শৈথিল্য তাৎপর্যপূর্ণ। পশুপতির গোধনপুর থেকে কলকাতায় আগমনে গ্রন্থের প্রথম ভাগের সমাপ্তি।

বিদ্যাচর্চায় আগ্রহহীন পশুপতির কলকাতা বাসও বিশেষ কার্যকরী হল না। বরং কলকাতার দুর্নীতিগ্রস্ত জীবনে তিনি অচিরেই অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে পার্শ্ববর্তী পরীক্ষার্থীকে ভয় দেখিয়ে কিছু উত্তর তিনি আদায় করলেন এবং বাকি জামার তলায় 'লুক্কায়িত পুস্তক' দেখে উত্তর করলেন। তাতে তিনি শুধু উত্তীর্ণই হলেন না, ছাত্রবৃত্তিও লাভ করলেন। এর পরই 'শিক্ষিত' ও সুযোগ্য পুত্র পশুপতির বিয়ে হতে দেরি হল না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা 'পাশ করা' পাত্রের জন্য ঋণ করেও কন্যাকে অলংকারাদি ও উপযুক্ত বরপণ দিয়ে কন্যার বিবাহ দিলেন। বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবনের অবক্ষয়ের একটি বাস্তব দিক লেখক উদ্‌ঘাটিত করেছেন।[৫৪] এ তাঁর বাস্তবদৃষ্টির স্মারক যদিও এ দৃষ্টি সর্বত্র সুলভ নয়। পশুপতি এবার নবোদ্যমে সমাজসংস্কারে নামলেন। গৃহে আশ্রয়দাতার অষ্টাদশী বিধবা কন্যা কুঞ্জকামিনীর গোপন বিদ্যাচর্চায় সহায়তার মাধ্যমে পরোপকারব্রত শুরু হল। বাইরে তিনি 'সাধারণের উপকারার্থ বক্তৃতা আদি

পার্টি' ও দেশের উন্নতির জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করলেন। তার জন্ত প্রথমেই পাড়ার ছেলেদের নিয়ে 'পটলডাঙা ডিবেটিং ক্লব' প্রতিষ্ঠিত হল। সপ্তাহান্তে শনিবার সেখানে হিন্দুর ধর্ম আচার ও প্রাচীন সামাজিক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে আলোচনা চলল এবং ইংরেজ রাজার হাত থেকে দেশোদ্ধারের বাসনা ঘোষিত হল। অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় বিষয়েই দীর্ঘ বক্তৃতা ইত্যাদি 'ভূমিতে পদাঘাত, টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত এবং কপালে করাঘাত' সহযোগে চলল। সমাজ-বিপ্লব অপেক্ষা মদের আকর্ষণ কম ছিল না। পশুপতি ও তাঁর সঙ্গীরাই বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দিত 'বাবু' সম্প্রদায় যাদের সম্পর্কে বঙ্কিম কিছু অবিস্মরণীয় মন্তব্য রেখে গেছেন। অবশ্য 'একেই কি বলে সভ্যতা'র (১৮৬০) 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা' ও তার সভ্যদের বারাঙ্গনা-বিলাস ও মগ্যাসক্তির কথা আমাদের সুপরিচিত। ভারতোদ্ধারের প্রবল বাসনা থেকে সাহিত্য ও সাহিত্যিক বাদ গেল না। এক্ষেত্রে প্রধান বক্তা পশুপতি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলের সাহিত্যই ক্রমান্বয়ে আলোচিত হল। বঙ্কিম নারীবিদ্বেষী, 'হিন্দু বিধবার শত্রু' ও হেমচন্দ্র 'নারী-উদ্ধার-বিনাশী' বলে নিন্দিত হলেন। হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' তাদের মতে দশ মহা অবিদ্যা বা দশজন বারবিলাসিনীর কথা। এইভাবে নব্যপন্থীরা সাহিত্যালোচনা করে চললেন। বলা বাহুল্য চন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ সব সময় সংযমে শাসিত হয় নি। ব্যঙ্গরস কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ বীভৎস হয়ে উঠেছে। সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধাবান বঙ্কিম এই জাতীয় রচনাকে যে প্রশ্রয় দেবেন না তা স্বাভাবিক। চন্দ্রনাথের 'পশুপতি সম্বাদ' শিল্পভ্রষ্ট বলেই বঙ্কিমের সমর্থন পায় নি। 'পটলডাঙা ডিবেটিং ক্লব'-এর সভ্যদের মতে ইন্দ্রনাথের 'ভারতোদ্ধার' শ্রেষ্ঠ কাব্য। কারণ পশুপতির বিশ্বাস 'ভারত উদ্ধার'-এ বর্ণিত পদ্ধতিতেই এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়ন ও দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার সম্ভব। চন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ এখানে তীক্ষ্ণতম রূপ লাভ করেছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ এখানে সমাপ্ত।

বৃদ্ধ পিতার অসুস্থতার সংবাদে 'পুত্রকুলতিলক' পশুপতি কলকাতা ত্যাগ করে গোধনপুরে যাত্রা করলেন। তার আগের দিনই আশ্রয়দাতার অষ্টাদশী বিধবা কন্যা কুঞ্জকামিনী নিরুদ্দিষ্টা হয়েছেন। ডিবেটিং ক্লাবের সুশিক্ষিত সদস্যরা উভয়ের তিরোভাবের মধ্যে 'সম্বন্ধনির্ণয়' করতে বসলেন। এদিকে শ্রীমতী কুঞ্জকামিনী 'সুরুচিসম্পন্ন দেশহিতৈষী সভ্য মহাশয়গণের

উদ্ধার প্রণালী' দেখে ঘৃণায় আত্মহত্যা করলেন। শৌখিন সমাজসেবী ও নারী স্বাধীনতা রক্ষাকারী যুবক সম্প্রদায়ের চরিত্র-শৈথিল্যের বর্ণনায় অতিরঞ্জনের চড়া রং লেগেছে। ব্রাহ্মরা একটি জীবন্ত আদর্শবাদ নিয়ে সমাজসংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন, সেখানে চরিত্রশৈথিল্যের কোনও স্থান ছিল না। পশুপতি এবার গ্রামে স্থায়ী হয়ে গ্রামের উন্নতি বিধানে উদ্যোগী হলেন। সভা অনুষ্ঠান, গোপবালাদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় এবং বিবাহিতা ও বিধবা নারীদের জন্য 'ফেমিনাইন নাইট স্কুল' অর্থাৎ 'মেয়েলি তামসিক বিদ্যালয়' প্রভৃতি স্থাপনার মধ্য দিয়ে দেশোদ্ধার ও নারী উদ্ধারের কাজ একই সঙ্গে চলল। আমাদের মনে পড়ে সমসাময়িক কালে কেশবচন্দ্র 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' (১৮৬৫), 'অন্তপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা', 'বামাবোধিনী সভা' (১৮৬৩), 'বামাহিতৈষিণী সভা' (১৮৭১-৭২) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁদের নারী প্রগতির উদ্যোগগুলি চন্দ্রনাথের ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। এই কর্মযজ্ঞে যিনি উপেক্ষিতা হলেন তিনি দেশজননী। লেখক অনাদৃতা দেশজননীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন একটি মোহময় পরিবেশে। তিনি লিখেছেন, 'দেখিলাম যেন জটাজুটধারী জীর্ণকায় তালবৃক্ষের উপরে সেই মলিন সন্ধ্যার মলিন সিন্দুর বর্ণে পাতার গায়ে পাতা পড়িয়া তিনটি অতি মলিন অক্ষর ফুটিয়াছে—জ-ন-নী।' স্বদেশপ্রেমের আবেগে লেখক-কণ্ঠ ঈষদ্ কম্প্র এবং ভাবে ও ভাষায় বঙ্কিমানুসরণও স্পষ্ট।

এদিকে 'মেয়েলি তামসিক বিদ্যালয়'-এর শিক্ষিকা হয়ে কলকাতা থেকে এলেন দুই ইংরেজ বিবি। তাঁদের আগমনে গোধনপুরের সমাজসেবী যুবকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ সঞ্চারিত হল এবং তাঁরা নিজ নিজ স্ত্রীর অলংকারাদি বিক্রি করে দুই বিবি শিক্ষিকার বেতন যোগাতে লাগলেন। সমাজসেবায় নিবেদিতপ্রাণ পশুপতি বরাবরই তুলনাবিহীন। তিনি মৃত্যু-পথযাত্রিণী কন্যার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়ে শিক্ষিকার বেতনের ব্যবস্থা করলেন। চন্দ্রনাথ এইভাবে পশুপতির চরিত্র থেকে মনুষ্যত্বের শেষ বর্ণটুকুও মুছে নিয়েছেন। এখানেই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের সমাপ্তি।

চতুর্থ ভাগে, সমাজসেবী পশুপতি সাহিত্যসেবী হয়েছেন এবং বঙ্কিমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে 'আশ্চর্য কাশীবাসী' নামে একখানি উপন্যাসও লিখে ফেলেছেন কিন্তু ক্রেতা জোটে নি। অবশেষে পৈত্রিক জমিজমা বিক্রি করে ছাপাখানার দেনা মেটানো হল। পশুপতি নিরুৎসাহ

না হয়ে উপন্যাস ছেড়ে কবিতা ধরলেন। এবং 'ভারতবাসীকে ভারতমাতার উদ্ধারার্থ জাগাইবার জন্য সেই অগ্নিময় কবিতা'গুলির কপিরাইট বিক্রয়ের জন্য কলকাতায় এলেন। শেষ পর্যন্ত সের দরে কাগজওয়ালার কাছে বইগুলি বিক্রি করতে হল এবং তারপর মশলার দোকান, জুতার দোকান এবং কাপড়ের দোকান মারফৎ সেই 'অপূর্ব উত্তেজক কবিতাগুলি হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল।' ছাপাখানার দেনার দায়ে তিনি অভিযুক্ত হন এবং বিচারে পশুপতির জেল হয়। সাবিত্রী নামে এক উদারহৃদয়া পশুপতির প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী গোপবালা (প্রসন্ন গোয়ালিনীর কথা মনে পড়ে) টাকার বিনিময়ে পশুপতিকে কারামুক্ত করেন। শেষে তাঁরা দুজনে মিলে বাঙ্গালাদেশ ত্যাগ করলেন। লেখকের টিপ্পনী, 'তখন দেশ যথার্থই উদ্ধার হইল'।

চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সম্বাদ' উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি লেখকের জীবনদৃষ্টিতে গভীরতার অভাব ছিল। লেখকের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অনুদার মনোভাব ও নীতিবাতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সামাজিক নকশা হিসাবেও তা সফল নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বিরক্ত হয়ে ১২৯০ সনের মাঘ সংখ্যার পর 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন। এর ১৮ বৎসর পর রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় যখন 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশিত হল তখন সম্পাদক 'সূচনা'য় ঘোষণা করেছিলেন—'ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ এবং সাহিত্য নীতির শৈথিল্য আমাদের পক্ষে অমার্জনীয়' ('বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১৩০৮) এখানে হয়ত 'পশুপতি সম্বাদ'ই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য।

'বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি' প্রথমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে (৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) পঠিত হয়। পরে মেডিকেল লাইব্রেরী পক্ষে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল (১৩০ বঙ্গাব্দ)। প্রবন্ধটিতে বাংলা লেখ্য রূপের আদর্শ নিয়ে চন্দ্রনাথের গভী চিন্তার পরিচয় আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই (১৮০১) প্রকাশিত 'কথোপকথন'-এর গদ্যে ভিত্তি ছিল হুগলী-শ্রীরামপুর অঞ্চলের কথ্য ভাষা। পরবর্তী কালে ফো উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যপুস্তক যোগান দেবার ভার পান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা

এঁদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেছেন।[৫৫] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) নিজে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হয়েও পণ্ডিতদের অবলম্বিত ভাষাদর্শকে সমর্থন করেন নি।[৫৬] তিনি তারাশঙ্কর তর্করত্নের (১৮৩১-৭৪) 'কাদম্বরী'র ভাষাকে নিন্দিত করেছিলেন। বাংলায় সাধু বা পণ্ডিতী রীতির প্রবর্তনায় বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের ভূমিকাই প্রধান। সে যুগের প্রভাবশালী 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার (১৮৪৩) ভাষা ছিল পণ্ডিতী সাধু ভাষা। 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-৮৬) ছিলেন বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত সাধু ভাষার একজন গোঁড়া সমর্থক।

অন্যদিকে 'কথিত বাংলা'র ভিত্তির উপর 'লিখিত বাংলা'কে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)। তিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর ১ম সংখ্যাতেই ঘোষণা করেছিলেন, 'অপভ্রংশ মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্রসমাজের কথোপকথনে সর্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ'।[৫৭] রাজেন্দ্রলালের এই ইচ্ছাকে রূপায়িত করেছিলেন রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০) ও প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮২) তাঁদের সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'র (১৮৫৪) মাধ্যমে। কথ্য ভাষাকে লিখিত ভাষায় রূপান্তরে রামনারায়ণ-মধুসূদন-দীনবন্ধুর লঘু নাটকগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)-র মধ্যপন্থী ভাষা সেকালের সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। যাঁরা আক্রমণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন অগ্রণী। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করতে পারেন নি। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ও 'মৃণালিনী'র (১৮৬৯) ভাষা সমালোচিত হয়েছিল রামগতি ন্যায়রত্নের (১৮৩১-৯৪) প্রথম খণ্ড 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এ (১৮৭৩)। কিন্তু বঙ্কিম হতোদ্যম হন নি। তিনি সংস্কৃত রীতির সংকীর্ণতা সম্বন্ধে প্রথমাবধি সচেতন ছিলেন। বঙ্কিমের রচনায় বাংলা সাধু রীতি ও তার প্রবর্তকের প্রতি বিরাগ অস্পষ্ট নয় এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় তিনি মৌখিক রীতি নির্ভর আলালী ভাষাকে আবেগপূর্ণ ভাষায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন।[৫৮] সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র হরপ্রসাদ

শাস্ত্রীয় পণ্ডিতী ভাষার প্রতি বিরাগের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বাংলা গদ্যে কথ্য ভাষা প্রচলনের পক্ষে তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন। ভাষা ব্যাপারে নব্যপন্থীরা সংস্কৃতকে পুরোপুরি বর্জন করতে চান। ফার্সী ও কথ্য শব্দ গ্রহণের প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল বেশি। এই নব্যপন্থীদের পুরোধা সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 'Calcutta Review' পত্রিকায় (Vol. 65, No 130, Yr. 1877, p. 395-417) 'Bengali Spoken and Written' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি রূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দ (তদ্ভব) রক্ষার পক্ষে এবং অরূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দ (তৎসম) গ্রহণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে শ্যামাচরণের সংস্কৃত বিমুখতার নিন্দা করেছিলেন কিন্তু শ্যামাচরণের একটি মতকে তিনি সমর্থন করে বলেছিলেন যে, 'যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য (দেশি ও বিদেশি শব্দ) তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণ-বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।'

কিন্তু কথ্য ভাষাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতা বাড়ার আশঙ্কা থাকে। সর্বজনগ্রাহ্য standard-এর অভাবে ভাষায় বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। এই কারণে 'পণ্ডিতবর' জন বীমস্ (১৮৩৭-১৯০২) বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের পক্ষে বাংলা ভাষার আদর্শ নিরূপণকল্পে একটি 'অনুষ্ঠান পত্র' প্রচার করেন। তিনি তাতে বলেছিলেন, 'সংস্কৃত আভিধানিক শব্দসমূহ প্রয়োগপূর্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা উচিত নহে, অথচ রূঢ় স্থানীয় কর্কশ এবং অশ্লীল বাক্যসকল সাধুভাষা হইতে বর্জিত হওয়া আবশ্যক।' এই উদ্দেশ্যে তিনি চেয়েছিলেন বাংলার 'বুদ্ধি বিদ্যাসম্পন্ন সাধুগণ' একত্রিত হয়ে য়োরোপীয় দেশের সাহিত্য অ্যাকাডেমির আদর্শে একটি সর্বজনগ্রাহ্য 'স্টাণ্ডার্ড' স্থির করুন। একটি সর্বসম্মত অভিধান সংকলনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। বীমসের ইংরেজি 'অনুষ্ঠান পত্র'টি সাধারণ্যে প্রচারিত হবার পূর্বেই তার একটি বঙ্গানুবাদ সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ 'বঙ্গদর্শন'-এ (আষাঢ় ১২৭৯) প্রকাশিত হয়েছিল।

জন বীমসের উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে চন্দ্রনাথের বক্তব্য বিচার করা যেতে পারে। তিনি তাঁর 'বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি' গ্রন্থে বাংলা

সাধু রীতির প্রতি তাঁর সমর্থন অপ্রকাশিত রাখেন নি। সমাজে ধর্মে সাহিত্যে রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী চন্দ্রনাথ ভাষা ব্যাপারেও রক্ষণশীল। তিনি শ্যামাচরণ প্রমুখ নব্যপন্থীদের রচনারীতির প্রতি সমালোচনায় কঠোর হয়েছেন। চন্দ্রনাথের মতে তাঁদের ভাষার প্রধান ত্রুটি ভাষায় স্বেচ্ছাচারিতার প্রাধান্য। তাঁদের লিখিত প্রবন্ধে ও পুস্তকে প্রায়শই 'গ্রাম্যতা ও অপভ্রংশপূর্ণ ভাষা' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপের পরিবর্তে স্থানীয় অপভ্রংশ রূপ প্রয়োগে এঁরা উৎসাহী। এই কারণে সর্বজনবোধ্য ক্রিয়াপদ 'করিলাম' ব্যবহার না করে 'করলুম', 'কল্লুম' বা 'কর়্' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের স্থানীয় রূপ সাহিত্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে অর্থ-বিভ্রান্তি অনিবার্য। পশ্চিম-বঙ্গের উপভাষা 'আমি কার্যটি কর়্' লিখিত হলে শ্রীহট্টবাসীর বোঝার পক্ষে অসুবিধা হয়। আবার শ্রীহট্টের উপভাষায় 'আমি কার্যটি করিতে পার্তাম না' বললে পশ্চিমবঙ্গবাসী অর্থ করবে 'করিবার ক্ষমতা হইত না'; কিন্তু প্রকৃত অর্থ 'করিতে পারিব না'। বস্তুত বাড়ির মধ্যে মানুষ ইচ্ছামত পোষাক ব্যবহার করে কিন্তু বাইরে সমাজে বের হবার সময় পোষাকে পারিপাট্য রক্ষা করে। চন্দ্রনাথের মতে মৌখিক ভাষা নির্বিচারে সাহিত্যে প্রযুক্ত হতে পারে না, তাকে ঈষদ্ সজ্জিত করে সাহিত্যের সামাজিক আসরে উপস্থিত করতে হয়। তাছাড়া, ভাষায় কথ্য রূপের প্রাধান্য দিলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাতে ভাষায় বিচ্ছিন্নতা বাড়ে এবং কালক্রমে অঞ্চলভেদে ভাষা (সেই সঙ্গে সাহিত্যও) স্বতন্ত্র হয়ে যায় যা জাতীয় ঐক্য বা 'সাহিত্যের সমতা'র বিরোধী। সুতরাং চন্দ্রনাথের বক্তব্য ভাষায় শব্দ ব্যবহারে এই জাতীয় স্বেচ্ছাচারিতা বর্জনীয়।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার পার্থক্য এত বেশি যে, একবার পূর্ববঙ্গের চিন্তাবিদ্‌রা সরকারের শিক্ষাবিভাগের কাছে তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র 'টেক্‌স্‌ট বুক কমিটি' গঠনের আবেদন করেছিলেন। সাহিত্যে অতিমাত্রায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল হলে এই জাতীয় ঐক্যবিরোধী মনোভাব দেখা দিতে বাধ্য। কি উপায়ে উভয় বঙ্গের সাহিত্যে সমতা (এবং সেই সূত্রে মনের ঐক্য) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় সে সম্পর্কে চন্দ্রনাথ গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় যে দুটি পৃথক বাগ্‌ধারা (idioms) বর্তমান তার মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করে অপরটি standard

হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এই গ্রহণ-বর্জনে বাংলা সাহিত্যের স্বার্থে স্থানীয় বা আঞ্চলিক আবেগ ও অভিমান বর্জনীয়। চন্দ্রনাথ পরিসংখ্যানের সাহায্য নিয়ে দেখিয়েছেন যে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তক তালিকায় যত বই তালিকাভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে ১২৪২ খানা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এবং মাত্র ২২০ খানা পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত। এই পরিসংখ্যান থেকেই জানা যাচ্ছে, সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রসর। অতএব লেখকের সিদ্ধান্ত, পূর্ববঙ্গকেই পশ্চিমবঙ্গের ধারাকে গ্রহণ করতে হবে। বঙ্গের রাজধানী ও সংস্কৃতিকেন্দ্র কলকাতার ভাষাই হবে বাংলা সাহিত্যের standard ভাষা। চন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণে বাস্তববোধের পরিচয় আছে এবং এই সিদ্ধান্ত সর্বজনগ্রাহ্য। রবীন্দ্রনাথও চন্দ্রনাথের অনুরূপ মত পোষণ করতেন বলে আমাদের জানা আছে।[৫৯] ভাষায় এই সংস্কার সাধন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন বাগ্‌ধারা সংকলন করা। অনুরূপ প্রস্তাব জন বীম্‌সের 'অনুষ্ঠান পত্র'-এ ছিল। প্রখ্যাত অসমীয়া ভাষাবিদ্ আনন্দরাম বড়ুয়া (১৮৫০-৮৯) এই অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনটি মেটাতে অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। চন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে আনন্দরাম বড়ুয়ার আরব্ধ কার্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য অগ্রণী হতে বলেছেন।

চন্দ্রনাথ তৎকালীন সাহিত্য ভাষার আর একটি অপেক্ষাকৃত গুরুতর ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। ইংরেজি শিক্ষিতরা যখন সাহিত্য রচনার ভার নেন, তখন শব্দবিন্যাস ও বাক্যগঠনে ইংরেজি ভাষার পদবিন্যাস ও শব্দসজ্জার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। চন্দ্রনাথ একদা 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষার উপর ইংরেজি প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন।[৬০] ইংরেজি প্রভাবিত ভাষা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনের বোধগম্য হয়; ইংরেজি-অনভিজ্ঞ অথচ সংখ্যাগুরু সাধারণ পাঠক তাঁদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। সুতরাং এ সাহিত্যও জাতীয় সাহিত্যের আদর্শভ্রষ্ট, 'সাম্প্রদায়িক সাহিত্য' মাত্র। এর পশ্চাৎবর্তী কারণটি হল, আমাদের জাতিগত হীনমন্যতাবোধ।

বাংলা ভাষায় মোটামুটি তিনটি রীতি অনুসৃত হতে দেখেছেন চন্দ্রনাথ। ১. পণ্ডিত শ্রেণীর অবলম্বিত সাধুরীতি ২. আঞ্চলিক ভাষানির্ভর কথ্যরীতি ৩. ইংরেজি বাগ্‌ধারা ও পদবিন্যাস রীতির প্রভাবে উদ্ভূত 'বিলাতী

বাংলা' রীতি। চন্দ্রনাথ সামান্য সংশোধনসহ সাধুরীতি গ্রহণের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। কারণ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা 'গ্রাম্যতাদির প্রয়োগ' করেন না, তার ফলে আঞ্চলিকতাদোষ তাঁদের অবলম্বিত রীতিতে নেই। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে অপরিচয়ের জন্য বিলাতী ধরনের বাংলা তাঁরা লেখেন না। সুতরাং চন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট মন্তব্য, 'তাঁহাদের রচিত সাহিত্যাংশ যথার্থই অতি বিশুদ্ধ, জাতীয় ভাবাপন্ন ও আদর্শবৎ'। তাঁদের ভাষার একটি ত্রুটির সংশোধন চেয়েছেন লেখক। 'সন্ধি-সমাসাদির সাহায্যে অনুচ্চার্য ও অপরিমিত দৈর্ঘ্যসম্পন্ন শব্দ রচনা'র প্রবণতা পরিত্যাগ করতে হবে। সাহিত্যের লোকহিতের ভূমিকা স্মরণ করে এই ত্রুটি সংশোধন করতেই হবে। জাতীয় সমতামূলক সাহিত্য রচনার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি। বেশ বুঝতে পারি, চন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা স্বদেশচিন্তা দ্বারা অনেকাংশে উদ্বোধিত।

'বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলে চন্দ্রনাথ তার একটি কপি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে কবির মতামত জানতে চেয়েছিলেন (পত্র, তারিখ ১৬ই শ্রাবণ ১৩০৬)। রবীন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি। তবে চন্দ্রনাথের বক্তব্য সমকালে অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ করে নি। চন্দ্রনাথ তাঁর আত্মকথায় জানিয়েছেন, 'একখানি জাত মাত্র মৃত মাসিক পত্র ভিন্ন এ পর্যন্ত আর কোথাও এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ দেখি নাই।'[৬১] আমাদের অনুসন্ধানে উদ্ঘাটিত হয়েছে চন্দ্রনাথ যে পত্রিকাটিকে 'জাত মাত্র মৃত' বলে উল্লেখ করেছেন সেই মাসিক পত্রিকাটি হল ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নির্মাল্য' পত্রিকা। এই স্বল্প-জীবী পত্রিকার অনেকগুলি সংখ্যায় জনৈক রামনাথ চক্রবর্তী 'বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও চন্দ্রনাথবাবু' শীর্ষক প্রবন্ধে চন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। আমরা এই দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার ৭টি সংখ্যা (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ৩য় বর্ষ, ১৩০৭ ; আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ, ৪র্থ বর্ষ, ১৩০৮) দেখেছি। লেখক রামনাথ চক্রবর্তী চন্দ্রনাথের লেখার ভঙ্গিতে যে 'আত্মম্ভরিতা' প্রকাশ পেয়েছে প্রধানত তারই প্রতিবাদ করেছিলেন। অপরপক্ষে ভারত-বিদ্যাবিদ্ জে. এফ. ব্লুমহার্ট চন্দ্রনাথের বক্তব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন (দ্র. পরিশিষ্ট : সমকালের দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথ সাহিত্য)।

চন্দ্রনাথের আত্মস্মৃতিমূলক রচনাগুলি সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে। এই জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' (১৩১৫), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (১ম ভাগ, ১৩১১) গ্রন্থে সংকলিত আত্মজীবন কথা এবং 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' ('প্রদীপ', আষাঢ় ১৩০৫) প্রধান। এই প্রসঙ্গে 'Oriental Miscellany' পত্রিকায় (অক্টোবর, ১৮৭৯) প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি রচনা 'Durga Puja in my boyhood' স্মরণীয়। রচনাটি 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে। 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগে 'সাহিত্য'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' প্রথমে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ'-এ (১৩২১) এবং পরবর্তী কালে সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র' (১৯৬৪) গ্রন্থে সংকলিত হয়। একমাত্র 'পৃথিবীর সুখদুঃখ'ই পৃথক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছিল; বাকী দুটি সংক্ষিপ্ত—প্রবন্ধাকারে লিখিত।

'পৃথিবীর সুখদুঃখ' পরিকল্পনাকালে রোগগ্রস্ত প্রৌঢ় লেখক গ্রন্থের নাম দিতে চেয়েছিলেন 'আমার শেষ কথা'। কিন্তু নামটি অমঙ্গলসূচক বলে প্রিয়জনদের মনঃপূত হয় না। তখন তিনি নাম দেন 'পৃথিবীর সুখদুঃখ'। গ্রন্থের আরও একটি নাম ছিল 'রোমন্থক মানব'। বৃদ্ধবয়সে লেখক বাল্য ও যৌবনকালের স্মৃতি রোমন্থন করে অন্তরে পরম সুখানুভব করছেন। সেই স্মৃতিসুখ ও মুহূর্তিক আনন্দবেদনা সমস্ত লেখায় ছড়িয়ে আছে। এটি চন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ রচনা। গ্রন্থের শেষাংশে লেখকপুত্র প্রকাশনাথ বসুর হস্তক্ষেপ আছে। 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' নামটিও তাৎপর্যময়। পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত সুখটুকু গ্রহণ করে আমরা সাধারণত দুঃখটুকু পরিহার করতে চাই। কিন্তু তত্ত্বদর্শী মানুষের কাছে সুখ ও দুঃখ সমভাবে কাম্য। কারণ দুঃখ কালব্যবধানে স্মৃতিযন্ত্রের মধ্যে একদিন আনন্দের মূর্তি ধারণ করে। চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পৃথিবীতে অসীম সুখ তো আছেই, আবার যে দুঃখ আছে তাহাতেও কি উচ্চ আনন্দ! এমন পৃথিবী কি হয়!' জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আজীবন ঈশ্বরবিশ্বাসী লেখক একখণ্ড ভক্তিশ্যামল ভূমি লাভ করেছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ঈশ্বরদত্ত সুখদুঃখকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছেন। তাই গ্রন্থনাম: 'পৃথিবীর সুখদুঃখ'।

চন্দ্রনাথ যখন এই গ্রন্থ লেখেন তখন আত্মজীবনী রচনার দুরূহ শিল্পমাধ্যমটি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' (২ খণ্ড, ১২৭৫), কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' (১৮৮৩), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯৮), রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৩০৮) প্রভৃতি লিখিত হয়েছে। জীবনীতে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ব্যবধান থাকে কিন্তু আত্মজীবনীতে এই ব্যবধান থাকে না; লেখকের মধ্যেই নিহিত থাকে লেখার উপাদান বা বিষয়। তাই সুমিতভাবে নিজেকে প্রকাশ করাই আত্মজীবনীর লক্ষ্য। অথচ অনেকেই এই বৈশিষ্ট্যের কথা বিস্মৃত হয়ে আত্মঘোষণা করেন অথবা নিপুণভাবে আত্মগোপন করেন। চন্দ্রনাথ এই দুরূহ শিল্পকর্মটি আয়ত্ত করতে পারেন নি; অনেকক্ষেত্রে আত্মঘোষণায় মুখর হয়েছেন। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটি আস্বাদ্য হয়েছে এই কারণে যে বৃদ্ধবয়সে স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে বাল্য ও যৌবনকালের যে সুখদুঃখ বর্ণনা তিনি করেছেন তার একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ সর্বজনীন রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' একান্তভাবে কবি রবীন্দ্রনাথের কিন্তু চন্দ্রনাথের সুখদুঃখ চন্দ্রনাথের এবং আমাদের সকলের।

লেখক একবার চক্ষুপীড়ার জন্য কর্ম থেকে সাময়িক অবসর নেন। তাঁর অবসর মুহূর্তগুলি নানা শৈশব স্মৃতিতে পূর্ণ হয়ে উঠত। স্মৃতি স্রোতে ভেসে আসা সেই বিশৃঙ্খল ও বন্ধনবিহীন ছবিগুলিকে শিল্পবন্ধনে বাঁধবার প্রেরণা থেকে 'পৃথিবীর সুখদুঃখ'-এর সৃষ্টি। চঞ্চল শিশুর গ্রাম্য পাঠশালার অভিজ্ঞতা, পার্শ্ববর্তী নোনাপোতা গ্রামের ভৌতিক রহস্য, হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র, সূর্যাস্ত রৌদ্র জ্যোৎস্না গাছপালা মাঠ মাটি ঘাস প্রভৃতিতে অলংকৃত গ্রাম্যপ্রকৃতির মধ্যে অবাধ সঞ্চরণ এবং প্রকৃতির কাছ থেকে প্রাপ্ত 'নির্মল শরীরী আনন্দ'-এর কথা চন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন প্রাণস্পর্শী নিরাভরণ ভাষায়। বাল্যকালের অনাবিল দৃষ্টিতে একদিন প্রকৃতির সৌন্দর্য ধরা পড়েছিল; আবার বৃদ্ধবয়সে সে সৌন্দর্য বহুগুণিত হয়ে নতুন মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে। লেখক বলেছেন, 'বাল্যকালের সৌন্দর্য বালকে বুঝিতে পারে না, বৃদ্ধে বুঝিতে পারে। বৃদ্ধে যখন বুঝিতে পারে, তখন বাল্যকালের সৌন্দর্য আরও সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়।' তা সত্ত্বেও আমাদের মনে হয়, শৈশবকালে দেখা প্রকৃতি-সৌন্দর্য চন্দ্রনাথের চেতনায় স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয় নি।

শৈশবকালের আর একটি স্মৃতিচিত্র তৎকালীন গ্রামবাংলায় দুর্গাপূজার

আনন্দোৎসব। পূজার বন্ধে শহর থেকে গ্রামে প্রত্যাবর্তন, প্রতিমার সাজসজ্জা, কাঙালী বিদায়, ঢাকির বাজনা প্রভৃতি স্মৃতিসুখ লেখককে আন্দোলিত করেছে। চন্দ্রনাথ সন্ধিপূজার যে বর্ণনা করেছেন তা ভাবে ভাষায় পরিবেশ রচনায় স্মরণযোগ্য কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। বিসর্জনের বিষণ্ণতা, নীলকণ্ঠ পাখী দেখা, নতুন জুতা ও কাপড় পরার শৈশবকালীন আনন্দ লেখক বৃদ্ধবয়সে স্মরণ করেছেন। বর্তমান কালে বাঙালী যে ভীষণতার সাধনা ও কঠোরতা এবং বলিদানের অলৌকিক মহিমা বিস্মৃত হয়েছে তার জন্য চন্দ্রনাথ দুঃখবোধ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাঙালীকে পুনরায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে; 'তান্ত্রিক প্রণালীতে মায়ের পূজা হউক, শক্তি সামর্থ্য সুখৈশ্বর্য আসিয়া পড়িবে'। শুধু অতীতের স্মৃতিচারণা নয়, ভবিষ্যতের 'দিব্যদর্শন'ও চন্দ্রনাথের ছিল।

কালীপূজায় 'পাকাটির আঁটি জ্বালাইয়া আঁজো পাঁজো' করার আহ্লাদ, ছুটি শেষে কলকাতায় ফেরার বিষণ্ণতা, আবার গ্রীষ্মাবকাশে মাছ ধরার ও বৈশাখী ঝড়ের শেষে বাগানে আম কুড়াবার নির্মল আনন্দ, পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীপূজা ও চড়ুইভাতির আমোদ লেখকের তুলিকা স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শীতকালের সকালে 'তাতারসিতে মুড়ি ভিজাইয়া' খাওয়ার বা পরীক্ষান্তে পড়ুয়া বালকের বন্ধনমুক্তির আনন্দও বাদ যায় নি। বস্তুত চন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত নয়, ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে নির্বিশেষত্ব লাভ 'পৃথিবীর সুখদুঃখ'-এর রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য।

যৌবনাগমনে লেখক বিবাহিত হলেন, স্ত্রী এল সংসারে গৃহলক্ষ্মীরূপে। সাধ্বী, অল্পে তুষ্টা সহধর্মিনীর সেবাপরায়ণতায় তিনি দুহাতে পৃথিবীর সুখ কুড়িয়েছেন। পুত্র-কন্যা-জামাতা পুত্রবধূ পরিবৃত্ত একটি নিরাবিল সংসারের অধিপতি তিনি। বার বার- তার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যৌবনকালের স্মৃতিচিত্রগুলিতে লেখকের আত্মঘোষণা বেশি। নিজেদের বার বার আদর্শ দম্পতি বলে ঘোষণা করায় আমরা কৌতুক বোধ করি।

চন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় তাঁর কর্মজীবনের নানা সংবাদ জানিয়েছেন। হাইকোর্টে ওকালতি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি, জয়পুর কলেজে অধ্যক্ষতা, বেঙ্গল লাইব্রেরীতে যোগদান এবং শেষ পর্যন্ত বাংলা সরকারের অনুবাদকের পদে স্থিতিলাভ ইত্যাদি বর্ণনা তাৎপর্যশূন্য ও একান্ত ব্যক্তিগত।

ইংরেজি জ্ঞান, নিজের কর্মদক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও সত্যাশ্রয়িতার কথা সগর্বে ঘোষণা করে আত্মচরিত রচনার একটি প্রধান শর্তই লঙ্ঘন করেছেন। তৎকালীন প্রধান প্রধান সরকারী ব্যক্তিদের প্রশংসাপত্র (testimonials) গ্রন্থমধ্যে সংকলন করায় আত্মবিজ্ঞপ্তির চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে। সমালোচক বলেন, 'সর্বক্ষেত্রে নিজের চিন্তা ও কর্মের তালিকা প্রদান, সর্বতোভাবে স্বপক্ষ সমর্থন খোঁজার প্রয়াস চন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর মূল্য কমিয়ে দিয়েছে।'৬২

বৃদ্ধ বয়সে চন্দ্রনাথ অনেকগুলি মৃত্যুশোক পেয়েছিলেন। তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু অন্যতম। 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' গ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর সদ্য লোকান্তরিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা 'তুলুমা'র উদ্দেশ্যে। উৎসর্গ পত্রের ভাষায় সন্তানবিয়োগবিধুর পিতার শোকাবেগ সঞ্চারিত হয়েছে—'তুলুমা, জন্মচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে তোমার একবার বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে হইয়া জন্মিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই সেদিন আমা-দের কাছে আসিয়াছিলে। আমাদের আদরে বোধ হয় তৃপ্তি হয় নাই। তাই শীঘ্র চলিয়া গেলে।' শোকাহত সংসারী মানুষটি এখানে আমাদের হৃদয়ের নিকটবর্তী হয়ে উঠেছেন। জীবনের দুঃখে চন্দ্রনাথ কাতর নন, দুঃখকে ভাঙিয়ে তিনি অনায়াসে সুখের স্বর্ণমুদ্রা গড়তে জানেন। ঈশ্বরবিশ্বাস তাঁকে দুঃখাতীত সুখের রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। 'জগৎ দুঃখময়' বহুশ্রুত এই উক্তির বিরোধী তিনি। এ বিষয়ে কবি শেলীর যে প্রাগুক্তি রয়েছে 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought' তার সংশোধন চান লেখক। চন্দ্রনাথের সংশোধন, 'Our sweetest songs are those that tell of purest thought.' বুঝতে পারি, সাহিত্যবোধ অবসিত হয়েছে, ঈশ্বরসন্ধানী হয়ে উঠেছেন 'পৃথিবীর সুখদুঃখ'-এর রচয়িতা।

দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও চন্দ্রনাথের 'পৃথিবীর সুখদুঃখ'-কে an expression of personality বলা যায়, কিন্তু 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে সংকলিত আত্মকথা সম্পূর্ণভাবেই an objective narrative, চন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকথায় জীবনের তথ্যপঞ্জী সাজিয়েছেন। 'জীবন' অপেক্ষা 'বৃত্তান্ত' অংশ এখানে প্রধান। নিজের জীবনকে তিনি দেখেছেন দূরস্থিত বস্তুরূপে। তার ফলে লেখায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছেন। নিজ জন্মসময়, পিতৃপিতামহ ও

মাতৃভূমি কৈকালার পরিচয় দিয়ে তিনি আত্মজীবনকথা শুরু করেছেন। কৈকালার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথাও বাদ যায় নি। নিজের শিক্ষাজীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রাম্য পাঠশালা ও 'হেদোর স্কুল'-এর (জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন্) দু-একটি কৌতুকতর বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন, তিনি লিখেছেন, 'আমাদের মাস্টার নস্য লইতেন, তাঁহার হাতে একটি নস্যদান থাকিত। আমি মনে করিতাম উহাতে গোমাংস আছে, কবে জোর করিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিবে'। ধর্মান্তরের কাল্পনিক ভয়ে শিশু চন্দ্রনাথ সংকুচিত হয়ে থাকতেন। সেখান থেকে এলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে সেকালের বিখ্যাত বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ে তিনি সেযুগের বিখ্যাত শিক্ষকদের কাছে পড়ার সুযোগ পান। বিশেষত নব্যপন্থী কৈলাসচন্দ্র বসুর স্নেহ সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। স্বনামখ্যাত শিক্ষক রিচার্ডসনের ক্লাসে (দ্বিতীয় শ্রেণী বা Preparatory class) Rogers এর 'Pleasures of Memory' নামক গ্রন্থ পাঠের অতুলনীয় অভিজ্ঞতার কথা বৃদ্ধ বয়সেও মনে ছিল। ওরিয়েন্টাল থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে ইতিহাসের শিক্ষকরূপে প্যারীচরণ সরকার এবং বাংলা ভাষার শিক্ষকরূপে মনীষী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে পান। এই সময় 'প্রিয় বন্ধু' সৈয়দ হোসেন বেল-গ্রামির সহযোগিতায় এবং শিক্ষক প্যারীচরণের 'অনুগ্রহে' Calcutta University Magazine প্রকাশ করেন এবং পত্রিকা সম্পাদনায় অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এই সময় ইংরেজিতে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ Englishman পত্রিকার প্রশংসা তাঁকে উৎসাহিত করে। নিজের তৎকালীন মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'ইংরাজীতে বেশী আকৃষ্ট হওয়ায় মনটা কতক ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছিল। একদিকে যেমন দেবদেবীতে বিশ্বাস ঘুচিয়া গিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি বাঙ্গালা লিখিতে অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল'। সত্যধর্মের অন্বেষণে এই সময় তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত শুরু করেন। অগুস্ত কোম্‌তের 'দুই-একখানা' বই পড়ে এবং পজিটিভিস্ট দ্বারকানাথ মিত্রের সংস্পর্শে এসে তিনি কোম্‌তের 'পজিটিভিজম্‌' মতবাদ গ্রহণ করেন কিন্তু সেখানে 'ঈশ্বর নাই' দেখে অন্তরে অতৃপ্তি থেকে যায়। চন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে আপনার মানস সংকটের বর্ণনা দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন কিন্তু

সেজন্ত কোথাও 'পৃথিবীর সুখদুঃখ'-এর অনুরূপ অহমিকা প্রকাশ করেন নি। বর্ণনা কোথাও আত্মঘোষণায় মুখর নয়, বরং নির্লিপ্ততার ছাপ আছে। তিনি কিছুদিন ওকালতি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি ও জয়পুর কলেজে অধ্যাপনা করে বঙ্গীয় সরকারের লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের পদে স্থিত হন। এই সময় **Calcutta Review** পত্রিকায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ইংরেজি সমালোচনার সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শুভ সংযোগ হয় এবং তিনি সাহিত্যসম্রাটের অন্যতম সাহিত্যানুচর হয়ে ওঠেন। বঙ্কিম তাঁকে বাংলা রচনায় উৎসাহিত করেন এবং তিনিও ইংরেজি ভাষা ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর মনে যে সংকট ছাত্রজীবন থেকেই চলছিল একসময় তাও দূর হয়ে গেল। বঙ্কিমের গৃহে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে চন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর বক্তৃতায় তিনি একটি বিশ্বাসের ক্ষেত্র পেয়ে যান যার মূল ভিত্তি হল, সর্বব্যাপী ধর্মবোধ—'বিশ্বে যাহা কিছু আছে সকলই ধর্মের অন্তর্গত'। চন্দ্রনাথের এই বিশ্বোপলব্ধি তাঁর জীবনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ঘটাল, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। নিজ জীবনের ক্রান্তিকালের বর্ণনা লেখক নিজেই দিয়েছেন কিন্তু কোথাও আবেগের স্পর্শ নেই। সহজ সত্যনিষ্ঠ ও সুমিতভাবে তিনি তাঁর অন্তর্জীবনের চিত্র উপস্থিত করেছেন যার ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম 'শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ' চন্দ্রনাথ ক্রমে তাঁর পূর্বজীবনের মত ও মনন প্রত্যাহার করেন এবং নতুন মনন ও চিন্তায় সজ্জিত হয়ে হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ সংরক্ষণে ব্রতী হন। চন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের ক্রমবিকাশের বর্ণনায় তাঁর আত্ম-কথার মূল্য আছে। বস্তুত চন্দ্রনাথের একান্ত গোপন লেখকসত্তার এমন উন্মোচন অন্যত্র দুর্লভ।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের (৮ই এপ্রিল ১৮৯৪) পর চন্দ্রনাথ লেখেন বঙ্কিম-স্মৃতিমূলক রচনা 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র'। রচনাটিতে বঙ্কিমের উপস্থিতি বেশি, লেখকের কম। সদ্য পরলোকগত বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধার্পণের যে উদ্দেশ্যে রচনাটি লেখা তাতে সেটাই স্বাভাবিক। স্বভাবগত গাম্ভীর্য ও প্রবল ব্যক্তিত্বের জন্য বঙ্কিম সহজভাবে জনতার সঙ্গে মিশতে পারতেন না। তার ফলে তাঁর মনন চিন্তা বিদ্যা প্রতিভা ও সাহিত্যকর্ম যত বেশি

আলোচিত হয়েছে ঠিক সেই পরিমাণে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক অনালোচিত থেকে গেছে। বাংলা সাহিত্যের অভিভাবক বঙ্কিমকে আমরা জানি কিন্তু মানুষ বঙ্কিমকে চিনি না। একবার বাল্মীকি রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য বঙ্কিমের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে চন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'বঙ্কিমবাবু কি বন্ধুবৎসল!' চন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বন্ধুবৎসলতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধাসম্রত ও সাহিত্য প্রতিভায় মুগ্ধ চন্দ্রনাথের আত্মোদ্ঘাটনের সংবাদও আমরা রচনাটিতে পাই। সমকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে অনাদর ও অবজ্ঞা প্রদর্শিত হত তাতে চন্দ্রনাথ ব্যথিত হতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর তিনি কৌতূহলী পাঠক। তিনি বলেছেন, 'দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া মনে হইল উহা স্কটের আইভান হো পড়িয়া লিখিত।' ইংরেজি সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক চন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেই এই সাদৃশ্য প্রথম ধরা পড়ে। পরবর্তী কালে তিনি বঙ্কিমকে এ সম্পর্কে প্রশ্নও করেছিলেন। 'মরকত কুঞ্জ'-এর কলেজ রি-ইউনিয়নের দ্বিতীয় সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা বিস্ময় ও মুগ্ধতা চন্দ্রনাথ 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র'-এ বিবৃত করেছেন। এর পর থেকেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহের পাত্র, কাছের মানুষ।

চন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার প্রধান অনুপ্রেরণা ও পথপ্রদর্শক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে ও হুগলীর বাসায় চন্দ্রনাথের নিত্য যাতায়াত ছিল। এই সময়ে আলাপে আলোচনায় আতিথেয়তায় বঙ্কিমের বন্ধুবৎসলতার রূপটি চন্দ্রনাথের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র'-এ চন্দ্রনাথ বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের স্বল্পপরিচিত এই দিকটি উদ্ঘাটিত করেছেন। চন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির সরল ও নিরাবেগ বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। এই রচনাটির আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি আন্তরিক সহৃদয়তা ও সরলতাগুণে সবিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। সাধারণ লেখকের হস্তে পড়িলে সুলভ ও শূন্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের আড়ম্বরে প্রবন্ধটি স্ফীতফেনিল হইয়া উঠিত।'[৬৩]

চন্দ্রনাথের সাহিত্যদীক্ষা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কিন্তু তাঁর মননগুরু ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪)। 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' গ্রন্থে তিনি ভূদেবকে 'আমার পরমারাধ্য আচার্যদেব' বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সমালোচকের মতে 'চন্দ্রনাথবাবুর শকুন্তলা বঙ্কিমবাবুর উত্তরচরিত সমালোচনা-উদ্বোধিত।'[৬৪] তাঁর 'ত্রিধারা' ও 'ফুল ও ফল' গ্রন্থে যে সাহিত্য প্রয়াস দেখা যায় তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর রচনাভঙ্গি প্রভাবিত। অন্যদিকে তাঁর 'গার্হস্থ্য পাঠ' (১২৯২, দ্বি-সং ১২৯৪), 'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি' (১২৯৪) ও 'সংযম শিক্ষা' (১৩১১) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১২৮৮) ও 'আচার প্রবন্ধ'-এর (১৩০১) ধারায় রচিত। জীবনের শেষ পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় যে উচ্চ দার্শনিক চিন্তা, তীব্র দেশানুরাগ ও গভীর ইতিহাসবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা চন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সেজন্য ভূদেবের লোকশিক্ষা-মূলক রচনাগুলি তাঁর আদর্শ হয়ে উঠেছিল; যদিও ভূদেবের মনস্বিতা ও জীবন-নীতির উত্তুঙ্গতা ছিল স্পর্শাতীত।

ভূদেব তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ'-এর (১৮৯২) 'নেতৃ-প্রতীক্ষা' অধ্যায়ে একজন মহান নেতার আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখেছেন যিনি আমাদের ঘরেই জন্মাবেন। কাজেই দেশবাসীর পক্ষে একটি কর্তব্য ভূদেব নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, 'আমাদের গৃহকে সর্বতোভাবে সেই আবির্ভাবোন্মুখ দেবতার পবিত্র মন্দিরের ন্যায় পরিষ্কৃত করিয়া রাখিতে হয়।'[৬৫] এই কারণে আমাদের পরিবার জীবনের সংস্কারকে তিনি ধর্মীয় কর্তব্যের অঙ্গীভূত করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধ'-এ ভূদেব বাঙালীর 'গৃহসূত্র' নতুন করে রচনা করেছেন।[৬৬] একই মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ করি চন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত গ্রন্থ তিনখানিতে। তাঁর 'গার্হস্থ্য পাঠ', 'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি' প্রকৃতপক্ষে গৃহ-বিজ্ঞানের (Home Science) বই। চন্দ্রনাথ একদিকে সমাজতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ দ্বারা যেমন সমাজের তথাকথিত প্রগতি প্রবাহে বাঁধ দিতে চেয়েছেন তেমনি ভাবী বংশধরদের জন্য গৃহকে পরিষ্কৃত রাখা ও সংস্কৃত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন। ভূদেব বলেছেন, 'আমাদের পরম পবিত্র পূর্বপুরুষেরা যেরূপ হোত্রের অগ্নিকে সর্বদা

সযত্নে রক্ষা করিতেন, সেইরূপ যত্নের সহিত সমগ্র পরিবারের ভিতর নৈতিক ভাবের প্রাধান্য সাবহিত হইয়া রক্ষা করিতে হইবে।'[৩৭] অনুরূপ মনোভাব থেকে চন্দ্রনাথও 'গার্হস্থ্য পাঠ'-এর 'অবতরণিকা'য় জানিয়েছেন—

'আমাদের চরিত্র, অবস্থা ও জীবনপ্রণালী সর্বাংশে ভাল নয়। তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, আমাদের গৃহপ্রণালীও সর্বাংশে ভাল নয়।... গৃহপ্রণালী সংশোধন না করিয়া কেবল মুখের কথায়, বাচনিক উত্তেজনায় লিখিত উপদেশে বা অপর কোন উপায়ে আমাদের চরিত্র, অবস্থা ও জীবন-প্রণালী সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা বিফল হইবারই কথা।... আমাদের গৃহপ্রণালীর দোষ সংশোধন করিয়া তাহাকে নির্দোষ করিতে হইবে। তাই এই গার্হস্থ্য পাঠ লিখিলাম।'

গৃহবিজ্ঞান জাতীয় রচনাগুলি লেখকের এই উদ্দেশ্য দ্বারা চিহ্নিত। চন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তক হিসাবে 'গার্হস্থ্য পাঠ', 'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি' ও 'সংযম শিক্ষা' লিখেছিলেন। অর্থপ্রাপ্তির বাণিজ্যিক মনোভাব অবশ্যই ছিল, কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে দেশ ও জাতিগঠনের আগ্রহ। তিনি আরও বলেছেন, গার্হস্থ্য প্রণালী সুন্দর সুখময় স্বাস্থ্যজনক চরিত্রের এবং পারিবারিক ও জাতীয় উন্নতির অনুকূল হয়', সেই উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। শুধু শিক্ষার্থী বালক-বালিকা নয়, বয়স্কদের জন্যও তিনি গ্রন্থখানি অবশ্যপাঠ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আমাদের গৃহপ্রণালীর খুঁটিনাটি কিছুই লেখক দৃষ্টির বাইরে যেতে দেন নি, সব বিষয়েই উপযুক্ত ও যুগোপযোগী সংস্কার চেয়েছিলেন।

লেখকের দেশ ও জাতি গঠনের জন্য আকাঙ্ক্ষার ও উচ্চ আদর্শবাদের প্রতিফলন ঘটায় পাঠ্যপুস্তক জাতীয় গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও 'গার্হস্থ্য পাঠ' তুচ্ছতায় অবনমিত হয় নি। প্রথম পাঠে, 'গৃহ পরিষ্কার রাখার কথা'য় লেখক সৌন্দর্যবোধ ও সামঞ্জস্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা গৃহমার্জনা করে থাকেন প্রধানত 'শুচি সম্বন্ধীয় সংস্কার'-এর জন্য। কিন্তু 'যাহাতে গৃহ দেখিতে খারাপ হয় তাহা দ্বারাই গৃহ অপরিষ্কার হয়'। সুতরাং একটি সৌন্দর্যবোধ থেকে গৃহকে সুসজ্জিত করা উচিত এবং বিভিন্ন বস্তুর সমাবেশে একটি সামঞ্জস্যবোধ থাকা প্রয়োজন। চন্দ্রনাথ বলেছেন, এজন্য সর্বাগ্রে আমাদের আলস্য বর্জন করতে হবে ও শ্রমশীলতা শিখতে হবে। বৃহত্তর কর্মের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার উপযুক্ত স্থান আমাদের

গৃহ। পঞ্চম পাঠে, 'অন্ন-ব্যঞ্জনের কথা'য় শিশু-স্বাস্থ্যের উপর জোর দিয়েছেন লেখক। আমাদের দেশে সাধারণত বৃদ্ধ ও প্রবীণদের খাত্তাদির ব্যাপারে যে যত্ন নেওয়া হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে তা নেওয়া হয় না। চন্দ্রনাথের মতে 'এ সংস্কার বড়ই ভ্রমাত্মক'। আমাদের গৃহে বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ খাত্তাদির ব্যাপারে আমাদের অমনো-যোগ। অষ্টম পাঠে, 'স্নান করিবার কথা'য় ধর্মীয় আচারের উপরেও স্বাস্থ্যকে স্থান দিয়ে প্রাগ্রসর চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। তিনি বলেছেন, 'স্নান করিয়া অধিকক্ষণ জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করাও ভাল নয়। জল হইতে উঠিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করা কর্তব্য।' নবম পাঠে, 'গৃহধর্ম করিবার কথা'য় চন্দ্রনাথের আধুনিক মনোভাবের প্রকাশ আছে। তিনি বাঙালীর গৃহকর্মে কর্মবিভাগ ও সুশৃঙ্খলা চান। বস্তুত তিনি আমাদের স্থাণু গৃহপ্রণালীর যুগোচিত সংস্কার চেয়েছেন। আমরা জানি, তিনি অন্যত্র পরিবর্তনবিমুখ ও সংরক্ষণপন্থী, অথচ জাতির সুস্বাস্থ্যের কারণে তিনি যে কোন রকম পরিবর্তন কামনা করেন। নব্যহিন্দুপন্থীরা যে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন তার জন্যই চন্দ্রনাথ কখনও কখনও যুগোচিত সংস্কার চেয়েছেন। দশম পাঠে, 'গার্হস্থ্য পাঠের তত্ত্বকথা'য় চন্দ্রনাথ বাঙালীকে শ্রমশীলতা ক্ষিপ্রকারিতা ও 'বুদ্ধি প্রয়োগ'-এর দ্বারা দেশগঠনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ক্ষুদ্র গৃহকাজেই সেই শিক্ষার সূচনা হোক্।

'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি' (১২৯৪) প্রকৃতপক্ষে পৃথক গ্রন্থ নয়। 'গার্হস্থ্য পাঠ'-এর প্রথম সংস্করণে ৮টি পাঠ ছিল। তার মধ্য থেকে ৪টি পাঠ (রান্নাঘরের কথা, অন্নব্যঞ্জনের কথা, ভোজনের কথা ও শয়ন করিবার কথা) 'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি'তে স্থান পেয়েছে এবং দুটি নতুন পাঠ (স্নান করিবার কথা ও কাপড় পরিবার কথা) রচিত হয়ে 'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি'তে ও 'গার্হস্থ্য পাঠ'-এর ২য় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়। সম্ভবত তিনি ক্ষুদ্র ও সহজতর গৃহ-বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশের প্রেরণায় 'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি' সংকলন করেছিলেন। গার্হস্থ্য পাঠের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০১ ; কিন্তু স্বাস্থ্যবিধির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮। 'গার্হস্থ্য পাঠ'-এর তত্ত্বালোচনা এখানে বর্জিত হওয়ায় 'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি'-র সহজবোধ্যতা ও ব্যবহারোপযোগিতা বেড়েছে।

বাংলা গদ্যের জন্মলগ্নেই পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়াস ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান রথীরা পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন। ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮১) ও 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৪) মূলত বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই পরিকল্পিত। চন্দ্রনাথ তৎকালীন শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সব সময়ে শিক্ষা বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সমিতির সদস্য তিনি, পরীক্ষক হিসাবেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৬৮] বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনায় বৃত হন। সেই সঙ্গে ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে জীবনের প্রভাতকাল থেকেই তাদের জীবনের মূল সুরটি বেঁধে দেবার প্রেরণাও ছিল। 'গার্হস্থ্য পাঠ' ও 'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি' রচনা করে তিনি আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গৃহবিজ্ঞান (Home Science) চর্চার সূত্রপাত করেন। তিনি শিশুদের জন্য 'কিণ্ডার গার্টেন' শিক্ষা-পদ্ধতির কথাও বলেছিলেন।[৬৯] দুটি পদ্ধতিই সাম্প্রতিক কালে আমাদের শিক্ষাপরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বেই চন্দ্রনাথ তৎকালে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এই পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন।

উপর্যুক্ত গ্রন্থ দুখানি অনেকাংশে ব্যক্তি নিরপেক্ষ রচনা কিন্তু 'সংযম-শিক্ষা'য় (১৩১১ ; দ্বি-সং ১৩১৮) লেখকের নিজস্ব ভাবনা স্বপ্ন-কল্পনা অনেক পরিমাণে ধরা পড়েছে। 'সংযমশিক্ষা' এ জাতীয় অপর গ্রন্থ দুখানির তুলনায় উন্নত সৃষ্টি। গ্রন্থটিকে চন্দ্রনাথের অন্যান্য মননশীল প্রবন্ধের সঙ্গে অনায়াসে মিলিয়ে নেওয়া যায়। তাঁর অনেকগুলি সাহিত্যিক বক্তব্য এখানেও উক্ত হয়েছে। আহারে লুব্ধতা পরিত্যাগ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংযমের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেছিলেন 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে। কিন্তু শাস্ত্রে যে উচ্চ ও কঠিন সংযমের নির্দেশ আছে তা সাধারণের পক্ষে পালনীয় নয় বলে তিনি 'সংযমশিক্ষা' গ্রন্থে প্রাত্যহিক জীবনে আচরণীয় কতগুলি বিষয়ে সংযম অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন। লেখক বলেছেন, 'যে সংযম আগে সাধিত না হইলে, অপর সমস্ত সংযম অসাধ্য ও অসম্ভব হয়। তাই গ্রন্থের 'সংযম-শিক্ষা বা নিম্নতম সোপান' এই নামকরণ করিলাম'। (১ম অ, পৃ. ৫)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, 'সংযমের সূত্রপাত' প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ সংক্ষেপে জন্মতত্ত্ব ও বংশধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যায়, সঞ্জীবচন্দ্রের

বৈজ্ঞিকতত্ত্ব 'বঙ্গদর্শন'-এ (অগ্র, পৌ, চৈ, ১২৪৮ ও বৈ, শ্রা ১২৮৫) প্রকাশিত হলে বাংলাভাষায় 'জেনেটিক্‌স-এর আলোচনায় সূত্রপাত হয়। চন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন শিশুরা জন্মসূত্রে পিতৃকুল বা মাতৃকুলের কোন না কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। ভারত যে একদা 'হস্ত সম্পাদিত শিল্পকার্য-এ জগৎ বিখ্যাত হয়েছিল তার প্রধান কারণ বৃত্তি অনুযায়ী এদেশের জাতি বিভাজন। সে যাই হোক, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যাতে বংযমী হয় তার জন্য তিনি পিতামাতাকে সংযমের অনুশীলন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

'আহারে সংযম শিক্ষা'র কথা বলেছেন চতুর্থ অধ্যায়ে। এই প্রবন্ধে 'সাহিত্যে আহার' শীর্ষক আলোচনায় অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, য়োরোপীয় সাহিত্যে আহারের কথা বিস্তারিতভাবে লিখিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্যে তার সীমিত বর্ণনা পাই ; কারণ প্রাচীন ভারতে আহারের কথা নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হত। বাঙালী অধঃপতিত জাতি এবং তার অধঃপতন ক্রমপ্রসরমান। তাই দেখা যায়, ভারতচন্দ্রের রন্ধনের বিবরণ মুকুন্দরামের বিবরণ থেকে দীর্ঘ। এ থেকেই বোঝা যায়, মুকুন্দরামের কাল অপেক্ষা ভারত-চন্দ্রের কাল ক্রমঃ অধঃপতিত। লেখক দেখেছেন উনবিংশ শতাব্দীর 'বাঙালীর সাহিত্যে রন্ধনশালার প্রতি লোলুপদৃষ্টি।' তাই এই শতাব্দীর অধঃপতন আরও বেশি। এখন আমরা খাদ্যাখাদ্য বিচার করি না বা সময়াসময় মানি না। পঞ্চম অধ্যায়ে, 'পরিধানে সংযম শিক্ষা' সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন আজকের দিনেও তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় নি। নিজ কালের কথায় তিনি বলেছেন, 'আমাদের পুরুষেরা মেয়ে হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের কেশ-বিন্যাসেও তাহা দেখি—কেশ লইয়া তাহারা ব্যতিব্যস্ত—কত কষ্ট করে।' বঙ্গরমণীও আজ নিত্যনতুন 'ফ্যাসনে' উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তারা নিত্য নব বস্ত্রালংকারের মোহে মুগ্ধ ও অভিভূত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, 'আমোদে সংযমশিক্ষা' প্রসঙ্গে বলেছেন, কর্মক্লান্ত মানুষের মনের অবসাদ দূর করার শ্রেষ্ঠ উপায় আমোদ। য়োরোপীয়রা কর্মশীল তাই তাদের আমোদ প্রয়োজন কিন্তু যেহেতু আমরা কর্মত্যাগ করেছি তাই আমাদের আমোদের প্রয়োজন নেই। অথচ আমরা পাশ্চাত্য অনুকরণের ফলে আমোদপ্রিয় ; কলকাতা শহরে থিয়েটার ও নাট্যশালার সংখ্যাবৃদ্ধি সেই আমোদপ্রিয়তার সাক্ষ্য। চন্দ্রনাথ থিয়েটার ও নাট্যশালার বিরোধী। যেহেতু তা কুশিক্ষার সহায়তা করে মাত্র। চন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ভূদেবের দ্বারা

প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভূদেব অনুরূপভাবে বলেছেন, 'দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা এক্ষণে দরিদ্রজাতি। আমাদের সুখোপভোগ চেষ্টা ভাল নয়। গান বাজনা আমোদ প্রমোদ বিজয়ী ধনশালী প্রবল-প্রতাপ ইংরাজদিগকে সাজে; আমাদিগের মধ্যে গান তামাসা নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোনমতেই সাজে না।'[৭০]

'ঔৎসুক্য, উৎকণ্ঠা, উল্লাসাদিতে সংযমশিক্ষা' অধ্যায়ে তিনি বিবাহে উল্লাস বর্জন করতে বলেছেন। বিবাহে 'আলোককাণ্ড ও ভোজবাহুল্য' প্রভৃতির ফল মারাত্মক। এর ফলে বিবাহ যে সাত্ত্বিক ক্রিয়া এবং শাস্ত্রনির্দিষ্ট সংস্কার তা বিস্মৃত হয়ে নবদম্পতির মনে এই ধারণা বলবতী হয়ে ওঠে যে বিবাহ বিলাসের সামগ্রী, আনন্দোপভোগের উপকরণ মাত্র। চন্দ্রনাথ আজীবন হিন্দুবিবাহের শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষার পক্ষপাতী। লেখকের এই আদর্শবাদী মনটি এখানেও প্রকাশিত।

'উপসংহার' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখকের কণ্ঠ আবেগকম্প্র। তিনি বলেছেন, পার্থিব অহংকার, অভিমান, ঈর্ষা, ক্রোধ মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে দেয় না। 'দুইটি কণ্টকাকীর্ণ যষ্টিকে দৃঢ়রূপে বাঁধা যায় না'। একমাত্র সংযম-শিক্ষার মধ্য দিয়েই আমরা এই কণ্টক নির্মূল করতে পারি। চন্দ্রনাথ জানেন, সংযমের অভ্যাসে বাহ্যজগতের মোহ কাটে ও আধিপত্য কমে বটে কিন্তু অভ্যাসের ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই জন্য সংযমের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাবকেও গাঢ় ও সজীব করে তুলতে হবে এবং তাকেই করতে হবে জীবনের দৃঢ় পাদপীঠ। বর্তমান ভারতের প্রাণশূন্য শক্তিশূন্য ধর্মে এইভাবেই সজীব প্রাণময়তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

চন্দ্রনাথ আরও অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত ৪ খণ্ডে বিভক্ত 'সাহিত্যপুস্তক' বাংলা দেশের বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠের জন্য তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তার (ডি. পি. আই) অনুমোদন পেয়েছিল। আমাদের পক্ষে 'সাহিত্য পুস্তক'-এর ৩টি খণ্ড দেখা সম্ভব হয়েছে। বাকি ১টি খণ্ড দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট 'সাহিত্য পুস্তক'-এর ওই খণ্ডটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে চারুযন্ত্রণযন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। মূল্য আট আনা। গ্রন্থটি সম্ভবত ছিল দ্রুতপঠন (Rapid reader) জাতীয়।

'সংযমশিক্ষা'য় চন্দ্রনাথ শৈশবে শিশুদের সুকথা শোনাবার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'পুরাণ পুণ্যকথায় পরিপূর্ণ, রামায়ণ-মহাভারত ভাবমাহাত্ম্যে অতুলনীয়। ঐ সকল গ্রন্থ নিত্যকর্মের ন্যায় নিত্য পঠিত হইবে আর ঐ সকল গ্রন্থের শ্রেষ্ঠাংশ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলের হাতে প্রদত্ত হইবে।' ('সংযমশিক্ষা', ৫ অ, পৃ. ৫৮) অনুরূপ মন্তব্য বিবেকানন্দের কণ্ঠেও শোনা গেছে।[৭১] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এদেশে বিদ্যাসাগর শিশু পাঠ্য রচনায় পথপ্রদর্শক। কিন্তু তিনি প্রধানত পাশ্চাত্য নীতিগর্ভ কাহিনীগুলিই অনুবাদ করেছিলেন। এই কারণে 'বঙ্গদর্শন' বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে কটাক্ষ করেছিল।[৭১] চন্দ্রনাথ 'সংযম-শিক্ষা'য় উল্লিখিত প্রেরণা বশে মহাভারত থেকে একটি কাহিনী, রামায়ণ থেকে ১৪টি কাহিনী এবং বঙ্কিম-হরপ্রসাদ-রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ সংকলনে গ্রহণ করেছিলেন। স্বপ্রণীত 'দেবধর্মী মানব'ও 'পাঁচখানি পুরাতন চিত্র' নামিত শিরোনামে এখানে স্থান পেয়েছে।

'সাহিত্যপুস্তক' (৪র্থ ভাগ) তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক। এই খণ্ডটি স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী থেকে ব্রজমোহন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য সাড়ে পাঁচ আনা। পুস্তকখানি ২টি অংশে বিভক্ত। বিষয়বস্তু নির্বাচনে লেখকের সজাগ দৃষ্টি ও যত্নের পরিচয় আছে। গ্রন্থের প্রতিটি অংশ আবার কয়েকটি সুস্পষ্ট ভাগে বিন্যস্ত।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট অংশের প্রথম ভাগে ভারতীয় ইতিহাস থেকে সংকলিত মহাপুরুষ চরিত্র যেমন, জীবে দয়া (বুদ্ধদেব), ন্যায়পরায়ণতা (গিয়াসউদ্দীন, সুলতান আমেদ), নিমাই, রঘুনাথ প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে, প্রখ্যাত মানুষের জীবনী ; যেমন, ডেভিড হেয়ার, নাসিরুদ্দিন মামুদ ও দ্বারকানাথ মিত্র। সংকলক খ্রীস্টান মুসলমান ও হিন্দু মনীষীদের স্থান দিয়ে ধর্মীয় নিরপেক্ষতা রক্ষা করেছেন। তৃতীয় ভাগে, নীতিমূলক গল্পসমষ্টি। চতুর্থ ভাগে, ঈশ্বর গুপ্ত শিবনাথ শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ কবিদের কবিতা সংকলিত।

চতুর্থ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট অংশের প্রথম ভাগে রয়েছে ভারত-ইতিহাসের কয়েকটি চরিত্র। যেমন, মহারাজ শিলাদিত্যের কাহিনী। দ্বিতীয় ভাগে মনীষী জীবনী ; যেমন, জগন্নাথ তর্কালংকার, গ্রাণভিল সার্প, হাজী মহম্মদ মহসীন। তৃতীয় ভাগে, নীতিমূলক কাহিনী ও চতুর্থ ভাগে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা।

শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট করা ছিল লেখকের লক্ষ্য। পঞ্চম ভাগে, আমাদের প্রতিবেশী জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের বর্ণনা। ষষ্ঠ ভাগে, কবিতা, একটি ছাড়া সবই রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

'সাহিত্য পুস্তক'-এর ৪র্থ ভাগে যে গল্পকাহিনীগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলি চন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন ; কেবল কবিতাগুলি তিনি অন্যের রচনা থেকে গ্রহণ করেছিলেন। শিশুবোধ্য কাহিনী রচনায় যে চন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল তার প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়।

চন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র হরনাথ বসু ও প্রকাশনাথ বসু চন্দ্রনাথের বিবিধ রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ নিয়ে 'চন্দ্রকণা' নামে একটি চয়নিকা গ্রন্থ প্রকাশ করেন (২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫)। সংকলকদ্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও সংযোজিত করেছিলেন যেখানে তাঁরা জানিয়েছিলেন, 'পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺চন্দ্রনাথ বসু মহোদয় বিরচিত গ্রন্থাবলী হইতে কণা কণা আহরণপূর্বক এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত গঠিত। তাই ইহার নাম 'চন্দ্রকণা'।' বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ ধরে দেবার প্রেরণায় 'চন্দ্রকণাও চন্দ্রনাথবাবুর রচনারাশি হইতে বিন্দু সংগ্রহে সপ্লাত'। চন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ থেকে ছাত্রোপযোগী উদাহরণ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে সংকলিত চন্দ্রনাথের আত্মকথা এবং 'প্রদীপ'-এ (১ম ভাগ, ১৩০৫) প্রকাশিত 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য চন্দ্রনাথের জীবনী, বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও চন্দ্রনাথের রচনাবলীর সঙ্গে এদেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরিচিত করা। এ ছাড়া গুরুতর কারণও ছিল। ভূমিকায় সম্পাদক জানিয়েছেন—

'সাহিত্যালোচনায় উদ্দেশ্য প্রধানত চারিটি— ১. ভাষাশিক্ষা ২. চরিত্র গঠন ৩. বিশুদ্ধভাব ও প্রকৃত সৌন্দর্যবোধের বিকাশ সাধন ৪. বিচার-ক্ষমতার উদ্বোধন।' এজন্য সংকলনে চন্দ্রনাথের রচনাবলী থেকে 'সর্বসাধারণের বোধগম্য সহজভাষা' (যেমন, 'পৃথিবীর সুখদুঃখ') এবং মাধুর্য গাম্ভীর্য ও লালিত্যপূর্ণ পদাবলী' (যেমন, 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'ত্রিধারা', 'ফুল ও ফল') স্থান পেয়েছে। ছাত্রদের চরিত্র গঠনের সহায়ক ধ্রুব, উশীনর, দুষ্মন্ত, কণ্ব, সাবিত্রী ও শকুন্তলা প্রভৃতি আদর্শ পৌরাণিক

চরিত্রগুলি এখানে সংকলিত। ছাত্রদের চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন ছাত্রজীবনে কঠোর সংযমশিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য পালন এবং জীবনব্যাপী 'সৌন্দর্য-সাধনা'। আমাদের দেশের বালকদের চিত্তোন্নতি যাতে হয় ও সৌন্দর্যদর্শন ক্ষমতা যাতে বাড়ে সেজন্য চন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক রচনা থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি, ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন বিচারশক্তির উদ্বোধন ও বিকাশ যাতে হয় সেদিকেও সংকলকদের লক্ষ্য ছিল। চন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ 'শকুন্তলাতত্ত্ব' ও 'সাবিত্রীতত্ত্ব' জাতীয় মননশীল যুক্তিপূর্ণ রচনা সেই কারণে উদাহৃত।

'চন্দ্রকণা'য় চন্দ্রনাথের দার্শনিকতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বমূলক রচনাগুলি স্বাভাবিক কারণেই বাদ গেছে। তা সত্ত্বেও সংকলিত রচনাগুলির মধ্যে চন্দ্রনাথের বিবিধমুখী প্রতিভার পরিচয় বিধৃত। সম্পাদকদ্বয় সঙ্কলিত রচনাগুলিকে বর্ণনামূলক, সুনীতি ও সদাচার বিষয়ক, আধ্যাত্মিকাত্মক ও যুক্তিপ্রধান এই চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। হরনাথ ও প্রকাশনাথ বসু 'চন্দ্রকণা'য় যে ভূমিকা যুক্ত করেছিলেন, চন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থখানি শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল (দ্র. ক্যালকাটা গেজেট ৬. ১১. ১৯১৮) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২১ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল (দ্র. ক্যালকাটা গেজেট ২. ১০. ১৯১৮)

উল্লেখপঞ্জী

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র', "বঙ্গদর্শন" (বৈশাখ ১২৮৫)

২। উৎসর্গ পত্র, "শকুন্তলাতত্ত্ব" (১২৮৮)

৩। 'এই পুস্তকে অভিজ্ঞানশকুন্তলের কেবলমাত্র নাটকত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সচরাচর যাহাকে কবিত্ব বলে তাহা বুঝাই নাই।' 'বিজ্ঞাপন', তদেব।

৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, "সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়" পৃ. ছিয়াশি

৫। 'দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ একপ্রকার লুকাচুরি খেলা।

…শকুন্তলার এ সকল 'বাহানা' আছে, মিরন্দার সে সকল নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র, 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা', "বঙ্গদর্শন", বৈশাখ ১২৮২

৬। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'উদ্দীপনা', "বঙ্গদর্শন", জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯

৭। প্রমথ নাথ বিশী, ভূমিকা, "সাহিত্যসম্পুট", ১৯৬০, পৃ. ১৩-১৪

৮। এ সম্পর্কে ড. রবীন্দ্র গুপ্তের চিন্তা বর্তমান লেখককে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। ড. গুপ্তের আলোচনা স্থান পেয়েছে 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার 'বঙ্গদর্শন পত্রিকার শতবার্ষিকী' সংখ্যায়, পৃ ৯৫

৯। অধ্যক্ষ হেস্টির সঙ্গে পত্রযুদ্ধ প্রসঙ্গে লিখিত পত্রাংশ থেকে সংগৃহীত। ২৮ অক্টোবর ১৮৮২ তারিখে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত।

১০। রবীন্দ্র গুপ্ত, ভূমিকা, "বঙ্গদর্শন : নির্বাচিত রচনা" ১৯৭৬, পৃ. ১২

১১। হারাণচন্দ্র রক্ষিত, "বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম" দ্বি-সং ১৩০৬

১২। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, "বাংলা সমালোচনা পরিচয়" ১৩৭৬ পাদটীকা পৃ. ১০৩

১৩। "চতুষ্কোণ", বৈশাখ, ১৩৭৯ পৃ. ৯৭

১৪। চন্দ্রনাথের বক্তব্যের তিক্ত সমালোচনা করেছেন ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, দ্র. "বাংলা সমালোচনা পরিচয়" পৃ. ১০৩

১৫। এইচ. টি. কোলব্রুক ছিলেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্‌। তাঁর বেদবিষয়ক আলোচনা তার সাক্ষ্য। কোলব্রুকের অন্যতম পণ্ডিত ছিলেন প্রসিদ্ধ জয়গোপাল তর্কালংকার (১৭৭৫-১৮৪৬)

১৬। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, "বাংলা সমালোচনা পরিচয়" পৃ. ১০৩-৪

১৭। রবীন্দ্রনাথ, 'বারোয়ারী মঙ্গল', "ভারতবর্ষ"

১৮। দেবীপদ ভট্টাচার্য, "বাংলা চরিত সাহিত্য" ১৯৬৪, পৃ. ২২৯

১৯। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, "বাংলা সাহিত্যের একদিক" তৃ-সং ১৩৬৭, পৃ. ১১৯

২০। "বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন—'আমিও জাতিভেদটাকে অতি জঘন্য জিনিস মনে করিতাম, কিন্তু তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মত পাল্টাইয়া গিয়াছে'।" "বঙ্গভাষার লেখক" ১ম, ১৩১১, পৃ. ৬৯১-৯২

২১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত "বাংলা সাহিত্যের একদিক" পৃ. ১১৮

২২। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "ভূদেব চরিত", ৩য় ভাগ, পৃ. ৩৩৯

২৩। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক" ১ম, পৃ. ৬৯০

২৪। এই ধারণার জন্য লেখক John Lubbock রচিত *Origin of Civilisation* গ্রন্থের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন।

২৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "অপরাজিত" ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ৩৯৮-৯

২৬। "মহাভারত" কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, বনপর্ব ৩১২ অ.

২৭। বক্তৃতাটি মাদ্রাজের এথেনিয়াম প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে।

২৮। বঙ্কিমচন্দ্র, পাদটীকা, 'মনুষ্যত্ব কি ?'

২৯। 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ তারিখে লিখিত। "রবীন্দ্র রচনাবলী" ১০ম, শতবার্ষিকী সং পৃ. ৫৬৭

৩০। "শ্রীযুক্তবাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরীর 'সাবিত্রীচরিত' পড়িতে পড়িতেই আমার 'সাবিত্রীতত্ত্ব' লিখিবার বাসনা হইয়াছিল।" বিজ্ঞাপন, "সাবিত্রীতত্ত্ব"

৩১। এক্ষেত্রে কাশীদাসী মহাভারতের বর্ণনা ভিন্নরূপ। সাবিত্রীর উক্তি— অকারণে করহ গমন মনোরথ।/ রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিবা পথ ॥/ চল প্রভু এই বৃক্ষে আরোহণ করি। / কোন মতে বঞ্চি প্রভু এ ঘোর শর্বরী ॥

৩২। দ্র. ভূমিকা, "চন্দ্রকণা" পৃ. ৯

৩৩। 'যখন গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের স্কুলের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতালপঞ্চবিংশতি আমাদের পাঠ্য ছিল।' "বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি" ১৩০৬, পৃ. ৬

৩৪। বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', "বঙ্গদর্শন" অগ্রহায়ণ ১২৮৭

৩৫। পরিশিষ্ট, "হিন্দুত্ব" পৃ. ৫০ ; ১. ২. ৩. সংখ্যাগুলি আমাদের বসানো

৩৬। মতিলাল রায়, "হিন্দুত্বের পুনরুত্থান" কলিকাতা, ১৩৪০, পৃ. ৪৩

৩৭। 'The combination of Mill and Manu, the latter largely expurgated of its priestly and patriarchal excesses, did not reveal any absurdity to the majority of Bengal Victorians.'

Pradip Sinha, *Nineteenth Century Bengal : Aspect of social history*, Calcutta 1965, p. 109

৩৮। রাজনারায়ণ বসু, "সেকাল আর একাল", ২য় সং ১৩৬০, পৃ. ৩৩

৩৯। 'সমাজ', "রবীন্দ্র রচনাবলী", ১৪শ খণ্ড, শতবার্ষিকী সং পৃ. ১০৯-১৪

৪০। 'আহারের সহিত ধর্মাধর্মের, ক্ষেত্র আর বীজের ন্যায় অতি ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ; সুতরাং ধার্মিক হইতে হইলে বস্তুর গুণবিচারপূর্বক সাত্ত্বিক পদার্থ বিশিষ্ট দ্রব্যেরই পানভোজন করা আবশ্যক।' শশধর তর্কচূড়ামণি, "ধর্মব্যাখ্যা" ৫ম খণ্ড, পৃ, ৩৭২-৩

৪১। "বঙ্গদর্শন"-এ (কার্তিক ১২৭০) পাদটীকায় জানানো হয়েছিল ১৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ সালে সিটি কলেজ গৃহে চন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন।

৪২। বঙ্কিমচন্দ্র, 'আহার Vs বিবাহ' ; "বিবিধ প্রবন্ধ"-এ রামধন পোদ নামে সংকলিত।

৪৩। ড. রবীন্দ্র গুপ্ত "বঙ্গদর্শন : নির্বাচিত রচনা", ভূমিকা, পৃ. ১৫

৪৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'ভারতমহিলা'

৪৫। পূর্ণচন্দ্র বসু, "হিন্দুধর্মের প্রমাণ" কলিকাতা, ১৩১০, পৃ. ২

৪৬। 'মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। বৌদ্ধদের এই সীমা। সজীব-নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্যধর্মের সর্বোচ্চ আসন—আর্যরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসগোচরে আত্ম-নিমজ্জন করিতে চাহেন।'

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "সামাজিক প্রবন্ধ", উপসংহার

৪৭। রবীন্দ্রনাথ, 'কালান্তর', "কালান্তর" ১৩৫৫, পৃ. ৭

৪৮। দ্র. ন বিশেষোহস্তি বর্ণনান্ সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্॥ —পদ্মপুরাণ

৪৯। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, "উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি" ১৯৭১ পৃ. ৪

৫০। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, "প্রবন্ধ লহরী" কলিকাতা, ১৩০৩, পৃ. ১৭২

৫১। ন যদি স্যাৎ নরপতিঃ সম্যক্ নেতা ততঃ প্রজা
অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব। —হিতোপদেশ

৫২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, "ইন্দ্রনাথ রচনাবলী" ১ম খণ্ড, পৃ. ১১

৫৩। বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ হিসাবে সরকারের কাছে প্রেরিত বার্ষিক 'রিটার্নে' (১৮৮৬) চন্দ্রনাথ একই সঙ্গে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ও 'পশুপতি সম্বাদ' আলোচনা করেছেন।

৫৪। "সোমপ্রকাশ" (১০ আষাঢ় ১২৭১) 'বঙ্গদেশে পুত্র বিক্রয়' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল, সঙ্গে রূপচাঁদ পক্ষী বিরচিত পণপ্রথাবিরোধী পদ্য ছাপা হয়েছিল।

৫৫। বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাঙ্গালা ভাষা', "বঙ্গদর্শন" জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫

৫৬। হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম সম্ভার, ১৩৬৩ পৃ. ২০০

৫৭। ভূমিকা, "বিবিধার্থ সংগ্রহ" কার্তিক ১৭৭৩ শকাব্দ, পৃ. ২

৫৮। বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাঙ্গালা ভাষা', "বঙ্গদর্শন" জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫

৫৯। দ্র. 'ভাষার কথা', "রবীন্দ্র রচনাবলী", শতবার্ষিকী সং ১৫শ খণ্ড

৬০। দ্র. পাদটীকা, 'নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য'

৬১। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক" ১ম, ১৩১১, পৃ. ৬৯২

৬২। দেবীপদ ভট্টাচার্য, "রবীন্দ্র চর্চা" পৃ. ১৭১

৬৩। "ভারতী" শ্রাবণ ১৩০৫, পৃ. ৩৮০

৬৪। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, "প্রবন্ধ লহরী" ১৩০৩, পৃ. ৮৫

৬৫। প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত "ভূদেব রচনা সম্ভার" পৃ. ২২১-২২

৬৬। তদেব, ভূমিকা, পৃ. ২৩

৬৭। "ভূদেব চরিত" ৩য় ভাগ, ১৩৩৪. পৃ. ৬

৬৮। "চতুষ্কোণ", "বঙ্গদর্শন" শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৭৯, পৃ. ৭৪

৬৯। 'If we have not been misinformed the present system of Kinder Garten education in Bengal owed much to him (Chandranath Bose).

Amrita Bazar Patrika, 20.6. 1910, p. 7

৭০। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "পারিবারিক প্রবন্ধ" ৫ম সং, পৃ. ১১৭

৭১। 'স্বামীজির স্মৃতি', "বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা" ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫

৭২। 'সাগরী টাঁকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, টঙ্কাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অনুস্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন।'

'তুলনায় সমালোচনা', "বঙ্গদর্শন", বৈশাখ ১২৮০

চন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা

চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এ ১২৮৭ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছিল। তার আগের মাসে (বৈশাখ, ১২৮৭) চন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এ 'নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি চন্দ্রনাথের প্রথম বাংলা রচনার নিদর্শন। সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখার 'ফর্ম' নিয়ে চন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 'বঙ্গদর্শন'-এ আলোচনা করেন। সমগ্র আলোচনাটি তিনটি সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত।

প্রবন্ধের প্রথম ভাগে, নাটক, আখ্যায়িকা ও কথাগ্রন্থের পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে। নাটকে লেখক বর্ণনীয় বিষয়ের অন্তরালে থাকেন। আখ্যায়িকায় লেখক স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বর্ণনা করেন এবং কথাগ্রন্থ এতদুভয়ের সন্ধিস্থল। লেখক এখানে নাট্যকারের মত বিষয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করে চরিত্রগুলির মাধ্যমে কাহিনীকে এগিয়ে দেন। আবার যখনই কাহিনী জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে তখনই নিজে এগিয়ে এসে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেন। বলা বাহুল্য, এই রীতি উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমীরীতির প্রতিই ইঙ্গিত দেয়। যেহেতু কথাগ্রন্থে পাঠককে বোঝাবার দায়িত্ব অনেকাংশে লেখকের উপর বর্তায়; 'সুতরাং নাটক বুঝা অপেক্ষা কথাগ্রন্থ বুঝা অধিকতর সহজ।'

সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার কবিতায় সমৃদ্ধ, এর পাশে গদ্যের স্থান ছিল অতি কুণ্ঠিত। আখ্যায়িকা জাতীয় রচনা কিছু ছিল। যেমন, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত ইত্যাদি। সংস্কৃতে নাটকও সমৃদ্ধ শাখা কিন্তু নাটক ও আখ্যায়িকার যুগ্মবন্ধনে যে কথাগ্রন্থের সৃষ্টি হয় তা সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল না। ইংরেজি সাহিত্যেও প্রাগাধুনিক কালে আখ্যায়িকা বা বীররসাত্মক কাহিনীর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। চন্দ্রনাথের মতে, ডিফোর (১৬৬০-১৭৩১) হাতেই ইংরেজি নভেল বা কাব্যগ্রন্থের উদ্ভব হয়েছে। ডিফোর প্রসিদ্ধ উপন্যাস

'রবিনসন ক্রুশো' (১৭১৯) প্রতীকধর্মী হলেও তার মধ্যে ফুটে উঠেছে 'আঠারো শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী অর্থনৈতিক মুনাফাকামী মানুষের জীবনকাহিনী'।[১] ডিফোর 'মল ফ্লানডার্স' (১৭২২) উপন্যাসে দাগী আসামী, চোর বদমাস, গণিকা শ্রেণীর চরিত্র রূপায়িত হয়েছে যা আধুনিক উপন্যাসের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে। সুতরাং 'পামেলা'র (১৭৪০) স্রষ্টা রিচার্ডসনের (১৬৮৯-১৭৬১) পরিবর্তে ডিফোকে ইংরেজি উপন্যাসের পথিকৃতের সম্মান দিয়ে চন্দ্রনাথ তাঁর উপলব্ধির অভ্রান্ততাই প্রমাণিত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে কথাগ্রন্থের সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) হাতে। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশের পূর্বেই মুলান্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) ও টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) প্রকাশিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও 'দুর্গেশনন্দিনী'কে বাংলা কথাগ্রন্থের দিক্‌চিহ্ন বলে নির্দেশ করলে তা অনৈতিহাসিক হয় না। মুলান্স, ভূদেব বা টেকচাঁদের আধ্যাত্মিকাধর্মী রচনাগুলি রচিত না হলেও একদিন জগৎসিংহের অশ্ব শৈলেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হতই। চন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে, 'এই কথাগ্রন্থ ইংরাজী কথাগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুকরণ'। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হবার পরই তৎকালীন শিক্ষিতদের অনেকেই বঙ্কিমের এই উপন্যাসে স্কটের (১৭৭১-১৮৩২) 'আইভান হো'র প্রভাব লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম নিজ প্রতিভার সামর্থ্যেই স্কটের প্রভাবসীমাকে অতিক্রম করেছিলেন। চন্দ্রনাথের উক্তি, 'বঙ্কিমবাবুর প্রতিভাগুণে এই অনুকরণের মধ্যেও নানাপ্রকার সৌন্দর্য অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।'

কথাগ্রন্থকে লেখক দুই ভাগে ভাগ করেছেন—'রোমান্‌স', যার মধ্যে অতীতের ছায়াছন্ন ইতিহাসের কাল স্থান পায় এবং 'নভেল', যার মধ্যে সূর্যালোকিত বর্তমান বাস্তবজীবন প্রতিফলিত হয়। রোমান্স 'বীররসপ্রধান —ইহাতে যুদ্ধবিগ্রহ রাজা বীরপুরুষ রাজকীর্তি বীরকীর্তি প্রভৃতি বর্ণিত হয়'। লেখক নভেল-শ্রেণীর উপন্যাসের নাম দিয়েছেন 'গার্হস্থ্য কথাগ্রন্থ'। এখানে বাস্তবজীবন ও তার সমস্যা বর্ণনা মুখ্য। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নে ইংরেজি রোমান্‌স-জাতীয় উপন্যাসের অনুকরণ বাংলাসাহিত্যের পক্ষে শুভফলদায়ক হয় নি বলে চন্দ্রনাথ মনে করেন। কারণ, ইংরেজ 'যুদ্ধপ্রিয়' জাতি। বীরত্ব তার সমাজজীবনের সঙ্গে অম্বিত। কিন্তু আমাদের সমাজে বীরত্ব বা যুদ্ধ-

প্রিয়তার কোন স্থান নেই। 'শীর্ণ বঙ্গীয় যুবক' হঠাৎ জগৎসিংহ বা হেমচন্দ্রের অবস্থায় নিজেকে কল্পনা করলে তা উপহাসের বস্তু হবে। রোমান্স পাঠ করার ফলে এদেশীয় যুবকদের মধ্যে বীরত্বের স্ফুরণ হয়, 'কল্পনাশক্তির প্রচুর পরিচালনা হওয়াতে বিবেচনাশক্তির কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়।...সাংসারিক অনেক কার্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়।' এবং তারা একটি অবাস্তব কল্পরাজ্যে বাস করতে শুরু করে এবং তার ফল ব্যক্তিচরিত্রে বা সমাজজীবনে প্রায়শই শুভদায়ক হয় না।

চন্দ্রনাথ রোমান্সের ক্ষতিকর দিকটি লক্ষ করেছেন। অথচ 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে স্কটের প্রভাব থাক্ বা না থাক বঙ্কিমের পক্ষে রোমান্স সৃষ্টি না করে উপায় ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর 'শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ' বঙ্কিম ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে য়োরোপীয় জীবনের মাদকরস আকণ্ঠ পান করেছিলেন। অন্যদিকে তাঁর পরিপার্শ্বের তুচ্ছ খণ্ডিত জীবন, অবরুদ্ধ সমাজ, পরাধীন জাতির নৈষ্কর্ম্য ও বিবর্ণতা তাঁকে পীড়া দিত। অথচ একদিন আমাদের জীবনেও ঘটনামুখরতা ও বর্ণময়তা ছিল। বিচিত্র কর্মকোলাহলে নিয়ত স্পন্দিত হত সে জীবন। সুতরাং সেই জীবনের খোঁজে তিনি যে বাস্তব বর্তমানকে পরিত্যাগ করে অতীতের ইতিহাসমুখী হবেন, তা স্বাভাবিক। চন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বঙ্কিমের রোমান্স সৃষ্টির এই প্রেরণাকেন্দ্রটি ধরা পড়ে নি।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে, লেখক কথাগ্রন্থের আলোচনায় 'লাভালাভ'-এর বিচার করে দেখতে চেয়েছেন। যাঁরা শিল্পতত্ত্বে 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই মতবাদে বিশ্বাসী তাঁদের বক্তব্যে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে চন্দ্রনাথ বলেছেন, কথাগ্রন্থ বিশুদ্ধ আমোদ সৃষ্টির জন্য রচিত হবে না। লোকশিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণই এর লক্ষ্য। অর্থাৎ 'নভেল ফুলের ন্যায় সুন্দর বটে কিন্তু ফলই ইহার পরিণাম।' বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' ('বঙ্গদর্শন', আষাঢ়—আশ্বিন, ১২৭৯) আলোচনা প্রসঙ্গে নিজকালের সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার ধ্রুবপদটি বেঁধে দিয়েছিলেন যে, 'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।' চন্দ্রনাথ সাহিত্যালোচনায় এই সূত্রটি গুরুর কাছ থেকে শিষ্যের পাওয়া বীজ-মন্ত্রের মত গ্রহণ করেছিলেন। তাই কথাগ্রন্থের মধ্যে সামাজিক লাভালাভের

আবিষ্কারে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য যে কেবল সমাজকল্যাণ নিরপেক্ষ সৌন্দর্যসৃষ্টি বা সত্যচিত্রণ একথাও তিনি জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেছেন এবং এই অভিমতের সমর্থনে সারবান্ যুক্তিও প্রয়োগ করেছেন। সত্যচিত্রণের অজুহাতে কথাগ্রন্থে প্রায়শই যুবকযুবতীর সমাজ অননুমোদিত স্বাধীন প্রেমের যে মনোমুগ্ধকর চিত্র দেখা যায় তা সত্যের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নয়। কারণ লেখক এইভাবে মনুষ্য হৃদয়ের একটি দিক উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করে অপরদিকগুলির মনোহারিত্ব কমিয়ে দেন। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রনাথের এই যুক্তিপ্রণালীর প্রশংসা করেছেন।[২]

প্রবন্ধের তৃতীয় ভাগে, চন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের সমাজ-রীতির পার্থক্য দেখিয়ে ইংরেজি উপন্যাসের অনুকরণ যে বাংলা উপন্যাসের পক্ষে মঙ্গলকর নয়, তা প্রতিপন্ন করেছেন। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের জীবনে ধনোপার্জনের আকাঙ্ক্ষা অস্বাভাবিক ভাবে বর্ধিত হয়েছে। অর্থোপার্জনের স্পৃহা ও তজ্জনিত নির্মম প্রতিযোগিতার জন্য তাদের জীবন থেকে ক্রমে কোমল ভাবগুলি অপসৃত হয়েছে এবং জীবনে রুক্ষ পুরুষভাব প্রাধান্য পেয়েছে। তাই ইংলণ্ডের ঔপন্যাসিকগণ সুন্দর মানবিকতাগুণে সমৃদ্ধ জীবন গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের কঠোরহৃদয়তা হ্রাস হয়ে যাতে তা মানবিকগুণে বিকশিত হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ, চার্লস ডিকেন্সের (১৮১২-৭০) উপন্যাস। সমাজরোগের প্রতিষেধক রূপে তিনি একদিকে যেমন অর্থলিপ্সার বিষময় ফল দেখিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি নির্লোভ সহৃদয় মানুষের চিত্র লোভনীয় বর্ণে চিত্রিত করেছেন। ইংরেজি উপন্যাস সেজন্য আমোদের সুলভ উপকরণ নয়, জাতীয় চরিত্র গঠনের সহায়ক।

আমাদের সামাজিক গঠন ইংলণ্ডের সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। ধনাকাঙ্ক্ষা নয়, বৈরাগ্য আমাদের জীবনের প্রধান শিক্ষা হওয়ায় বাঙালীর জাতীয় জীবনে সহৃদয়তা প্রবল। আমাদের বর্তমান অবস্থায় এখন কর্তব্য, 'সহৃদয়তা কিছু কমাইয়া অর্থোপার্জনচেষ্টা কিঞ্চিৎ বর্ধিত করা'। সুতরাং অনুসৃত সাহিত্যের প্রভাবে আমরা যদি ধনাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কোমল-ভাবের সেবা করি তা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। সেইজন্য আমাদের সাহিত্যকেও সমাজ-প্রয়োজন নির্দিষ্ট নিজস্ব পথেই চলতে হবে। এই আলোচনায় চন্দ্রনাথ যে ভাবে যুক্তিধারা প্রয়োগ করেছেন তা 'অনেকাংশে

সত্য ও লেখকের স্বাধীনচিন্তার নিদর্শন' বলে যশস্বী সমালোচক মন্তব্য করেছেন।[৩]

এই কারণেই ইংরেজির আদর্শে সমাজ অনুশাসনলঙ্ঘী হৃদয়নির্ভর স্বাধীন প্রণয়চর্চা আমাদের সাহিত্যে অনুসরণীয় নয়। প্রাক্ বিবাহ প্রেম আমাদের দেশে অজ্ঞাত, বিবাহোত্তর জীবনে অন্যপুরুষের প্রতি চিত্তবিক্ষেপ আমাদের শাস্ত্রমতে গর্হিত পাপ। সতীত্ব য়োরোপীয় মতে কুসংস্কার মাত্র কিন্তু 'সতীত্ব আমাদের কলঙ্কিত মস্তকের উজ্জ্বল মণি'। ইংরেজ স্বাধীনতা প্রিয়। চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমরা অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতার ইচ্ছুক হইলে হইতে পারি, কিন্তু প্রণয়ে স্বাধীনতা চাই না। ড্রাইডেন বলিতে পারেন—One to one was cursedly confined, আমরা বলিব—One to one blessedly confined.' তাই ইংরেজের প্রণয়প্রণালী আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে অনুসরণীয় নয়। বস্তুত চন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা সমাজকল্যাণ-নিরপেক্ষ নয়।

২.

নাটকবিচারে 'বঙ্গদর্শন' শেকস্পীয়রের নাটককে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিল। সমালোচ্য নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে শেকস্পীয়রের নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের তুলনা 'বঙ্গদর্শন'-এর নাটক সমালোচনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছেন শেকস্পীয়র। চন্দ্রনাথ প্রথমাবধি ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজের গৌরব ঘোষণায় আগ্রহী। তিনি বঙ্কিমের অনুসরণে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনায় ব্রতী হয়েও য়োরোপীয় সাহিত্যের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন নি, ভারতীয় সাহিত্যকে মর্যাদার আসন দান করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা' শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের একস্থানে বলেছিলেন, 'শেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য, কিন্তু নাটক নহে।' এই মন্তব্যের সূত্রে বঙ্কিম কালিদাসের শকুন্তলা গ্রন্থটি মিলটনের কমাস, বায়রনের ম্যানফ্রেড ও গোয়েটের ফাউষ্টের সমধর্মী বলে মনে করেছিলেন। চন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'শকুন্তলাতত্ত্ব' আলোচনার সূচনায় অনেকাংশে বঙ্কিমের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায়

এই গ্রন্থের নাটকত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। চন্দ্রনাথের সুগভীর নাট্যচিন্তার পরিচয় বহন করছে 'শকুন্তলাতত্ত্ব'-এর এই সব অংশগুলি। তিনি বলেছেন, তাৎপর্যময় ঘটনার সন্নিবেশে যে কাহিনী গতিমুখর হয়ে ওঠে সেইরূপ কাহিনীই নাটকের প্রধান উপজীব্য। দুর্বাশার শাপ শকুন্তলা উপাখ্যানের একটি প্রধান ঘটনা। এই ঘটনার আকস্মিকতা শকুন্তলার কাহিনীতে গতি সঞ্চার করেছে এবং চরিত্রের রূপান্তর সাধনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং বঙ্কিমের উল্লেখমত শকুন্তলা 'কাব্য' না হয়ে নাটকই হয়েছে।

তবে শেকস্‌পীয়রের নাটকের তুলনায় কালিদাসের নাটক যে ঘটনাবিরল এবং তার ফলে নাটক যে অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে তা চন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। রোমিওর প্রেমে বাহ্য প্রতিবন্ধকতা বেশি। দুষ্মন্তের প্রণয়ে বাহ্য প্রতিবন্ধকতা নেই। শকুন্তলাকে গ্রহণে তাঁকে বাধা দিয়েছে অন্তর্জগতের নির্দেশ ও তাঁর জীবন্ত ধর্মবোধ। 'এই প্রভেদবশতঃ রোমিও জুলিয়েটে বাহ্যজগৎ অপেক্ষাকৃত প্রবল। অভিজ্ঞান শকুন্তলে অন্তর্জগৎ অপেক্ষাকৃত প্রবল—রোমিও জুলিয়েটে ঘটনার বাহুল্য, অভিজ্ঞান শকুন্তলে ঘটনার স্বল্পতা' (৫ম অ. পৃ. ১১৭)। অন্তর্দ্বন্দ্বজাত অন্তরের রক্তক্ষরণ যে নাটকীয় চরিত্রকে মহনীয় করে চন্দ্রনাথের এই বোধ জাগ্রত ছিল এবং নাটকে বহির্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা অন্তর্দ্বন্দ্বের গুরুত্ব যে অধিক চন্দ্রনাথ তা জানতেন এবং দুষ্মন্ত চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনাও করেছেন তিনি।

চন্দ্রনাথের মতানুসারে 'অনেক প্রথম শ্রেণীর নাটকে দুই রকম নাটকত্ব থাকে—প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নাটকত্ব'। প্রত্যক্ষ নাটকত্ব নাটকের কায়াতে আঁকা থাকে, অপ্রত্যক্ষ নাটকত্ব গূঢ়সঞ্চারী; নাটকের গায়ে আঁকা থাকে না, নাটকের ভেতর থেকে টেনে বের করতে হয়। 'হ্যামলেট' নাটকে পিতৃব্যের প্রতি হ্যামলেটের ক্রোধ ও ঘৃণা, প্রতিশোধকামনা ইত্যাদি নাটকের প্রত্যক্ষ নাটকত্ব কিন্তু এর অন্তরালে আর একটি নিগূঢ় নাটকত্ব বর্তমান। 'এই দ্বিভাবের মূলে একটি দ্বিভাবোৎপাদক মানবপ্রকৃতি আছে।' মানুষের মনোগঠন প্রণালীর গুণে কার্যক্ষেত্রে ইচ্ছা ও সংকল্পের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয় তা-ই হ্যামলেটের অপ্রত্যক্ষ নাটকত্ব। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকও উভয়বিধ নাটকত্বে গরীয়ান্।

কণ্বের আশ্রমে অরক্ষিতা যৌবনপূর্ণা শকুন্তলাকে দেখে দুষ্মন্তের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার হল। প্রেম একটি তামসিক রাগ। সেই সঙ্গে দুষ্মন্তের মন ধর্মভয়ে ভীত। ধর্মভয় জ্ঞানমূলক। দুষ্মন্তের প্রেমে বাইরের কোন বিঘ্ন নেই। তাঁর রাগমূলক প্রেমের একমাত্র বিঘ্ন দুষ্মন্তের অন্তর্জগতের জ্ঞানমূলক ধর্মভাব। দুষ্মন্তের চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল অন্বেষণে লেখকের দৃষ্টি আরো গভীরে প্রসারিত হয়েছে। তাঁর চরিত্রে একদিকে রয়েছে আত্মভাব, অন্যদিকে রয়েছে আত্মেতর ভাব বা জাগতিক ভাব। সুতরাং 'দুষ্মন্তের মনের সংঘর্ষ আত্মভাব ও আত্মেতরভাবের সংঘর্ষ, সেই মনের আত্মপরতার ও সমাজপরতার সংঘর্ষ।'

লেখকের মতে, মানুষের সামাজিক প্রকৃতি দু প্রকার—একটি ভাবমূলক এবং একটি জ্ঞান বা যুক্তিমূলক। আত্মভাবের তাড়ণায় দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে আকাঙ্ক্ষা করেন; তখন তিনি ভাবমূলক প্রেমের বশীভূত; সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান বা যুক্তিবাদও সক্রিয়। তাই পরক্ষণেই তিনি সংযত হন। এইভাবে দুষ্মন্তের মনে ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার মধ্যে নাটকের প্রার্থিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে এবং এটাই 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'-এর অপ্রত্যক্ষ নাটকত্ব। চন্দ্রনাথ নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুগভীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নাটকের অন্তরসঞ্চারী নিগূঢ় নাটকত্ব আবিষ্কার করে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ চন্দ্রনাথের গভীর নাট্য-চিন্তার সাক্ষ্য।

৩.

চন্দ্রনাথ কাব্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন মনে হয় না। তাঁর আত্মচরিত মূলক রচনা 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' গ্রন্থের ৪৭ থেকে ৫৮ পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁর কাব্য ভাবনার পরিচয় বর্তমান। কিন্তু সে চিন্তায় প্রাগ্রসরতার পরিচয় নেই, প্রগতিবিমুখতা ও প্রাচীনতার প্রতি সমর্থন স্পষ্ট। চন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে গ্রীষ্মাবকাশে গ্রামের বাড়িতে অপরাহ্নকালে নিরক্ষরা প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদের কাশীরামের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও লৌকিক পুরাণের কলংকভঞ্জন প্রভৃতি শুনিয়ে প্রশংসা লাভ করতেন। পুরাণের এই কাহিনীগুলি শিক্ষিত অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে আদরের সামগ্রী এবং এই সহজবোধ্যতার জন্যই চন্দ্রনাথের কাছে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা

পেয়েছে। চন্দ্রনাথের মতে, 'কোটি কোটি বাঙালী নরনারীর চিরপোষিত আন্তরিক আশা আকাঙ্ক্ষা উহাতে অতি সহজ, অতি সাদা, অতি সরল অলংকারশূন্য আস্ফালনবর্জিত ঘরের কথায় ব্যক্ত। এইরূপ কবিতাই বঙ্গের জাতীয় (National) বা স্বদেশী কবিতা'। বলা বাহুল্য, সরল ভাষা, সুলভ ভক্তিরস ও সহজবোধ্যতা চন্দ্রনাথের কাছে কবিত্বের উৎকর্ষের মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয়েছে।

'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠী কাব্যে সরলতা গুণের পক্ষপাতী। বঙ্কিমচন্দ্র 'নব্য লেখকগণের প্রতি' উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন, 'সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।'[৪] বঙ্কিমানুচর অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কাছে কবিতার 'প্রসাদগুণ'ই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বলে পরিগণিত। 'কবিতার ভাব হইবে উজ্জ্বল পরিস্ফুট, ভাষা হইবে প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ বিশিষ্ট, ছন্দ হইবে মোলায়েম'[৫]—এ-ই ছিল অক্ষয়চন্দ্রের কাব্যাদর্শ। চন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা এঁদের ভাবনার শরিক।

মধুসূদন বাংলাকাব্যের ক্ষীণস্রোতা নদীতে সপ্ত সমুদ্রের কল্লোল যুক্ত করে দিয়েছিলেন। সেই সরণি ধরে আসেন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা। রবীন্দ্রনাথের তখন তরুণ বয়স। তিনি কাব্যে যে আত্মগত গীতি সুর এনেছিলেন তাও বৃহত্তর বাঙালী সমাজের হৃদয়ের সুর থেকে পৃথক। সেইজন্য মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে চন্দ্রনাথ বাঙালীর জাতীয় কবি বলে স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন, 'মাইকেল হেমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কবিতা নানাগুণ সত্বেও, যেন আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত ঘরের কথা নাই। যুগযুগান্ত হইতে সঞ্চিত আশা আকাঙ্ক্ষা দেখি না। তাই বলি তাঁহাদের কবিতা বাঙালীর জাতীয় (National) কবিতাও নয়, স্বদেশী কবিতাও নয়।' উপর্যুক্ত কবিদের কবিতায় 'বৈদেশিকতার বিরাট মূর্তি' দেখে তিনি আতংকিত হয়েছেন এবং লোক সাধারণের বিশেষত বঙ্গ মহিলার অচেনা শব্দ প্রয়োগের ফলে এঁদের কাব্য 'কিম্ভূতকিমাকার' হয়ে উঠেছে বলে তিনি মনে করেন। এখানে উল্লেখ করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রও মধুসূদন হেমচন্দ্রের কবিত্বশক্তির অপ্রশংসাই করেছিলেন।[৬] চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা স্বীকার করেও দ্বিধামুক্ত হতে পারেন নি। চন্দ্রনাথের মন্তব্য, 'কি জানি কেন, আমার এখনও কিছু

মনে হয়, যে, তিনি বাঙ্গালীর ঘরের কথা এবং মনের কথা তত্ত্বের ন্যায় ভালবাসেন না। তিনি বাঙ্গালা কবিতাকে জাতীয় ও স্বদেশী করিয়া তুলিবেন বলিয়া আশা হয় না।' ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে এই মন্তব্য তাঁর কাব্যচিন্তায় গভীরতার অভাব প্রমাণ করে।

কবিত্বের বিচারে ভক্তির আবেগকেই তিনি দ্বিতীয় মানদণ্ড বলে মনে করতেন। বাঙালীর হৃদয় ভক্তির আবেগে সহজেই বিগলিত হয়। রাম-প্রসাদের মত ভক্ত কবি আর জন্মগ্রহণ করছে না এবং বাঙলা ভাষায় ভক্তি রসাত্মক কবিতা লিখিত হচ্ছে না বলে চন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন। খাঁটি বাঙালী কবি ও ভক্তিরসাত্মক বাংলা কবিতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রও অনুশোচনা করেছিলেন[৭] এবং বাঙ্গালিয়ানার জন্য ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর প্রশংসাও পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ।[৮] কিন্তু বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র কাব্যতত্ত্ব নিয়ে গভীর চিন্তাও করেছেন। চন্দ্রনাথ 'ঘরের কথা'য় রচিত সর্বজনবোধ্য, ভক্তিরসাত্মক পাঁচালি জাতীয় কাব্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

চন্দ্রনাথের অন্তরের সমর্থন পেয়েছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১২৩৪-৯৪) 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) এবং দীনবন্ধু মিত্রের (১২৩৬-৮০) 'সুরধুনী কাব্য' (১৮৭১-১৮৭৬)। রঙ্গলালের কাব্যের 'হিন্দুরমণীর সতীত্বরক্ষার্থ আপন প্রাণ-বিসর্জন'-এর আবেগপূর্ণ বর্ণনা নব্যহিন্দুবাদী চন্দ্রনাথের ভালো লাগবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। দীনবন্ধুর 'সুরধুনী কাব্য' প্রৌঢ় চন্দ্রনাথের ভালো লাগে 'পতিতপাবনী গঙ্গামা'-এর স্তবগাথা ও হিন্দুর তীর্থ-মহিমা বর্ণনার জন্য। এতে ভক্তিদৃষ্টি যে পরিমাণে আছে, রসদৃষ্টির অভাব ঠিক সেই পরিমাণেই আছে। একটি দুর্বল ও অপ্রৌঢ় চেতনা নিয়ে চন্দ্রনাথ কাব্য সম্পর্কে মতামত দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি এমন একটা যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যে যুগে বিদেশীয়তার প্রতি ঘৃণা দেখা দিয়েছিল এবং সাহিত্যে সংকীর্ণ ও স্থানীয় আবেগ প্রশংসিত হচ্ছিল। চন্দ্রনাথের কাব্যচিন্তা যুগ-চিন্তারই পরিপূরক।

ছন্দচিন্তায় চন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মনোভাব আরো প্রকট। একদা মধুসূদন (১৮২৪-৭৩) অবরুদ্ধ বাংলা পয়ার ছন্দে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদার বিস্তৃতি

দান করেছিলেন। তিনিই বাংলা ছন্দের মুক্তি বিধাতা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন এদেশে রেনেসাঁসের ভাঙার পর্ব শুরু হল তখন ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী এদেশের প্রাচীন জাতিভেদ প্রথা, হিন্দুর আহার, সর্বোপরি হিন্দুধর্মের মূলে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর (১৮২০--৯১) বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করে সমাজভিতের গোড়াতেই আঘাত করেছিলেন। তখন দেশ ভাঙছে, জাতি ভাঙছে, মন ভাঙছে, এমন কি মনের চেতনাও ভেঙে যাচ্ছে। সেই সর্বব্যাপী ভাঙার দিনে মধুসূদন প্রাচীন পয়ার ভেঙে যুগোপযোগী অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণ করেছিলেন। পয়ারের চরণান্তিক মিল, ছেদ ও যতির সুনির্দিষ্ট মিলন, দুটি চরণের সীমাবদ্ধতায় ভাবকে ধরে রাখার লৌহকঠিন নিগড় মধুসূদনের মনঃপূত হবার কথা নয়, হয়ও নি। এতদিন পয়ার ছন্দের বাঁধাবাঁধি নিয়মগুলি বাংলার অবরুদ্ধ সমাজ জীবনের সঙ্গেই খাপ খেয়ে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বন্ধন-অসহিষ্ণু যুগের কাছে তা পরিত্যক্ত হল। অমিত্রাক্ষর হল যুগমানসের যোগ্য বাহন বা যুগছন্দ—typical metre.

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে সমাজে 'উল্টোরথের যাত্রা' শুরু হয়েছিল। হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা নতুন করে এখন সমর্থিত হল। একদিন বিধবা বিবাহকে শিক্ষিত বাঙালী মোটামুটি অভিনন্দিত করেছিল এখন বঙ্কিম ও তাঁর সাহিত্যানুচরদের কাছে তা নিন্দিত হল। গিরিশচন্দ্র অমৃতলালের নাটকে বিধবাবিবাহের প্রতি নিষেধের অঙ্গুলি উদ্যত। এমন কি সতীদাহের মত একটি নৃশংস প্রাচীন প্রথারও পুনরুজ্জীবন চেয়েছেন কেউ কেউ। সমাজ আবার পুরাতন খাতেই ফিরে যেতে চায়। নানা নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পয়ার ছন্দ আবার তাই মন টানে। এই ছন্দই এখন হবে বন্ধনের মধ্যে প্রত্যাবর্তনে উন্মুখ জাতির আত্মপ্রকাশের যোগ্য বাহন। পয়ার ছন্দকে সমর্থন করে এবং অমিত্রাক্ষরকে প্রত্যাখ্যান করে চন্দ্রনাথ যুগমানসেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বোধ হয় স্কুল কলেজে পড়া স্ত্রীলোক ছাড়া অপর সকল স্ত্রীলোক (এই ছন্দের প্রতি) কিছু বিরক্ত। 'আমার মনে হয় ঐ ছন্দে কবিতা লিখিয়া মাইকেল একটা জঞ্জাল ঘটাইয়া গিয়াছেন।' হেমচন্দ্রের পয়ার ছন্দের তিনি প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু 'বৃত্রসংহার'-এ প্রযুক্ত অমিত্রাক্ষরের তিনি প্রশংসা করতে পারেন

নি এবং এজন্য দায়ী করেছেন 'মাইকেলী" প্রভাবকে। চন্দ্রনাথের মন্তব্য— 'হেমচন্দ্র মিষ্ট পয়ার লিখিতে পারিতেন। মাইকেলের হেঁপায় না পড়িলে বোধ হয় সমস্ত বৃত্রসংহারখানা পয়ারে লিখিয়া বঙ্গে যথার্থই বাঙ্গালীর প্রিয় বাঙ্গালা কাব্য একখানা রাখিয়া যাইতেন।'

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও দীনবন্ধুর 'সুরধুনী কাব্য' যে চন্দ্রনাথের প্রিয় তা কেবল এদের বিষয়বস্তুর জন্য নয়, 'পুরাতন ছন্দে লেখা' বলেও। লেখকের পয়ারপ্রিয়তার জন্যই 'ঋতুবর্ণন'-এর (১৮৭৩) কবি গঙ্গাচরণ সরকার তাঁর প্রিয় কবি এবং সম্ভাবনাময় কবি হলেন সুহৃদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার। গঙ্গাচরণ ও অক্ষয়চন্দ্রের কবিতা ও ছন্দের মূল্য নিরূপণে চন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত সাপেক্ষতা বর্জন করতে পারেন নি। না হলে দেখা যেত 'পিতা-পুত্রে'র পয়ার কোনরকমেই উল্লেখযোগ্য ছিল না।

৪.

'বঙ্গদর্শন' ভাষাচিন্তায় সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল এবং বিষয়ানুরোধে ভাষা নির্বাচনে স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী ছিল। চন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তায় অনুরূপ উদারতা ছিল না। তাঁর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে পণ্ডিতীরীতির প্রতি, যদিও এই ভাষার সীমায়তি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। চন্দ্রনাথের মতে চলিত রীতি বা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে অত্যধিক প্রশ্রয় দিলে ভাষায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাধান্য পায় এবং মৌখিক ভঙ্গির প্রভাবে ক্রিয়ার রূপ এত পরিবর্তিত হয়ে যায় যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের ভাষায় লিখিত পুস্তকের অর্থ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি হয়। তিনি পদবিন্যাসে ও শব্দগঠনে ইংরেজি বা অন্য বিদেশিপ্রভাব পরিহার করার পক্ষে। কারণ, প্রত্যেক ভাষার একটা নিজস্ব 'ধাত্' আছে। বাইরে থেকে তা পরিবর্তন করলে ভাষার মৌল বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে জাতীয়তার ক্ষতি হয়। এই কারণে তিনি সর্ব-বঙ্গীয় সাধুভাষার পক্ষে রায় দিয়েছেন, যার ভিত্তি হবে বাংলার রাজধানী তথা বাণিজ্য সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র কলকাতার ভাষা (দ্র. 'বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি')।

বাংলা সরকারের অনুবাদকের পদে বৃত থাকার কালে চন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সাবধানতার সঙ্গে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

পত্রপত্রিকার ভাষা 'slang বাঙ্গালায় বা খ্যাঁচড়া বাঙ্গালায়' লিখিত হলে অনুবাদকের দায়িত্ব বাড়ে। Slang বাংলায় নানা স্থানীয় আবেগ ও অনুষঙ্গ মিশে থাকে বলে তার অনুবাদ দুরূহ। চন্দ্রনাথ বেদনা অনুভব করেছেন এই ভেবে যে, 'বাঙ্গালার সংবাদপত্রে আজকাল নীচতাদুষ্ট বা slang বাঙ্গালার প্রাদুর্ভাব বেশি। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, এখনকার বাঙ্গালী সকল দিকেই মর্যাদাহীন এবং অভদ্র হইয়া পড়িতেছে। (সেই জন্য) সংবাদপত্রে অভদ্র বা নীচতাদুষ্ট বাঙ্গালার পরিবর্তে সাধুভাষার ব্যবহার বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। নহিলে আমরা অভদ্র (ungentlemanly) হইয়া উঠিব।' (দ্র. 'পৃথিবীর সুখদুঃখ')। সমাজের কল্যাণ এখানেও লেখকের লক্ষ্য।

চন্দ্রনাথ অবশ্য চলিত ভাষা বা মৌখিক ভাষার বিপক্ষে নন। তাঁর ভালোভাবেই জানা আছে যে, 'ভাষা চলিত বা colloquial না হইলে সাহিত্য মূর্খের আয়ত্ত বা বোধগম্য হয় না।' কিন্তু এর বিপজ্জনক পরিণাম সম্পর্কেও তিনি সচেতন। সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহৃত হতে শুরু হলে তার পিছনে পিছনে 'slang বা নীচতাদুষ্ট ভাষা' সহজেই সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পায় এবং তার জন্য সাহিত্য ও সংবাদপত্র ক্রমে 'সুশিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকের অতিশয় বিরক্তিকর এমন কি ঘৃণাজনক' হয়ে ওঠে। এবং ক্রমে তা সমাজজীবনে সঞ্চারিত হয়ে সমগ্র জাতিকেই অবনমিত করে। জাতিকে সুরক্ষিত ও সুভদ্র করার প্রয়োজনে চন্দ্রনাথ ভাষাচিন্তায়ও রক্ষণশীল ও পরিবর্তন বিমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

৫.

চন্দ্রনাথ চরিতসাহিত্যের আদর্শ নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। তাঁর 'ত্রিধারা' গ্রন্থভুক্ত 'জীবনের কথা' প্রবন্ধে এবং 'সাবিত্রীতত্ত্ব'-এর 'পরিশিষ্ট' নামিত অধ্যায়ে লেখকের চরিতসাহিত্য সম্পর্কিত চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। য়োরোপীয় জীবনীসাহিত্যে জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও বাদ যায় না। সংগৃহীত তথ্যগুলির মধ্য থেকেই একজন মানুষের সাধারণ বা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। চন্দ্রনাথ এই জাতীয় নির্বিচার তথ্য সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তিকে নয়, ব্যক্তিস্বরূপকে চিত্রিত করাই জীবনীকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বস্তুত স্মৃতিরক্ষার্থে জীবনচরিত

রচনার প্রয়োজনই নেই। কোন চরিত্রে মহত্ত্ব থাকলে মহাকালই তা রক্ষা করেন। সেদিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় সাহিত্যেই প্রকৃত জীবন-চরিত রচিত হয়েছে বলা যায়। ভারতীয় পুরাণগুলিতে গুরুভক্তি, মাতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, দানধর্ম, আশ্রিত পালন প্রভৃতি যে সকল নীতিমূলক কাহিনী আছে সেগুলি অলীক নয়। এগুলির একটি করে বাস্তবভিত্তি অবশ্যই ছিল। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ আজ বিস্মৃত, ব্যক্তিবিশেষের কীর্তিই পুরাণে ধর্মকাহিনী রূপে রক্ষিত হয়েছে। এইভাবেই 'ব্যক্তি বিশেষের জীবনের কথা জাতীয় জীবনের কথা'য় রূপান্তর লাভ করেছে। চন্দ্রনাথ মনে করেন, ভারতীয় পুরাণ কাহিনীগুলি নিছক কল্পনায় সৃষ্টি নয়, এগুলি কল্পনারঞ্জিত ইতিহাস বা জীবনচরিত। তাঁর মতে, পুরাণের সাবিত্রী চরিত ভারতীয় আদর্শানুযায়ী জীবনচরিতই হয়েছে এবং 'মহাভারতের মহাকবি'ই আদর্শ জীবনী রচয়িতা।

মহাকবি সাবিত্রীচরিতের তথ্যগুলি অনুপুঙ্খ যাথার্থ্যে সংকলন করেন নি। সাবিত্রীর জন্ম, বিবাহ ও মৃতপতির পুনর্জীবিতকরণ মাত্র এই তিনটি ঘটনা অবলম্বন করে সেই চরিত্রের মূল শক্তি ও পূর্ণ প্রকৃতিকে প্রকটিত করেছেন। চন্দ্রনাথ বলেছেন, যার জীবন জীবনীসাহিত্যের অবলম্বন হবে 'তাহার সম্বন্ধে যাহা সার কথা তাহা সাবিত্রীর কথার ন্যায় অতি অল্প কথাতেই বলা যাইতে পারে—উচিতও বলা।' য়োরোপীয় পদ্ধতিতে জীবনচরিত রচনার পথ আমাদের পক্ষে বর্জনীয়। তাছাড়া নির্বিশেষে যে কোন লোকের জীবন নিয়ে জীবনচরিত লিখিত হবে না। যাঁদের জীবন থেকে সামাজিক মানুষ শিক্ষণীয় কিছু পাবে তাঁর জীবনই চরিতকারের অবলম্বন হওয়া উচিত। অর্থাৎ একমাত্র লোকশিক্ষার্থ জীবনী লেখা উচিত বলে চন্দ্রনাথ মনে করেন।

জীবনীসাহিত্যে যে নির্বিচারে তথ্য সংকলনের প্রয়োজন নেই বা তথ্যভারে অনেক সময় ব্যক্তির স্বরূপ আচ্ছন্ন হয়, এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি চন্দ্রনাথের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'আমাদের প্রাণপুরুষ তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে কমিয়েই এগিয়ে চলেছে। অতি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কি করে?'[৯]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতসাম্য হওয়া সত্ত্বেও চন্দ্রনাথের বক্তব্য বিতর্কাতীত

নয়। আজকের জীবনীপাঠক জানেন, অতি তুচ্ছ সাধারণ ঘটনা থেকেই একটি চরিত্রের সাধারণত্ব বা অসাধারণত্ব বোঝা যায়। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠ করে চন্দ্রনাথও তথ্যের অপ্রতুলতা ও ব্যাখ্যার অভাবের জন্য অন্যত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।[১০] চন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা ভ্রান্তিবিলাসের আশ্রয় নিয়েছেন সাবিত্রীকথাকে জীবন-চরিতের আদর্শ হওয়া উচিত, এই কথা বলে। কারণ, সাবিত্রীচরিত অতিকথা (myth)-পুরাণ বা পর্যায়ের। এই জাতীয় অতিকথার উদ্ভাবনার মূলে বাস্তব ঘটনার ক্ষীণ সূত্র থাকলেও যুগযুগান্তরের লোককল্পনা ও ভক্তি-বাদের প্রসারে আজ তা আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। অন্য পক্ষে বায়োগ্রাফিতে বিশিষ্ট-লক্ষণ ব্যক্তিমানুষের ইতিবৃত্ত রচিত হয়। সাবিত্রীচরিত প্রকৃতপক্ষে Biography নয়, এতে Hagiography বা Legands of Saints-এর লক্ষণই বেশি। এই জাতীয় রচনায় অলৌকিকতা, চরিত্র মহিমা ও ভক্তি-বাদের প্রাবল্য বেশি করে চোখে পড়ে।[১১] বলা নিষ্প্রয়োজন এক্ষেত্রে চন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভক্তিবাদীর, ঐতিহাসিকের নয়।

৬.

শুধুমাত্র সাহিত্যের রূপ ও রীতি নিয়ে নয়, সাহিত্যের অন্বিষ্ট সৌন্দর্য নিয়েও চন্দ্রনাথ চিন্তা করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর পরিণত চিন্তার ছাপ আছে সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত প্রবন্ধে। সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪-৮৯) লোকান্তরের পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনাবলীর একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। সেই 'সংগ্রহ'-এর নাম 'সঞ্জীবনী সুধা' (১৮৯৩)। বঙ্কিম নিজে সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী অংশ লেখেন কিন্তু 'ভ্রাতৃস্নেহসুলভ পক্ষপাতের পরিবাদ ভয়ে তাহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার গ্রহণ' করেন না। সেই দায়িত্ব পান চন্দ্রনাথ। সংগ্রহের সিংহদ্বারে বঙ্কিমরচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীর সঙ্গে চন্দ্রনাথের 'সমালোচনা' নামিত প্রবন্ধটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে। এই আলোচনায় চন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সৌন্দর্যচিন্তা ধরা পড়েছে। 'সঞ্জীবনী সুধা' প্রকাশের দু বৎসর পরে 'সাধনা'য় (পৌষ, ১৩০১) রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন।[১২] চন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচিন্তার প্রতিবাদ ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। উভয়ের মধ্যেকার সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে বাদানুবাদের রেশ এইভাবে সাহিত্য-ব্যাখ্যা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সে বিচার আমরা পরে করছি। আপাতত চন্দ্রনাথের

সৌন্দর্যচিন্তার বৈশিষ্ট্যটি জেনে নেওয়া যাক্।

'পালামৌ' ('বঙ্গদর্শন,' ১২৮১-৮৬) গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র নিজস্ব রূপতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বাল্যকালে আমার মনে হইত যে ভূত-প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন—অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্যদেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যেরূপ, লতায় সেইরূপ, নদীতে সেইরূপ, পক্ষীতেও সেইরূপ, ছাগেও সেইরূপ। সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্র ভেদ।'

সঞ্জীবচন্দ্রের এই মতটি অবলম্বন করে চন্দ্রনাথ অগ্রসর হয়েছেন এবং বলেছেন, 'সৌন্দর্যতত্ত্বের ইহা অতি উচ্চ কথা'। চন্দ্রনাথের বক্তব্যের মর্মার্থ হল, সঞ্জীবচন্দ্রের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল। 'ছোট ছোট সামান্য সামান্য নিত্য ঘটনা'ও তিনি 'অসাধারণ আসক্তি ও অভিনিবেশ' সহকারে দেখতে পারতেন এবং সেই দৃষ্টিপ্রদীপের আলোকে যেখানে অপরে সৌন্দর্য দেখতে পায় না, সেখানেও সৌন্দর্য আবিষ্কারে এবং আস্বাদনে তিনি সক্ষম। চন্দ্রনাথের উল্লিখিত সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল কথা হল, সৌন্দর্য একটি স্বতন্ত্র সত্তা, তা জগতের কোন কোন বস্তুতে অধিষ্ঠিত থাকে এবং তা দর্শক নিরপেক্ষ ভাবেই থাকে। সৌন্দর্য একটি তদ্‌গত ব্যাপার। যিনি সৌন্দর্যরসিক তিনি বিষয়ের মধ্যে সেই সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত সৌন্দর্য এক ও অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তার বিভিন্ন রূপভেদ মাত্র। প্রসঙ্গত সঞ্জীবচন্দ্রের উক্তি উল্লেখযোগ্য, 'রূপ এক তবে পাত্র ভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না, কেবল ভুলি রূপে। সে রূপ লতায় থাক্ আর যুবতীতে থাক আমার চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না।'

চন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন যে, 'সঞ্জীববাবুর সৌন্দর্যতত্ত্ব না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না—ভাল করিয়া সম্ভোগ করা যায় না।' অর্থাৎ আগে তত্ত্বজ্ঞান পরে আস্বাদনের কথা তিনি বলেছেন। চন্দ্রনাথের এই আপাত নিরীহ মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ স্পৃহা উচ্চকিত হয়ে ওঠে এবং তিনি বলেন, 'নদনদীতেও সৌন্দর্য আছে, পুষ্প নক্ষত্রেও সৌন্দর্য আছে, মনুষ্যে পশুপক্ষীতেও সৌন্দর্য আছে—এ কথা প্লেটো না পড়িয়াও আমরা জানিতাম। সেই সৌন্দর্য ভূতের মত বাহির হইতে আসিয়া বস্তুবিশেষে আবির্ভূত হয় অথবা তাহা

বস্তুর এবং আমাদের প্রকৃতির বিশেষ ধর্মবশত আমাদের মনের মধ্যে উদিত হয়, সে সমস্ত তত্ত্বের সহিত সৌন্দর্য সম্ভোগের কিছুমাত্র যোগ নাই।' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, তত্ত্বের সঙ্গে সৌন্দর্যোপভোগের কোনও সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্ববিরোধী যুক্তির ভ্রান্তি দেখিয়ে সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে চন্দ্রনাথের মতবাদ অসংগত মনে হয় না। যে লেখকের সৌন্দর্যদৃষ্টিতে তাত্ত্বিক উপাদানের সংমিশ্রণ আছে তাঁহাকে বুঝিতে গেলে তাঁহার তত্ত্বের সহিত পরিচয়ের কিছুটা প্রয়োজন আছে বৈ কি?'[১৩]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে সৌন্দর্য কোন বস্তু-আশ্রিত বিষয়ী-নিরপেক্ষ তদ্‌গত-সত্তা নয়, সৌন্দর্য আবিষ্কারের বস্তুও নয়। লেখকের অনুরাগ ও কল্পনাশক্তিই বিষয়ে বা বস্তুতে সৌন্দর্য গৌরব অর্পণ করে থাকে। অন্যদিকে চন্দ্রনাথের মতে সৌন্দর্য আবিষ্কারের বস্তু। সৌন্দর্য ছিল এবং আছে। কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তাকে আবিষ্কার করেন। সকলের সেই অন্তর্দৃষ্টি থাকে না বলে সৌন্দর্যের অস্তিত্ব নেই এমন নয়। কবিরা দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন। তাঁদের পক্ষে বস্তুতে সৌন্দর্য আবিষ্কার সম্ভব হয়।

আর রবীন্দ্রনাথের মতে সৌন্দর্যের প্রকৃত অস্তিত্ব কবির মনে। মনের বিলাস বশত তিনি অন্যত্র সৌন্দর্য দেখেন অথবা তিনি কল্পনা ও উদ্ভাবন শক্তি দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। 'আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ'—এ রবীন্দ্রনাথের লেখনীরই উপযুক্ত। সংক্ষেপে, উভয়ের সৌন্দর্যদৃষ্টির পার্থক্য নির্দেশ করা যায় এই বলে যে, সৌন্দর্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিবাদী (creation) এবং চন্দ্রনাথ আবিষ্কারবাদী (discovery)।

চন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচিন্তা আরও দূর প্রসারিত। 'ত্রিধারা' গ্রন্থভুক্ত 'সুখের হাট ও সৌন্দর্যের মেলা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি য়োরোপীয় এস্থেটিক বা নন্দনবিদ্যাকে মৃদু তিরস্কার করেছিলেন। কারণ য়োরোপীয় নান্দনিক দৃষ্টি অনুযায়ী পৃথিবীতে কতগুলি বস্তুতে সৌন্দর্য আছে এবং কতগুলি বস্তু স্বভাবতই অসুন্দর। চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যে সকল জিনিস চর্মচক্ষে দেখ, তাহা সমান সুন্দর এবং সমান প্রীতিকর না হইতে পারে···কিন্তু সকল পদার্থের মধ্যে যে ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মপদার্থ মানসচক্ষে দেখ, তাহার আর কমবেশী ভালমন্দ ইতরবিশেষ নাই, তাহার পরিণামও অসীম, সৌন্দর্যও অসীম।'

সৌন্দর্য সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টি অনেক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। ভারতীয়রা মনশ্চক্ষে পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্ববস্তুতে ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ অনুভব করেন। ফলে 'জগতে যত পদার্থ আছে সবই সমান সুন্দর'। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় দৃষ্টিতে নন্দনবিদ্যা পরমার্থ বিদ্যার সম্পূর্ণ অধীন। চন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্মতত্ত্বে উত্তীর্ণ।

উল্লেখপঞ্জী:

১। দেবীপদ ভট্টাচার্য "উপন্যাসের কথা," কলিকাতা, ১৯৬১ পৃ. ১৬
২। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় 'ভূমিকা,' "সমালোচনা সাহিত্য" ১৩৭৩ পৃ. ১
৩। তদেব, পৃ. ১৭
৪। বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাঙ্গালার নব্যলেখকগণের প্রতি নিবেদন', "প্রচার" (মাঘ, ১২৯১)
৫। কালিদাস নাগ সম্পাদিত "অক্ষয় রচনাসম্ভার" শেষার্ধ, ১৮৮৮ শকাব্দ 'প্রসাদগুণ' পৃ. ৫৭৮
৬। 'মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে।' বঙ্কিমচন্দ্র, 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' "বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ" প্রবন্ধ খণ্ড, প্রথমাংশ, সাক্ষরতা সং, ১৯৭৩ পৃ. ২৩৭
৭। বঙ্কিমচন্দ্র, 'ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব,' তদেব, শেষাংশ, পৃ. ১১৩৭
৮। 'যা কেবল স্থানিক, সাময়িক বর্তমান কাল তাকে যত প্রচুর মূল্যই দিক, দেশের প্রতিভার কাছ থেকে অতিশয়ের সমাদর সে স্বভাবতই পায় নি, যেমন পেয়েছে জ্যোৎস্নারাতে ভেসে যাওয়া নৌকার সেই সারি গান— মাঝি, তোর বৈঠা নে রে—

আমি আর বাইতে পারলাম না।

দ্র. রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যতত্ত্ব' "সাহিত্যের পথে"
৯। দ্র. 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে লিখিত। "রবীন্দ্র রচনাবলী" শতবার্ষিকী সং, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৪
১০। চন্দ্রনাথ বসু, "পৃথিবীর সুখদুঃখ" ১৯০৮ পৃ. ৬৬
১১। Hagio শব্দের অর্থ Saint, কাজেই Hagio-graphy বলতে আমরা

বুঝি 'সন্তচরিত'। এ গুলির মূল বৈশিষ্ট্য হল "writings inspired by devotion and intended to promote it.

দ্র. দেবীপদ ভট্টাচার্য, "বাংলা চরিতসাহিত্য" কলিকাতা, ১৯৬৪ পাদটিকা ৪, পৃ. ৩৮

১২। "আধুনিক সাহিত্য"-এ 'সঞ্জীবচন্দ্র' নামে সংকলিত।

১৩। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রগল্পের দ্বিতীয় পর্ব' "রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা" ১ম, ১৩৭২ পৃ. ২৪৬-৪৮

চন্দ্রনাথের সমকালীন-সাহিত্য সমালোচনা

১.

চন্দ্রনাথ সাময়িক পত্রের সমালোচক বা 'রিভিউয়ার' হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[১] তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায়। ওই বৎসরেই মধুসূদনের (১৮২৪-৭৩) 'মেঘনাদ বধ' প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মধুসূদনের কাব্য তৎকালে পাঠক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একদিকে কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩০-৭০) 'মেঘনাদ বধ'-এর কবিকে রাজোচিত সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন, অন্যদিকে হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৩) এই কাব্যের ভূমিকায় প্রশংসাবাদে অকুণ্ঠ হতে পারেন নি। 'বঙ্গদর্শন' 'মেঘনাদ বধ' সম্পর্কে মোটামুটি নীরব ছিল। শ্রীশ মজুমদারের একটি প্রবন্ধ ছাড়া 'মেঘনাদ বধ' সম্পর্কে উল্লেখ-যোগ্য কোন প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয় নি। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে বিদেশী প্রভাবটিই সেকালের সমালোচকদের দৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়েছিল। কাব্যটির অন্তরসঞ্চারিত বাঙালী মনোভাব তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। মধুসূদনের কাব্য চন্দ্রনাথের কাছে মনে হয়েছে 'বৈদেশিকতায় পরিপূর্ণ'। 'মেঘনাদ বধ'-এ শিল্পরসের ব্যতিক্রম ঘটানোর কল্পিত অপরাধের জন্য মধুসূদনের প্রতি সেকালের অনেকের মত চন্দ্রনাথও প্রসন্ন হতে পারেন নি।

তিনি মধুসূদনের সঙ্গে তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন হেমচন্দ্রকে। 'বৃত্রসংহার'-এ (১৪ জানুয়ারী, ১৮৭৫) হিন্দু দেবদেবীর প্রচলিত 'ইমেজ' রক্ষার জন্য সম্ভবত হেমচন্দ্র প্রশংসিত হন। হেমচন্দ্র শিক্ষিত ভারতবাসীর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের বিরুদ্ধে একদা লিখেছিলেন 'Brahmo Theism in India'। চন্দ্রনাথের হিন্দু জাতীয়তাবাদী মন তাতে প্রসন্ন। তবে হেমচন্দ্রের পয়ার ছন্দের প্রশংসা করেও 'মাইকেলী প্রভাব' জাত অমিত্রাক্ষর ছন্দকে তিনি নিন্দিত করেছেন।

চন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) কবিতার গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন। কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় তিনি তাঁর হিন্দু মনোভাবের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক নবীনচন্দ্রের 'আর্যদর্শন' কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন এবং আবৃত্তি করে কবিকে শুনিয়েছিলেন।[২] অথচ ছাত্রপাঠ্য হিসাবে কবির 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) কাব্যের অনুমোদনে তিনি বাধা দিয়েছিলেন প্রধানত জাতিবৈরী মনোভাব থেকে। হিন্দু নারীর সতীত্বের মহিমা কীর্তনের জন্য রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) এবং 'গঙ্গার মহিমা কীর্তন ও ধন ধান্য বিত্তালয় অতিথিশালা পণ্ডিতসমাজ দেবালয় রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ শিবমন্দির প্রভৃতি বিশাল হিন্দু সভ্যতার অগণ্য নিদর্শন' বর্ণনার জন্য দীনবন্ধুর 'সুরধুনী কাব্য' (১৮৭১, ১৮৭৬) প্রশংসিত হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) 'মেজ বৌ' (১৮৮০) উপন্যাসটি দেশীয় স্ত্রীলোকদের সুনীতি শিক্ষার সহায়ক বলেই প্রশংসাযোগ্য বলে চন্দ্রনাথের মনে হয়েছে।

চন্দ্রনাথ-সুহৃদ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) পিতা গঙ্গাচরণ সরকার হিন্দুধর্মের উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। তিনি ঢাকার হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভায় ১২৮৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা' দিয়েছিলেন।[৩] চন্দ্রনাথ গঙ্গাচরণের লিখিত পয়ার ছন্দের প্রশংসা করেছেন।[৪] অক্ষয়চন্দ্র তাঁর সুপ্রসিদ্ধ আত্মজীবনী 'পিতাপুত্র' প্রকাশিত হবার পর চন্দ্রনাথের কাছে উক্ত গ্রন্থের একটি নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছিলেন। চন্দ্রনাথ পত্রোত্তরে (২৩ শে কার্তিক, ১৩১১) তাঁকে জানান—

'পুত্র পিতাকে ভক্তি করেন, পিতাও পুত্রকে ভক্তি করেন। পিতাপুত্রের এমন মিশ্রণ আমি আর দেখি নাই। এরূপ অপূর্ব মিশ্রণ দেখি—ঠিক কথা বলিব—হাসিও না—দেবতাদের মধ্যে, হরগৌরীতে, কৃষ্ণকালীতে, কৃষ্ণরাধায়। পিতাপুত্রের এরূপ মিশ্রণ মনুষ্য মধ্যে একটা ঘটনা। এরূপ ঘটনা তোমার লিখিত কাহিনী [ব্যতীত] মানবসাহিত্যে বোধ হয় আর নাই।'

এ বিচার নিরপেক্ষ সমালোচকের নয়, ব্যক্তিগত ভালো লাগার আবেগে কম্পিত হয়েছে লেখকের কণ্ঠ।

বলা প্রয়োজন, উপর্যুক্ত আলোচনার কোনটিই পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা নয়। স্বরচিত গ্রন্থাবলীতে ও চিঠিপত্রে চন্দ্রনাথ সমকালীন-সাহিত্য সম্পর্কে যে সব

বিচ্ছিন্ন অথচ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন তার সংকলন মাত্র। এগুলির তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি করেছেন তা পূর্ণতর সমালোচনার মর্যাদায় ভূষিত হবার যোগ্য।

২.

'ত্রিধারা'র (১২৯১) অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বঙ্কিমসৃষ্ট দুটি নারী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'অনন্ত মুহূর্ত'-এ ভ্রমর প্রসঙ্গ আছে এবং 'দুই হিন্দু পত্নী'তে তুলনামূলক দৃষ্টিতে ভ্রমর ও সূর্যমুখী চরিত্র আলোচিত। আদর্শ হিন্দুরমণী হিসাবে চরিত্র দুটিকে ব্যাখ্যা করার দিকে লেখকের ঝোঁক বেশি। ফলে আলোচনায় মানবিক বিশ্লেষণ নেই, চন্দ্রনাথের ধর্মীয় ভাবনা ঔপন্যাসিক চরিত্রের আলোচনায় একটি অস্পষ্ট কুয়াশা জাল বিস্তীর্ণ করে দিয়েছে। লেখক শেষপর্যন্ত একটি সিদ্ধান্ত আরোপ করে দেখিয়েছেন, 'সূর্যমুখী ও ভ্রমর উভয়ে একই ছাঁচের হিন্দুপত্নী'।

চন্দ্রনাথ বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ও 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও অনবদ্য আলোচনা করেছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমের সমকালীন উপন্যাস সাহিত্যের বিচার নিয়ে চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কিছু 'পত্রাপত্রি' হয়েছিল। চন্দ্রনাথের কাছে লেখা কোনও পত্রে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের উক্ত উপন্যাস-দুটি সম্পর্কে কিছু বিরোধী মন্তব্য করেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য কিন্তু কালের প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে চন্দ্রনাথের দুখানি পত্র রক্ষা পেয়েছে। তার মধ্যে ১লা কার্তিক, ১২৯১ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চন্দ্রনাথের পত্রে 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে লেখকের বক্তব্যের পরিচয় পাই। পত্রখানি 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৪২৩-২৬) প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় (৮৩ সংখ্যক) পত্রখানি সংকলিত হওয়ায় সাধারণ্যে সুপরিচিত কিন্তু অপর পত্রখানি (পত্র তারিখ, ৯ই অক্টোবর, ১৮৮৪) প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র'-এ (আশ্বিন, ১৩২৫ পৃ. ৩৩২-৩৬) মুদ্রিত হলেও মোটামুটি লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেছে। 'দেবী চৌধুরাণী' সম্পর্কে এমন প্রগাঢ় বিশ্লেষণ ও সাহিত্যিক অনুধাবন অন্যত্র দুর্লভ।

সমকালীন দুখানি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস সম্পর্কে চন্দ্রনাথের ভাবনার পরিচয়

পত্র দুখানিতে মুদ্রিত এবং সানন্দে স্বীকার করতে হয় যে, সাহিত্যিক বিশ্লেষণে চন্দ্রনাথ আমাদের মনে কোন ক্ষোভ রাখতে দেন নি। অন্তত এ ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের মোহমুক্ত হয়ে তাঁর সমালোচক সত্তার পূর্ণ জাগরণ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিত পত্রখানি পাওয়া না যাওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে তাঁর অভিযোগগুলি জানা যাচ্ছে না, কিন্তু চন্দ্রনাথের পত্রোত্তরের ভঙ্গি থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের উত্থাপিত অভিযোগগুলি অনুমান করে নিতে পারি।[৫]

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এর বিরুদ্ধে আমাদের অনুমিত রবীন্দ্রনাথের প্রধান অভিযোগ চারটি। ১. আনন্দমঠের পুরুষ চরিত্রগুলি 'সবই এক ছাঁচে ঢালা', 'নাম ও নম্বর ভিন্ন তাহাদিগকে চিনিবার কোন উপায় নাই'। ২. 'আনন্দ-মঠের পাত্রগণ নিজে কিছু করিতেছে না, কোন জাদুকর তাহাদিগকে করাইতেছে।' ৩. 'আনন্দমঠের ব্যাপারটা যেন কিছু সুদূরস্থাপিত ব্যাপার' অথবা এর human interest-এর অভাব। ৪. 'বঙ্কিমবাবু শান্তিকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন'।

শুধু শেষের অভিযোগটি সম্পর্কে চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মতসাম্য দেখা যায়। বাকি তিনটি অভিযোগ খণ্ডন করে চন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-কর্মকে সমর্থন করেছেন। এখানে এইটুকু দেখার যে, এই সমর্থন বঙ্কিমের প্রতি অন্ধভক্তি বশত নয়, সাহিত্যের ও মানবেতিহাসের সুগভীর বিশ্লেষণ থেকেই তিনি সিদ্ধান্তগুলি পেয়েছিলেন।

প্রথম অভিযোগের উত্তরে চন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আনন্দমঠ' উপন্যাস, সংসারধর্মের কাব্য নয়। প্রাত্যহিক জীবনে ('every-day life') মানুষ সচরাচর যে ক্ষুদ্র বৃহৎ হাজার রকমের কার্য করে তা থেকে আনন্দমঠের জীবন ভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত। আনন্দমঠের পাত্রগণের একটি মাত্র কার্যই আছে তা হল 'প্রবল স্বদেশানুরাগে প্রধাবিত হইয়া স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা .... সেই একমাত্র কার্য তাহাদের সমস্ত জীবনের পরিধি পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে।' প্রকৃতপক্ষে স্বদেশ-উদ্ধাররূপ ব্রত ও তাদের জীবন একার্থক হয়ে পড়েছে। তার ফলে এই একতম উদ্দেশ্যের প্রবল চাপে জমাট বেঁধে মানুষগুলি একটি 'ব্যক্তিস্বরূপ'-এ পরিণতি লাভ করেছে। একব্রতীদের ব্যক্তিগত প্রভেদ লোপ পাবার সম্ভাবনাই বেশি। 'আনন্দমঠ'-এর স্বদেশব্রতীরা 'একটি রেজিমেণ্টের সৈনিকগণের ন্যায় একটি ব্যক্তিস্বরূপ' হয়ে পড়ায় নাম ও নম্বর ভিন্ন তাদের

চিনবার উপায় নেই। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যাকে ত্রুটি বলে নির্দেশ করেছেন, চন্দ্রনাথের মতে, সেটাই বঙ্কিমের সাফল্যের সাক্ষ্য।

দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এক উদ্দেশ্য বিশিষ্ট' মানুষেরা নিজ কার্য করে না, অন্য কারও দ্বারা পরিচালিত হয়। যে পরিচালনা করে সে হয় একটি idea নয় একটি ব্যক্তি। ব্যক্তি হলে তিনি অবশ্যই অতিমানব-গুণবিশিষ্ট হবেন। পাশ্চাত্য ইতিহাসের লাইকরগস, ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ন, বিসমার্ক ও ভারতীয় ইতিহাসের বুদ্ধ, মনু, চৈতন্যদেব এই শ্রেণীর লোক-পরিচালক। 'আনন্দমঠ'-এর সত্যানন্দ এদের সগোত্র। এই জাতীয় লোকনায়কদের অলৌকিক ক্ষমতায় মানুষ অভিভূত হয় এবং বিনা প্রশ্নে তাঁদের নির্দেশ পালন করে। এঁদের কার্যকলাপ অতিমানবীয় বলেই 'ভেল্কী' বা জাদুকরের কারিগরি বলে ভুল হয়। সুতরাং সত্যানন্দের কার্যধারা 'ভেল্কী' বলে মনে হলে তা ত্রুটি নয়; চন্দ্রনাথ বলেন, 'এই জন্যই আমি বলি যে, আনন্দমঠ অতি চমৎকার success'।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আনন্দমঠ'-এর জীবন 'সুদূরস্থাপিত ব্যাপার' ('devoid of human interest') নয়, আমাদের ছিন্নপক্ষ কল্পনা অতদূর উঠতে পারে না বলেই বঙ্কিমের কল্পিত আদর্শ জীবন আমাদের কাছে দূরবর্তী দেশে ও কালে স্থাপিত বলে মনে হয়। আমাদের কাছে যা অবাস্তব কবি-কল্পনায় তা-ই সত্য। আমরা যদি কোনদিন বঙ্কিমের কল্পনার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারি তাহলে সেদিন 'আনন্দমঠ'-এ 'প্রভূত human interest' দেখতে পাব। চন্দ্রনাথ 'আনন্দমঠ'কে real বলেন নি, সার্থকভাবেই বলেছেন, 'বঙ্গের সর্বোৎকৃষ্ট ideal জিনিষ…অথচ human interest-এ পরিপূর্ণ'। কারণ, স্বদেশভক্তিও human interest-এর অন্তর্ভুক্ত।

শান্তি চরিত্রের প্রশংসাযোগ্য আলোচনা করেছেন লেখক। নারীর সেবিকা মূর্তি নয়, তার পুরুষের কর্মসঙ্গিনীর রূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসী চেতনায় দেখা গিয়েছিল। চন্দ্রনাথ মূলত প্রগতিবিমুখ হয়েও নবচেতনার এই আলোতেই চক্ষু মেলেছিলেন। তিনি ভালোভাবেই জানেন যে, 'স্ত্রী patriot এবং বীর না হইলে পুরুষ বীর এবং patriot হয় না।' তাই পুরুষ জীবানন্দের বাহুতে শক্তি যোগাতে স্ত্রী শান্তি পরিকল্পিত। শান্তি শুধু

স্ত্রীমাত্র নয়, 'সহধর্মিনী'। উপন্যাসের প্রকৃতি অনুসারে নারী চরিত্রের প্রকৃতিও পরিবর্তিত করেছেন সচেতন শিল্পী বঙ্কিম। 'আনন্দমঠ', 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মত 'গার্হস্থ্য কথাগ্রন্থ' বা নভেল হলে শান্তির মধ্যে আমরা আর একজন কুন্দনন্দিনী, ভ্রমর বা কমলমণিকে পেতাম। তার পরিবর্তে বঙ্কিম শান্তিকে যেরূপ 'অগাধ প্রেম, পতিভক্তি, আত্মোৎসর্গ-প্রবৃত্তি এবং চপলতা, হাস্যময়ভাব, রসাধিক্য, sprightliness' প্রভৃতি নানাগুণে অলঙ্কৃত করেছেন তাতে মনে হয়, আত্মবিসর্জনে প্রতিজ্ঞাময় আনন্দমঠের বীর সন্ন্যাসীদের পাশেই তার স্থান নির্দিষ্ট। সুতরাং অনায়াসে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র শান্তি চরিত্রের পরিকল্পনাগত পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ।

'বঙ্কিমবাবু শান্তিকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন'। এ বিষয়ে চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মতদ্বৈধতা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'আনন্দমঠ'-এর পাণ্ডুলিপি পাঠ করে শোনান তখন চন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বঙ্কিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধ ও বিচারশক্তিকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি চন্দ্রনাথের অনুযোগ শোনেন নি মনে হয় না, কারণ প্রথম সংস্করণের শান্তি চরিত্র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অনেক রূপান্তর লাভ করেছে এবং চরিত্রটির উন্নতি ঘটেছে। বঙ্কিমের জীবিতকালে 'আনন্দমঠ'-এর পাঁচটি সংস্করণ হয়। ৫ম সংস্করণে (১৮৯২) শান্তি চরিত্রে স্বাভাবিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা আনতে ১ম সংস্করণের কোন কোন পরিচ্ছেদ বর্জন এবং নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে। বঙ্কিমের পরিণত মানসতা হয়ত এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী, কিন্তু চন্দ্রনাথ বঙ্কিমের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

চন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমবাবুর আধুনিক গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে' চন্দ্রনাথের মত জানতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত তিনি 'দেবী চৌধুরাণী' সম্পর্কে তাঁর প্রতিকূল মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের পত্রোত্তরে ৯ই অক্টোবর, ১৮৮৪ তারিখে যে পত্র লেখেন তাতে রবীন্দ্রনাথের উত্থাপিত কতগুলি আপত্তি সম্মুখে রেখে নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্ল চরিত্রে অসংগতি লক্ষ করেছিলেন এবং আমাদের অনুমান এটিই গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর প্রধান আপত্তি। চন্দ্রনাথ তাঁর পত্রপ্রবন্ধে প্রফুল্ল চরিত্রের অসংগতির অপবাদ নিরসনের চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর

ব্যাখ্যা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। এই জন্য তিনি 'দেবী চৌধুরাণী'র অবিমিশ্র প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেন নি, বঙ্কিমানুচর হওয়া সত্ত্বেও সমালোচকের নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন।

চন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আপনি বলিয়াছেন দেবী চৌধুরাণী কেমন করিয়া ডাকাইতি করিল?' চন্দ্রনাথের অভিমত, দেবী চৌধুরাণী প্রকৃতপক্ষে ডাকাতি করেন নি, ভবানী পাঠক একটি উচ্চ আদর্শ বিশিষ্ট ডাকাত দলকে 'উৎসাহিত, চমকিত এবং আবদ্ধ' করার প্রয়োজনে দেবীকে রানী সাজিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে ডাকাতি করেছিলেন তা সংকীর্ণ পরস্বাপহরণ নয়, উচ্চ আদর্শ প্রণোদিত—'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'। সুতরাং ডাকাতির নীচতা দেবীকে স্পর্শ করে নি বুঝতে হবে এবং রানীর দস্যুবৃত্তি তাঁর নারী চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে খণ্ডিত করে নি এই কারণে যে, ডাকাতির দলে থাকার ফলেই 'দৈবলব্ধ প্রভূত অর্থ' গরীবদের মধ্যে বিতরণের ব্যাপক সুযোগ পেয়েছিলেন। 'ইহাও স্ত্রী-স্বভাব সুলভ'। তাছাড়া রানীগিরি করা দেবীর 'মনোগত' কখনই নয়। রানীবৃত্তি কখনই তাঁর চরিত্রের অত্যাজ্য অংশে পরিণত হয় নি।

আলোচনার দ্বিতীয় স্তরে, দেবী রানীর চরিত্রের মৌল উপাদানগুলি আবিষ্কারের চেষ্টা বর্তমান। দেবীর জীবনপ্রণালীকে ('mode of life') লেখকের কাছে 'পুরুষালি রকমের' বলে মনে হয়েছে। আবার 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্ল যে 'আনন্দমঠ'-এর শান্তির পরিবর্তিত রূপ নয় তাও চন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন। শান্তি ও প্রফুল্লর চরিত্রগত উপাদান একই—বাঙালী নারীর স্বাভাবিক পুরুষনির্ভরতার পরিবর্তে আত্মনির্ভরতা এবং 'স্বাধীনতা বা সাহসিক ভাব'। এগুলি বাঙালী নারী চরিত্রে সচরাচর দেখা যায় না বটে কিন্তু এগুলি নারীধর্মের বিরোধীও নয়। রেনেসাঁস কালের কবি শিল্পীরা নারী চরিত্রের কমনীয় রূপের অন্তরালে বীর্যবতীর রূপটি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। 'আনন্দমঠ'-এ বঙ্কিম কল্যাণী ও শান্তির মধ্যে যথাক্রমে নারী চরিত্রের কুলাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনার দুই ভিন্ন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আর 'দেবী চৌধুরাণী'তে 'কল্যাণীর নীরব ধৈর্য ও শান্তির নেতৃত্বশক্তি, কল্যাণীর কমনীয়তা ও শান্তির সক্রিয় সপ্রতিভতা'[৬] দিয়ে সৃষ্টি করলেন প্রফুল্লকে। প্রফুল্ল বাস্তবজীবনের সত্য নয়, কিন্তু কবির কল্পনালোকে সত্যমূর্তিতে উদ্ভাসিত এবং রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় এই মূর্তিই 'সত্যতর'। চন্দ্রনাথ এখান থেকেই

একটি সিদ্ধান্ত অনায়াসেই পেয়ে গেছেন যে 'দেবী জীবনের চিত্র নয়, আদর্শ চিত্র'।

আদর্শ, কিন্তু অবাস্তব নয়। 'দেবী চৌধুরাণী'র যেটুকু বাস্তব অংশ অর্থাৎ তার দরিদ্র-জীবনের বিড়ম্বনা, মাতৃগৃহ ত্যাগ, শ্বশুরালয়ে গমন, পিতৃমুখাপেক্ষী অসহায় স্বামীর একই সঙ্গে স্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানলাভ, প্রত্যাবর্তন, কুটনীর প্রলোভন ইত্যাদি বর্ণনার (পরিচ্ছেদ ১—১৪) মধ্যে বঙ্কিম ভাবী দেবীরানীর ভূমিকা সযত্নে প্রস্তুত করে রেখেছেন। এই অংশে প্রফুল্ল চরিত্রে যথেষ্ট 'সাহস, প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতা' দেখা যায়। ফলে তাকে যখন ডাকাতদলের রানী হয়ে লোক পরিচালনা করতে দেখি তখন কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হয় না।

আলোচনার শেষ স্তরে, চন্দ্রনাথ যে তীক্ষ্ণ রসবোধ ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা অভ্রান্ত এবং তা আজও মূল্যহীন নয়। তিনি 'দেবী চৌধুরাণী'কে নিন্দিত করেছেন, উপন্যাসে theory অবতারণার জন্য। Theory বলতে চন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন বঙ্কিমের উদ্ভাবিত ও প্রচারিত অনুশীলন তত্ত্ব। তিনি বলেছেন জীবনধর্মী উপন্যাসে এই শুষ্ক তত্ত্বের অনুপ্রবেশের ফল ভালো হয় নি। উপন্যাসে অতিরিক্ত তত্ত্বারোপ চন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধকেও পীড়িত করেছিল। কিন্তু আমরা আবার এটাও দেখি যে, এখানে তত্ত্ব উপন্যাসের সঙ্গে শিথিলভাবে যুক্ত—চরিত্রের অন্তর্লোকে কোন স্থায়ী প্রভাব রেখে যায় নি। বস্তুত প্রফুল্লর আসল পরিচয় হল, সে স্বামী ভক্তিপরায়ণা বাঙালীঘরের চিরন্তনী বধূ; তাই শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল তার জন্য নির্দিষ্ট সংকীর্ণ সংসার সীমায় স্থান পেয়েছে। এ পরিণতি স্বাভাবিক। তত্ত্ব আছে কিন্তু তা সাহিত্যের দাবীকে নির্জিত করে প্রাধান্য পায় নি, এখানেই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব।

বর্তমান কালে বঙ্কিমের উপন্যাস সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরাও প্রায় শতবর্ষ পূর্বে লিখিত এই পত্রধৃত বিশ্লেষণ থেকে এক পাও অগ্রসর হয়েছেন, মনে হয় না। 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'সাবিত্রীতত্ত্ব' প্রভৃতির প্রণেতা চন্দ্রনাথ তাঁর স্বকালে এবং একালেও তত্ত্বান্বেষী বলে নিন্দিত। কিন্তু এখানে তিনি সাহিত্যে তত্ত্বানুপ্রবেশ বাধা দিতে চান সূক্ষ্ম রসবোধ থেকে। এ থেকে বুঝতে পারি, সাহিত্যের রসরাজ্যের ছাড়পত্র বিধাতা তাঁকে দিয়ে রেখেছিলেন।

সঞ্জীব সাহিত্যের প্রথম রসব্যাখ্যাতা চন্দ্রনাথ। বঙ্কিমের অনুরোধে তিনি সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন তা 'সমালোচনা' শিরোনামে 'সঞ্জীবনী সুধা'য় (১৮৯৩) গ্রথিত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' 'দামিনী' ও ও 'পালামৌ' নিয়ে প্রশংসনীয় আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য প্রবন্ধ 'সঞ্জীবচন্দ্র' প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও চন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মূল্য কমে নি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল অংশত চন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদে।

সঞ্জীবচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত ঢিলেঢালা ও শিথিল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কোন ব্যাপারেই তাঁর কোন তাড়া ছিল না। জীবিকার দায় ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি 'শয্যাবিলাসী' হয়ে পড়েছিলেন। মেজাজটিও তৈরি হয়ে গিয়েছিল মজলিসি ধরনের। তাঁর জীবনপ্রণালী তাঁর শিল্পী স্বভাবকে অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করেছিল। সঞ্জীবের সাহিত্যে বর্ণনা মন্থর, ঘটনানিয়ন্ত্রণে লেখকের কোন উৎসাহ নেই, শিশুসুলভ কৌতূহল ও যুবকের উৎসাহ নিয়ে তিনি জগৎকে দেখেছেন। পথ চলতে চলতে যেটা ভালো লাগে, সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন, তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করেন; গল্পের গতি রুদ্ধ হয়ে গেলেও কোন খেয়াল থাকে না। চন্দ্রনাথের মতে এটা একমাত্র 'সঞ্জীববাবুরই প্রণালী, আর কাহারও নয়' এবং এখানেই তাঁর 'নিজত্ব'। এই ভাবে শ্লথ চরণে পথ চলার দোষ কথাসাহিত্যে মারাত্মক হয়ে ওঠে কিন্তু ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। মন্থর বর্ণনা প্রণালীর দোষ সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭, দ্বি-স ১৮৮৬) ও 'মাধবীলতা' (১৮৮৪) উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্ট। অথচ 'পালামৌ' ('বঙ্গদর্শন', ১২৮১-৮২) একই প্রণালীতে লিখিত হয়েই সার্থকতার চূড়া স্পর্শ করেছে। বর্ণনার এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই 'উপন্যাস না হইয়াও পালামৌ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়'।

সঞ্জীবচন্দ্রের এই বিশিষ্ট বর্ণনাভঙ্গির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, চন্দ্রনাথের মতে, আপাত তুচ্ছ ও সৌন্দর্যহীন বস্তুও সঞ্জীবচন্দ্রের দৃষ্টিতে অসামান্য ও সৌন্দর্যময় হয়ে ধরা দিত। অপরাহ্ণে লাতেহার পাহাড়ের কোলে গিয়ে নিত্য বসার জন্য সঞ্জীব ব্যস্ত হতেন। নিজের এই মানসিক

অবস্থার সাদৃশ্য তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন গ্রাম্যবধূর জল আনার প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে। 'যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে, জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে।' বাংলার গ্রাম্যবধূদের জল আনার মত নৈমিত্তিক ঘটনায় যে কতখানি সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন থাকে, তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও 'দর্শনকার্যে অসাধারণ আসক্তি ও অভিনিবেশ' থাকায় সঞ্জীব এই দৃশ্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন।

'পালামৌ'-এ বর্ণিত নববিবাহিতা কোল বালিকাটির বিবাহ-রাত্রি যাপনের পর পিতা মাতার প্রতি আচরণের পরিবর্তন এবং ভাষণে ক্রমঃ-দূরত্বের ব্যঞ্জনার মধ্যে যে কারুণ্য সঞ্জীবচন্দ্র উদ্ঘাটিত করেছেন তা অনাস্বাদিতপূর্ব। এখানে সঞ্জীবের দৃষ্টি সৌন্দর্য-আবিষ্কারকের। চন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এইরূপে দেখা সঞ্জীববাবুর ধাত এবং এই ধাত সঞ্জীববাবুর নিজস্ব'। রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের এই মতটি প্রতিবাদযোগ্য মনে করেছিলেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশে বধূদের অপরাহ্নে জল আনতে যাওয়া সর্বসাধারণের 'সুগোচর' একটি পুরাতন ব্যাপার। 'সঞ্জীবচন্দ্র নিজের কল্পনার সৌন্দর্য-কিরণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন…যাহা সুগোচর তাহা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।'

চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের এই পার্থক্যের কারণ, সৌন্দর্য সম্পর্কে উভয়ের চিন্তা সম্পূর্ণ বিপরীত বিন্দুতে স্থাপিত। চন্দ্রনাথ বলেন, সঞ্জীব প্রধানত সৌন্দর্য আবিষ্কারক তাই গ্রাম্যবধূর জল আনতে যাওয়া বা সদ্যঃ বিবাহিতা বালিকার আচরণের মত অতি পরিচিত ঘটনার মধ্যেও তিনি সৌন্দর্য দেখেন; অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের মতে, সঞ্জীবচন্দ্র মুখ্যত সৌন্দর্যস্রষ্টা। তিনি বাংলাদেশের অতি 'সুগোচর' ঘটনার উপর অন্তরস্থিত কবিকল্পনার স্বর্ণজাল বিস্তৃত করে দেন, তার ফলে অতি পরিচিত বস্তুও অপরূপ হয়ে ওঠে এবং অসাধারণত্বের ব্যঞ্জনা লাভ করে। অপরাহ্নে জল আনতে যায় যে মেয়েটি, সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যে সে নবসৃষ্টি।

সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করে চন্দ্রনাথ সে যুগের পক্ষে প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বালকসুলভ কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে সঞ্জীব জগৎকে দেখেন এবং এই দর্শনজাত উপলব্ধিকে যে ভাষার পর্ণপুটে তুলে ধরেন তাও বালকের ভাষার মতই স্খলিত অসংলগ্ন ও মিষ্ট।

সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষা সম্পর্কে চন্দ্রনাথের উক্তি, 'তাঁহার ভাষা বালকের কথার ন্যায় সহজ সরল মিষ্ট ও কারুকার্যহীন'।

সঞ্জীবচন্দ্র স্বসম্পাদিত 'ভ্রমর'-এর পৃষ্ঠাপূরণের জন্য এবং অবশ্যই পাঠক আকর্ষণের জন্য 'দামিনী' (১২৮১) ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১২৮৩) নামে দুটি 'অতি ক্ষুদ্র গল্প' লেখেন। অনুজ পূর্ণচন্দ্রের 'মধুমতী' ('বঙ্গদর্শন,' জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ('বঙ্গদর্শন,' চৈত্র ১২৭৯) ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' ('বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৮০) নামে দুটি 'বড় গল্প' বা 'ছোট উপন্যাস'[৭] আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। একথা স্বীকার করা ভালো যে, সঞ্জীবচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্র এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও ছোটগল্পের বিশিষ্ট আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। উপন্যাস ও ছোটগল্পের কাহিনীর যে বিন্যাসগত পার্থক্য আছে তা চন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। তিনি লিখেছেন—

'কণ্ঠমালা ও মাধবীলতা যে প্রণালীতে লিখিত দামিনী ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট সে প্রণালীতে লিখিত নয়।....এই দুইটি ক্ষুদ্র গল্পে সঞ্জীববাবুর বেশ ত্বরিতগতি দেখা যায়, স্থানে স্থানে তাঁহার স্বাভাবিক মৃদুতার পরিবর্তে বিলক্ষণ আবেগ ও উদ্দামভাবও পরিলক্ষিত হয়।'

এখানে লক্ষণীয়, ছোটগল্পের কাহিনীতে যে ত্বরিৎগতি আবশ্যক হয়, তা চন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতানুযায়ী স্ত্রী ও সংসার-প্রেমিক রামেশ্বর শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের অভিশাপে বিপথগামী ও উদ্‌ভ্রান্ত এবং 'দামিনী'তে রয়েছে হারিয়ে-যাওয়া অপ্রকৃতিস্থা মায়ের নানা দুঃসাহসিক কার্যকলাপ। এদের এই 'খর উদ্দামভাব' কাহিনীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ছোটগল্পের প্রত্যাশিত দ্রুতগতি সঞ্চার করেছে।

চন্দ্রনাথের 'সমালোচনা' (১৮৯৩) লিখিত হবার আট বৎসর আগে ব্রাণ্ডার ম্যাথুস 'The Philosophy of Short Story' (১৮৮৫) প্রকাশিত হয়ে ছোটগল্পের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিণী' (শ্রা. ভা. ১২৮৪) 'ঘাটের কথা' (কা. ১২৯১), 'দেনা পাওনা' (১৮৯১), 'পোস্টমাস্টার' 'গিন্নি' (আষু. ১২৯৮) প্রভৃতি অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়ে বাংলা ছোটগল্পের একটি আদর্শ তৈরি করে দিয়েছিল। চন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট'-এ বর্ণিত হয়েছে জেল-ফেরৎ রামেশ্বর গভীর রাত্রে স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে আলাপরতা দেখে ভুল

করল এবং পুনরায় জেলেই ফিরে গেল। 'এই অংশটি হচ্ছে ছোটগল্পের মোড় ফেরার কৌশল—নাটকীয় মুহূর্ত'।[৮] আবার 'দামিনী'র সমাপ্তিতে ভৈরবীর ছদ্মবেশিনী দামিনীর মাতা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে জামাতাকে স্বহস্তে হত্যা করল—সমাপ্তির এই 'হঠাৎ চমক' ছোটগল্পের পরিশীলিত আঙ্গিককে স্মরণ করায়। সুতরাং সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে চন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ তাঁর গভীর সাহিত্যোপলব্ধিরই পরিপূরক।

'সমালোচনা'র শেষাংশে সঞ্জীবসাহিত্যের পাগল বা উৎকেন্দ্রিক চরিত্র-গুলি সম্পর্কে চন্দ্রনাথের মন্তব্য শোনা যায়। বাংলা সাহিত্যে এই আলোচনা অভিনব এবং পাগলচরিত্র সৃষ্টিতে যে স্রষ্টার প্রবণতা অনেকাংশে ধরা পড়ে চন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে তা উদ্‌ঘাটিত। সঞ্জীবচন্দ্রের পূর্বেই বঙ্কিম তাঁর 'বিষবৃক্ষ' ও 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে দুটি বিকৃতমস্তিষ্কা নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন—যথাক্রমে হীরা ও শৈবলিনী। উন্মাদ বা উৎকেন্দ্রিক চরিত্রসৃষ্টিতে সঞ্জীবচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাগল তো এক অর্থে শিশুই। তাদের অসংলগ্ন আচরণ ও অসম্বদ্ধ ভাষণ শিশুর আচরণ ও বাক্যের সমধর্মা। শিশুসুলভ মনের অধিকারী হওয়ায় পাগল চরিত্রগুলি সঞ্জীবচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়। চন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সঞ্জীববাবু পাগল পাগলী গড়িতে বড় ভালবাসিতেন'। তাঁর প্রায় প্রত্যিটি গল্পে একটি করে পাগল চরিত্র বর্তমান। 'কণ্ঠমালা'য় শৈল, 'মাধবী-লতা'য় পিতম, 'দামিনী'তে দামিনীর নিরুদ্দিষ্টা জননী এবং 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট'-এ রামেশ্বর স্বয়ং। স্বৈরিণী শৈলর মস্তিষ্কবিকৃতির পিছনে তার অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষার ছায়াপাত ঘটেছে যদিও লেখকের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে নি। সঞ্জীবচন্দ্রের 'শৈল' অনেকাংশে বঙ্কিমের শৈবলিনীর সাদৃশ্যে পরিকল্পিত। চন্দ্রনাথ শৈলচরিত্র সম্পর্কে নীরব। কিন্তু বাকি চরিত্রগুলি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতায় মণ্ডিত।

পিতম প্রাক্তন রাজকুমার বিজয়রাজ। হত্যাপরাধজনিত ভীতি তার মস্তিষ্কবিকৃতির কারণ। সে সর্বত্রগামী ও দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী। তার মুখে লেখক জ্ঞানীজনসুলভ ও গভীর অর্থবহ ভাষা বসিয়েছেন। 'পিতম চরিত্র, তার উক্তি ও মন্তব্য বাংলা সাহিত্যে নতুন'। সঞ্জীবচন্দ্রের পিতম, গিরিশচন্দ্রের বিদূষক ('জনা') ও করিমচাচা ('সিরাজদ্দৌলা') এবং দ্বিজেন্দ্রলালের দিলদার ('সাজাহান') ও কালীচরণ ('পরপারে')-এর পূর্বজ সহোদর। পিতম 'পরিচিত সত্যের উপর উদ্ভট আলোকপাত'

ঘটিয়ে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে পৌনঃপুনিক মন্তব্যগুলি করেছে তাকে ভ্রান্তিজনক বলে চন্দ্রনাথের মনে হয়েছে। সে তুলনায় রামেশ্বরের পাগলামি 'অতি উত্তম'। কেননা, তা 'ক্ষণকালের নিমিত্ত' এবং 'উৎকট দাম্পত্য-প্রেমের বিকট প্রতিধ্বনি'।

দামিনীর মাতা পতিশোকে উন্মাদিনী ও দীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্টা। তারপর একদিন ভৈরবীর ছদ্মবেশে তার আবির্ভাব ঘটল এবং কন্যাজামাতার স্বর্গীয় প্রেমের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে সেই গ্রামেই বাস করতে লাগল। অপহরণকারীর হস্ত থেকে কন্যাকে উদ্ধারও করল কিন্তু শ্বশুরালয় থেকে বিতাড়িতা কন্যার মৃত্যু রোধ করতে পারল না। শেষে অনুতপ্ত ও অশ্রুপ্লাবিত জামাতা রমেশকে সে গলা টিপে হত্যা করল। চন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যে পতিপ্রাণা পতির জন্য মরে, তাহার পতিকে সে গলা টিপিয়া মারিয়া তাহারই সঙ্গে পরলোকে পাঠাইয়া দেয়'। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণের প্রশংসা করতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য, 'দামিনীর মায়ের পাগলামির মধ্যে চন্দ্রনাথবাবু একপ্রকারের poetic justice বা কাব্যোপযোগী ন্যায়বিচার আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু উহা অনেকটা কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয়'।[৯] কারণ, এই পাগলামি শুধু রমেশের হত্যাকাণ্ডেই আত্মপ্রকাশ করেছে—পূর্বাপর আচরণের সঙ্গে দামিনীর মাতার এই আচরণ সামঞ্জস্যহীন। চন্দ্রনাথের পরিচ্ছন্ন সাহিত্যবুদ্ধি যে কখনও কখনও কষ্টকল্পনায় আচ্ছন্ন হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

৪.

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কৈশোরক' রচনাবলীর কয়েকজন উৎসাহী ও অনুরক্ত পাঠক পেয়েছিলেন যাঁরা সস্নেহ অনুরাগে কিশোর কবির অর্ধস্ফুট রচনাকেও বাংলা সাহিত্যের উদার অঙ্গনে স্বাগত জানাতে দ্বিধা করেন নি। মুষ্টিমেয় সেই অনুরাগীদের অন্যতম, হয়ত বা প্রধানতম ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু।

মুকুলিত কৈশোর থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবি পরিচয়ই মুখ্য। কিন্তু তিনি ওই সময়ে কবিতাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে গল্প প্রবন্ধ ও উপন্যাসও লিখেছিলেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের উপর লেখা তাঁর সমালোচনা আজও আমাদের উৎসুক করে। 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বৎসরে রবীন্দ্রনাথের 'করুণা' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় (আশ্বিন ১২৮৪—ভাদ্র ১২৮৫ ; মাঘ ১২৮৪ বাদে)।

'ভারতী'র উদ্বোধনী সংখ্যায় 'ভিখারিণী' নামে একটি গল্প লিখে তিনি কথা-সাহিত্য রচনার সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। পরবর্তী কালে 'করুণা' উপন্যাস সমালোচকদের দাক্ষিণ্য লাভে সমর্থ হয় নি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই পর্বের রচনাগুলির সঙ্গে 'করুণা'কেও 'বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অংকিত' বলে রচনাটি সম্পর্কে নিরুৎসাহ দেখিয়েছিলেন। রচনাটি কোনদিন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নি। যেহেতু কবিরই কথায় তা 'প্রকাশের পূর্ণতায়' পৌঁছয় নি।

ষোল বৎসর বয়সে লেখা এই রচনাটির প্রতি কবি নির্মোহ হতে পারেন কিন্তু নির্মম হওয়া কি সম্ভব? দেখা যাচ্ছে, 'ভারতী'তে প্রকাশিত হবার সাত বৎসর পরে 'ভারতী'র ২ বৎসরের সমস্ত সংখ্যা এক সঙ্গে 'সাহিত্যবন্ধু' চন্দ্রনাথ বসুকে পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'করুণা' সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। কবির এই পুনরুজ্জীবিত আগ্রহ দেখে মনে হয় রচনাটি ঘষে মেজে প্রকাশ করার বাসনা তাঁর ছিল। এর উত্তরে চন্দ্রনাথ অতি বিস্তৃত 'সমালোচনাপূর্ণ' একটি পত্র লেখেন (তারিখ, ১৭ই আশ্বিন ১২৯১)। পত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও লেখকের নিবিড় সাহিত্যবোধে উজ্জ্বল। তা থেকেও বড় কথা 'চন্দ্রনাথ বসুই রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম সমালোচক'।[১০] চন্দ্রনাথের পত্রাকার প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা হিসাবেও আদর্শস্থানীয়। চন্দ্রনাথ এই পত্র লিখেছিলেন প্রায় শত বৎসর পূর্বে, তা সত্ত্বেও সমালোচনার উত্তুঙ্গতা বিস্ময়কর।

চন্দ্রনাথের সমালোচনার সমালোচনা করার পূর্বে 'করুণা' উপন্যাসটি সম্পর্কে পরবর্তী কালের যশস্বী সমালোচকদের মতামত এক লহমায় জেনে নেওয়া যেতে পারে। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'করুণা' অপরিণত রচনা, (যদিও) ঐতিহাসিক মূল্য বর্জিত নয়'।[১১] ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'উপন্যাস হিসাবে মূল্যহীন।[১২] ড. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে 'অসম্পূর্ণ'।[১৩] সজনীকান্ত দাস[১৪], জগদীশ ভট্টাচার্য[১৫], রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়[১৬] প্রভৃতি সমালোচকেরা 'করুণা' যে একখানি 'অসম্পূর্ণ উপন্যাস' এ সম্পর্কে দ্বিমত হন নি। রবীন্দ্রসঙ্গী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ স্পষ্টতই জানিয়েছেন, 'an unfinished social novel'.[১৭]

চন্দ্রনাথ বসুর পত্রে 'করুণা'কে সম্পূর্ণ উপন্যাস ধরেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত সমালোচকরা চন্দ্রনাথের পত্রের খবর জানতেন না, একথা

বলার দুঃসাহস আমাদের নেই। কেননা এই বিস্তৃত পত্রটি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সংগ্রহ থেকে নিয়ে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫১ পৃ, ৪২০-২৩) প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে। কিন্তু ঔদাসীন্য নিশ্চয়ই ছিল, তাই তাঁরা চন্দ্রনাথের এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রটি সতর্ক বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করেন নি। না হলে দেখা যেত, চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাসে নানারূপ ত্রুটি আবিষ্কার করেও 'অসম্পূর্ণতা'র দোষ দেন নি। বরং তিনি সমগ্র আলোচনার শেষে জানিয়েছিলেন, 'গল্পটি পুস্তকাকারে ছাপান আবশ্যক'।

'অসম্পূর্ণতার কিংবদন্তী' থেকে 'করুণা'কে উদ্ধার করে কানাই সামন্ত একটি আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩৬৯)। অতঃপর ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ তাঁর গবেষণা নিবন্ধে আরও তথ্য প্রমাণে সজ্জিত করে 'করুণা'র অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে খণ্ডন করেছেন। ড. সত্যব্রত দে 'করুণা'কে সম্পূর্ণ উপন্যাস ধরে নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৮] এঁরা সকলেই চন্দ্রনাথ বসুর পত্র থেকে বিস্তৃতভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধার করে নিজেদের বক্তব্যের অনুকূলে প্রয়োগ করেছেন। চন্দ্রনাথের পত্রাকার প্রবন্ধটিতে 'করুণা'র কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্র-নির্মাণ, বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষা প্রয়োগ ইত্যাদি উপন্যাসের সব কটি অঙ্গ বিশ্লেষিত এবং লেখক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তরুণ লেখককে গঠনমূলক পরামর্শও পেশ করেছেন।

প্রথমত উপন্যাসের 'প্লট' প্রসঙ্গ। চন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, 'করুণা'র কাহিনীতে দুটি 'এপিসোড' আছে। একটি, নরেন্দ্র এবং করুণার গল্প; অপরটি, মহেন্দ্র এবং রজনীর গল্প। উপন্যাসে এদের শিথিল গ্রন্থন (loose plot) চন্দ্রনাথের কাছে পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'গল্পের অঙ্গ যত অসম্বদ্ধ থাকে গল্প ততই কম জমাট হয় এবং সেজন্য পাঠকের মনও ভাল বসে না। কিন্তু কেমন করিয়া গল্পের দুইটি সূতা আরও আগে মিলান যাইতে পারে তাহা আমি বলিতে পারি না—আপনি একটু ভাবিলেই বোধ হয় ঠিক করিতে পারিবেন'। দৃঢ়পিনদ্ধ গঠন (organic plot) যে উপন্যাসের পক্ষে উপযোগী চন্দ্রনাথ তরুণ ঔপন্যাসিককে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

চন্দ্রনাথ কতখানি আগ্রহ ও যত্ন নিয়ে 'করুণা' পড়েছিলেন তার প্রমাণ চিঠির প্রতিটি ছত্রে ছড়িয়ে আছে। তিনি শুধুমাত্র গতানুগতিক ধারায়

'প্লট'-এর ত্রুটি নির্দেশ করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে রচনাকে ত্রুটি মুক্ত করার উপায়ও নির্দেশ করে বলেছেন, 'আমার মনে হয় যেন করুণার নির্বাসন উপলক্ষে (···) ষড়যন্ত্রের অবতারণা করিয়া করুণাকে কাশীতে আনিয়া ফেলিলে গল্পের এই অংশটুকু বেশ পরিপাটি হয় এবং করুণার চরিত্র-গৌরব (যাহা আমার মতে এইখানে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে) বজায় থাকে।'

পণ্ডিতমশায়-কাত্যায়নী উপকাহিনীর উপভোগ্যতা, সরসতা ও পণ্ডিত মশায় চরিত্রের দেবদুর্লভ গুণের প্রশংসা করেও তিনি এই কাহিনীর শিথিল বিন্যাসের অপ্রশংসাই করেছেন। চন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'গল্পের তিনটি সূতাই বেশ ভাল পাঁজের সূতা ; কিন্তু তাঁতির বুনন কিছু আল্গা হইয়াছে'।

দ্বিতীয়ত চরিত্রালোচনা। করুণা ও রজনী চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে প্রত্যাশিত চরিত্র-বৈপরীত্য (contrast) সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এদের চরিত্রের উপাদানগত পার্থক্য চন্দ্রনাথের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি, 'করুণা কেবল কল্পনামাত্র—মানবচরিত্র নয়। রজনী প্রকৃত মানবচরিত্র। করুণা কর্মক্ষেত্রে আসিবার জিনিষ নয়, রজনী কর্মক্ষেত্রের জিনিষ। করুণাতে কেবল ভাব আছে, বুদ্ধি নাই···এবং সেই জন্য ভাবাধিক্যে রজনীর শ্রেষ্ঠ হইয়াও গৌরবে রজনীর নিকৃ[ষ্ট]'। চন্দ্রনাথ করুণা সম্পর্কেই বেশি আলোচনা করেছেন কিন্তু ঔপন্যাসিক চরিত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন ভাবময়ী করুণাকে নয়, রজনীকে। চন্দ্রনাথের এই অনুধাবনে সত্য আছে।

তৃতীয়ত, চন্দ্রনাথ 'করুণা' উপন্যাসে সামাজিক উপাদান নিয়েও আলোচনা করেছেন। সে যুগের যুবকদের মদ্যপান, বিধবাবিবাহ, নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে চরিত্রভ্রষ্টতা, সমাজসংস্কারের হাস্যকর আতিশয্য প্রভৃতিকে স্থান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলির সমাজ সংশ্লিষ্ট পরিচয় মুখ্য করে তুলেছিলেন চন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে।

চতুর্থত, বর্ণনা-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। চন্দ্রনাথের দুটি বক্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে—

১. 'গল্পের প্রথমাংশে চরিত্রগুলি কিছু কিছু বুঝাইয়া বুঝাইয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ analytical প্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাসে analytical প্রণালী বড় ভাল লাগে না।'

২. 'উপন্যাসের একটি প্রধান অঙ্গ কথোপকথন, তাহারই গুণে উপন্যাস

dramatic হয়। করুণাতে সেই dramatic অংশ নাই, একটু থাকিলে ভাল হয়।'

উল্লেখ করা যায়, চন্দ্রনাথ উপন্যাসসৃষ্টিতে রবীন্দ্র-অবলম্বিত বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি পছন্দ করেন নি। অথচ আমরা জানি, এটাই রবীন্দ্রনাথের স্ব-ক্ষেত্র। 'বিশ্লেষণ করে পাত্রপাত্রীদের আঁতের কথা বের করে দেখানোর যে রীতি রবীন্দ্র-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য তার সূত্রপাত করুণাতে।'[১১] বাংলায় মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথে। বঙ্কিমীরীতি যে পরিত্যক্ত হবে তা স্বাভাবিক। রবীন্দ্র উপন্যাসের বিশেষ শিল্পধর্মটি করুণায় আভাসিত।

রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সে লেখা প্রথম উপন্যাসের চন্দ্রনাথকৃত এই সমালোচনা সমালোচনার একটি আদর্শে পৌঁছতে পেরেছিল। সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টি, সংবেদনশীলতা ও রসজ্ঞতার অজস্র পরিচয়ে চন্দ্রনাথের পত্রাকার প্রবন্ধটি চিহ্নিত।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা চন্দ্রনাথের মুষ্টিমেয় যে কখানি পত্র আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তাতে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে পত্রলেখকের নিবিড় অনুরাগ ও রসভোক্তার আনন্দিত মনের পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে। এই পত্রগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথের দুটি ছোটগল্প—'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ('সাধনা', অগ্রহায়ণ ১২৯৮) ও 'দালিয়া' ('সাধনা', মাঘ ১২৯৮) এবং চারখানি কাব্য—'কণিকা' (৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০৬) 'কথা' (১ মাঘ, ১৩০৬) 'কল্পনা' (২৩ বৈশাখ, ১৩০৭) ও 'ক্ষণিকা' (শ্রাবণ, ১৩০৭) আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় চন্দ্রনাথ নিজের পূর্বজীবনে অবলম্বিত বিশ্লেষণপন্থা অনুসরণ করেন নি, তিনি এখন পুরোপুরি আস্বাদনপন্থী। বঙ্কিম-সাহিত্য বা সঞ্জীব-সাহিত্য এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'করুণা' উপন্যাসের আলোচনায়ও তিনি যুক্তিসেবিত যে বিশ্লেষণ প্রণালী গ্রহণ করেছিলেন এখানে তা বিসর্জন দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয়লাভে লেখকের বিমুগ্ধ ও বিস্মিত মনের মুদ্রাংকন পত্রগুলিতে আছে। অথবা একথাও বলা যায় যে, চন্দ্রনাথ এখন সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রগ্রস্ত।

'সাধনা'য় প্রকাশিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ছোট গল্প পাঠ করে চন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। ২৫শে পৌষ ১২৯৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথকে লেখা

চন্দ্রনাথের একটি পত্রে সেই মুগ্ধতা প্রকাশিত। তিনি লিখেছিলেন, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন নামক গল্পটি আমাকে বড় সুন্দর বোধ হইয়াছে।... এ ছবিটা মনে এমনি বসিয়া পড়িয়াছে যে কখনই মুছিয়া যাইবে না। এটা প্রতিভার তুলিতে আঁকা। তোমার তুলিতেও বোধ হয় আর এমন ছবি উঠে নাই।' 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এ অন্তিম মিলনের মধ্যেও রাইচরণের বেদনা প্রচ্ছন্ন। অনুকূলবাবুর শিশুপুত্রের বর্ষাস্ফীত পদ্মাতরঙ্গ কর্তৃক গ্রাস ইত্যাদি বর্ণনাঐশ্বর্যে সার্থক ও ব্যঞ্জনাময়। অশিক্ষিত, সংস্কারান্ধ, 'স্থির ধারণায় যারা একান্ত প্রভাবিত' বৃদ্ধ রাইচরণের নিজের ছেলেকে মনিবপুত্রের স্থলাভিষিক্ত করা আমাদের মনস্তত্ত্বজ্ঞানকে খণ্ডিত করে না। কিন্তু অনুকূলবাবু, তাঁর স্ত্রী ও ফেলনার আচরণ বাস্তবতার সীমাকে লঙ্ঘন করে কিনা, এ প্রশ্ন থেকে যায়। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের দুরূহ বিন্যাসকৌশলে (চন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'প্রতিভার তুলি') আমরা এমনই মুগ্ধ হয়ে থাকি যে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতেও পারি নে। আমাদের মনে হয়, ছোটগল্পের বিন্যাস কৌশল ছাড়াও অন্য যে কারণে গল্পটি চন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল তা হল রাইচরণের সত্যাশ্রয়িতা যা চিরকাল ভারতবর্ষের সুউচ্চ জীবননীতির অন্তর্গত।

প্রসঙ্গক্রমে 'হিতবাদী'তে প্রকাশিত 'পোষ্টমাষ্টার' (? ১২৯৮) গল্পটিও ঈষদ্ আলোচিত হয়েছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এর তুলনায় 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটি চন্দ্রনাথের ভালো লাগে নি। কারণ, তাঁরই ভাষায় 'সচরাচর যাহাকে কবিত্ব বা sentiment বলে' তার আধিক্য। আবেগের অসংযত প্রকাশ যে অনেকক্ষেত্রে ছোটগল্পের ভটবন্ধকে প্লাবিত করে শিল্পসুষমাকে বিনষ্ট করে, গল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে এই সূক্ষ্মবোধ চন্দ্রনাথের চেতনায় ছিল। তাই কবিত্ব বা sentiment-এর 'বাড়াবাড়ি' 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটির শিল্পমূল্য কমিয়েছে বলে চন্দ্রনাথের ধারণা। অথচ রতনের অনুচ্চারিত স্নেহ স্বীকৃতি না পেয়ে গল্পে যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে তা লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে আমাদের মনে হয়।

২রা ফাল্গুন ১২৯৮ সনে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক পত্রে 'দালিয়া' গল্প সম্পর্কে চন্দ্রনাথের মন্তব্য আছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এ পত্রলেখক 'মানবপ্রকৃতির রহস্য'-এর সন্ধান পেয়েছিলেন, 'দালিয়া'তে লক্ষ করেছেন 'কবিত্বের বড় কোমল একটি কলি'। আরাকানের উদার বন্য প্রকৃতি

-পরিবেশের প্রভাবে আভিজাত্য হারিয়ে আমিনার মধ্যে সহজ মানবিক বৃত্তিগুলি শক্তি অর্জন করেছে। তার ফলে প্রতিহিংসা গ্রহণের লৌকিক কর্তব্য ভার তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ল। দালিয়ার সঙ্গে শাহজাদী আমিনার মধুর মিলন হৃদয়ের সহজ আকর্ষণ বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইটুকুই গল্পের মাধুর্যপূর্ণ কবিত্বের দিক যা চন্দ্রনাথের মতে 'ভোগ করিবার জিনিস'। সুজার অপর কন্যা জুলেখা নারীর স্বাভাবিক ধর্মকে অস্বীকার করে ভগ্নী আমিনার মধ্যে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ কামনা সঞ্চারিত করতে চেয়েছে। এটুকু গল্পের বীরত্বের দিক। তাই 'দালিয়া' গল্প 'বীরে মধুরে বড়ই মনোহর হইয়াছে'।

রবীন্দ্রনাথ 'দালিয়া' গল্পের পটভূমিতে রেখেছেন অতীত ছায়াচ্ছন্ন ইতিহাসের একটি পট। 'প্রাচীন কালের দস্যু তস্করদের সময়ের একটু ভাঁজ' থাকায় 'দালিয়া'র জগৎ বর্ণাঢ্য রোমান্সের জগৎ। এই গল্পের 'রোমান্টিক কাব্য ও রোমান্সের সুন্দর মিলন মিশ্রণ' চন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছে। গল্পের শেষে নাটকীয় চমক বর্তমান ('সেই শেষটুকু, ছুরিকার সেই ঝিকিমিকি হাসিটুকু') এবং এর ফলেই গল্পের আঙ্গিক সিদ্ধি ঘটেছে। চন্দ্রনাথের মতে 'এটুকু কাব্য'।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের পূর্বে রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে চন্দ্রনাথের কোন সপ্রশংস উল্লেখ আমাদের চোখে পড়ে নি। অথচ এই কালসীমার মধ্যে কবি 'মানসী' (১২৯৭) 'সোনার তরী' (১৮৯৩) 'চিত্রা' (১৩০২) ও 'চৈতালি' (১৩০৩) রচনা শেষ করেছেন। কাব্যক্ষেত্রে কবির পদক্ষেপ তখন সুনিশ্চিত লক্ষ্যাভিমুখী। তা সত্ত্বেও চন্দ্রনাথের নীরবতা বিস্ময়কর মনে হয় না এই কারণে যে, প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর বাঙালী পাঠকসমাজের সসম্মান অভ্যর্থনা লাভ করেন নি। রবীন্দ্রবিরোধীরা দ্বিজেন্দ্রলালের অধিনায়কত্বে দলবদ্ধ হয়েছিলেন এবং রোমান্টিকতার আতিশয্য রবীন্দ্রকাব্যে একটি অস্পষ্টতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ এনেছিলেন। আপন অন্তর্লোকে মগ্ন কবির কাছে বৃহত্তর সমাজজীবন মূল্য পায় নি। সেই সময় চন্দ্রনাথের মুখে এমন মন্তব্যও শোনা গেছে যে, 'তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বাঙ্গালী কবিতাকে জাতীয় ও স্বদেশী করিয়া তুলিবেন বলিয়া আশা হয় না'।[২০]

অথচ 'কণিকা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথ সাদরে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানালেন। গ্রন্থপ্রকাশের (৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩০৬) চার সপ্তাহের

মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখে (তারিখ ২রা পৌষ ১৩০৬) তিনি 'কণিকা' পাঠে নিজের আনন্দানুভূতির সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। 'কণিকা'র সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বিষয়বস্তুর সর্বজনীনতা ও স্পষ্টতা, 'স্বল্পায়তন ভাবগাঢ়তা ও প্রকাশ সংহতি'। প্রত্যহের পরিচিত জীবন থেকে প্রাপ্ত কতগুলি নীতিকে অভিজ্ঞতার চাপে জমাট করে 'কণিকা'র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির কায়া নির্মিত হয়েছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, কবিতাগুলির 'বস্তু অংশ আহৃত হইয়াছে কোন কল্পনা-সমুন্নত আদর্শবাদ হইতে নহে, খাঁটি বাস্তব উপলব্ধিপ্রসূত জীবন-অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হইতে'।[২১] জীবনের অসংগতি ও ভণ্ডামির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে উজ্জ্বল ও ক্ষিপ্র বুদ্ধির পরিচয় এখানে মুদ্রিত কিন্তু কৌতুকরসের অভিসিঞ্চনে ব্যঙ্গের স্বাভাবিক রূঢ়তা অনেক পরিমাণে বর্জিত। পত্র-লেখকের মতে স্মিত 'কৌতুকচ্ছটায় ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা চাপা' পড়ায় 'কণিকা'র আস্বাদ্যমানতা বেড়েছে।

চন্দ্রনাথের রসজিজ্ঞাসা যে কত নিবিড় ও অভ্রান্ত ছিল 'কণিকা' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলিতে তার প্রমাণ আছে। তিনি বলেছেন, ('কণিকায়) অনেক গূঢ় গভীর কথা অতি [illegible]ঠ্য, অনেকস্থলে কবিত্বপূর্ণ 'বচনে' বলিয়াছ। তোমার অনেক লেখায় wit-এর পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু কণিকায় wit-এর প্রাণ (soul) দেখিলাম। দেখিয়া তোমার প্রতিভার ভিত্তি কোথায়, তাহাও যেন একটু বুঝিলাম'। উক্ত পত্রে একটি ব্যাজস্তুতিমণ্ডিত বাক্য যোগ করেছেন লেখক—'কণিকায় সবই ভাল হইয়াছে—কেবল উহার নামকরণ ঠিক হয় নাই, 'হীরক কণিকা' বলিলে ঠিক নামকরণ হইত।'

৩০শে শ্রাবণ ১৩০৭ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথকে লেখা অন্য একটি পত্রে 'কণিকা' সম্পর্কে নিজের কাব্যসম্ভোগের আনন্দকে তিনি বিস্তীর্ণ করে দিয়েছেন এবং উদীয়মান রবির কাব্যপাঠে অভিভূত হয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁকে অভ্যর্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এক সময় পদ্মানদীর পাড়ে বাংলার পল্লী জীবনের ঠিক কেন্দ্রস্থলটিতে বাস করেছিলেন, 'সোনার তরী'র সেই স্মৃতি অবসিত হয় নি। 'কণিকা'র মধ্যে তা নববেশে ধরা দিয়েছে। চন্দ্রনাথ 'কণিকা'র কবিতাগুলিতে 'পল্লীপ্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌরভ'-এর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ ও অভিভূত।

তিনি লিখেছেন, 'কি জানি কেন, 'বিরহ'-এর সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ।' এই বিচার নিঃসন্দেহে গভীর সাহিত্য-

বোধ থেকেই এসেছে। কারণ উক্ত কবিতায় নির্জন উদাস মধ্যাহ্নের পটে বিরহের ভাবান্তর মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই হৃদয়বেদনায় কোন উদ্বেলিত মত্ততার ইংগিত নেই, কেবল আছে গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে জনবিরল পল্লীপথ ও বিরহিণীর কল্পনাজাল বুনন। স্বল্প আধারেই কবির মনোভাব অপূর্ব শিল্পমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

স্বয়ং কবি চন্দ্রনাথের সাহিত্য বিচারকে মূল্য দিতেন এবং তাঁর প্রশংসা পেয়ে উৎসাহিত হতেন। এর প্রমাণ পাই বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে (১৮৫৪-১৯১৬) লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে (পত্র তারিখ ৩১শে শ্রাবণ ১৩০৭)—

"আজ চন্দ্রনাথবাবুর একখানি চিঠি পেয়ে বিশেষ উৎসাহ লাভ করলুম।... এই চিঠিখানি পড়ে উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থই সংকোচ ও লজ্জা অনুভব করলুম। প্রাপ্যর চেয়ে অধিক পেয়েছি সে বিষয়ে আমার নিজের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। —'বিরহ' কবিতাটি আমার নিজের কিছু বিশেষ প্রিয়—সেইটি উনি বিশেষরূপে নির্বাচন করাতে আমি একটু বিশেষ খুসি হয়েছি।'[২২]

১৯০০-১৯০১—এই এক বৎসরের মধ্যে তিনি বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে পর পর লিখে গেলেন 'কথা' 'কাহিনী' 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা'। চন্দ্রনাথের পত্রে তারই ইংগিত, 'তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই—তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ।' কবি 'কথা'র বিষয়বস্তু আহরণ করেছিলেন ভারতের গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার বাসনা দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিম তাই ইতিহাস ঘেঁটে বীর্যমণ্ডিত ভারতকে অনুসন্ধান করেছেন, ভূদেব সেই ভারতবর্ষের ইতিহাসকে পেয়েছিলেন যদিও তা ছিল 'স্বপ্নলব্ধ'। রবীন্দ্রনাথও 'কথা'য় খুঁজে পেয়েছেন সেই ভারতকে যে ভারত ত্যাগব্রতে, আত্মোৎসর্গের প্রেরণায়, স্বদেশভক্তিতে সর্বোপরি সত্যনিষ্ঠায় আদর্শস্থানীয়। অতীত গৌরবের চারণদের অন্যতম চন্দ্রনাথও। 'কথা' তাঁর ভালো লাগবে তা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা'য় প্রাচীন ভারতের কাব্যে সাহিত্যে যে সৌন্দর্য কণিকা ছড়িয়ে ছিল তাকে চয়ন করেছেন। 'কল্পনা' পাঠের পর চন্দ্রনাথ এক বিস্মিত আনন্দে আপন হৃদয় উদ্‌ঘাটন করেছেন তরুণ কবির কাছে। অনুরূপভাবে 'ক্ষণিকা' পাঠের

অনাস্বাদিত আনন্দ চন্দ্রনাথ তীব্র আবেগের সঙ্গে প্রকাশ করে

'এবার কণিকায় চমকিত করিয়াছ। আমার তোমার বিস্ময়ী হইয়াছি। আমি ক্ষুদ্র—সুতরাং আমার গতি বড় ধীর—আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। পিছাইয়া পড়িতেছি—কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি—ও গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি—যেমন দ্রুত তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখনকার নয়, ঊর্ধ্ব দেশের মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।'

সাহিত্যভোক্তার আনন্দের এমন আত্মপ্রকাশ অন্যত্র দুর্লভ। এই পত্র নিছক কাব্য সমালোচনা নয়। অনভ্যস্ত রুচিতে নবীনের কাব্যাস্বাদনের প্রতিক্রিয়ায় লিখিত। বেশ বুঝতে পারি, শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের রুচি পরিবর্তনের যে সূচনা হচ্ছে তারই 'মূল্যবান দলিল এই পত্র'।[২৩] মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের অভ্যস্ত জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পাঠক ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে রবীন্দ্রকাব্য ভাবনার পথিক হয়ে পড়লেন। সুতরাং চন্দ্রনাথের পত্রে শুধু চন্দ্রনাথের নয়, যুগের সাহিত্য রুচি ও তার পরিবর্তনের সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে।

মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চন্দ্রনাথের একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র (পত্রতারিখ : ৩১শে বৈশাখ ১৩১৬) আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। লেখক তখন অশক্ত, শোকগ্রস্ত ও শয্যাশায়ী। রোগশয্যা থেকে পিতামহ ভীষ্মের মতই চন্দ্রনাথের কণ্ঠে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হল—

দীর্ঘজীবী হও, রবীন্দ্রনাথ
দীর্ঘজীবী হও, পুরুষপ্রধান।

চন্দ্রনাথের এই আন্তরিক আশীর্বাণী বিফল হয় নি।